বস্তুবাদের আলোকে ভারতীয় পরমাণুবাদ

নন্দলাল মাইতি

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০০১২

উৎসর্গ

আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু ও দীর্ঘদিনের সহপাঠী
ডাঃ কালাচাঁদ রায়
ও
অনুজাসদৃশা
শ্রীমতী প্রণতি রায়

সুহৃদম্বয়েষু

সূচীপত্র

ভূচিত্র ঃ

ভূমিকা

সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ভারত প্রভূত উন্নতি করেছিল—এই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কথা আমরা প্রায়ই গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রকৃত কারণ ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করিনা বললেই চলে। প্রাচীন ভারতের অনেক-কিছু আজ কেবল অ্যাকাডেমিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে; স্বল্প-কিছু আলোচনা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সীমাবদ্ধ; আর যে বিস্তারিত বিবরণ তা মুষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞদের ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের কথা ছেড়ে দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীপ্রাপ্ত বহু শিক্ষিত মানুষের এ-সব বিষয়ে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নেই বললেই চলে। খুব সম্ভব, এটাই স্বাভাবিক; কারণ 'ফসিল চর্চা' করার স্পৃহা পার্থিব উন্নতির প্রতিকূল ও পন্ডশ্রম মাত্র। আমরা সবাই কি চীনা বৈশিষ্ট্যের মত *practical* হয়ে উঠছি? কিন্তু এ-কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বর্তমানের প্রগতি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অতীতকে বিস্মৃত হয়ে বিচ্ছিন্নতা ও পারম্পার্যহীনতার মধ্যে হয় না।

প্রত্যয় *(concept)* ও ভাবের *(idea)* একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে তা ক্রমশ পরিপুষ্টি লাভ করতে করতে এক সময় স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও প্রাবল্য লাভ করে প্রকল্প *(hypothesis)* ও তত্ত্ব *(theory)* হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক উৎপাদনশীলতা কোন বিশেষ প্রত্যয় ও ভাবের আনুকূল্য ও সহায়তা করে সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করতে হলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার অর্থাৎ সহজ ও সরল ভাষায় অতীতের সার্বিক বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। বর্তমানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে বিপুল বিস্ফোরণ দেখা যায় তার মূলে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রান্তি নির্বাচন ও তার সংশোধন এবং সংস্কার সাধন যে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছে, তা বিদ্বজ্জন, পণ্ডিত ও মনস্বীরা বারবার বলেছেন। তাই বর্তমানকে অনুধাবন করার জন্য অতীতকে জানার প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা আছে। অতীতের মূল্য ও তাৎপর্য এখানেই।

এ-কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, এক সময় ম্যাজিক ও ইন্দ্রজালের নিগড়ে ধর্ম ও বিজ্ঞান আবদ্ধ ছিল। কালক্রমে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতু বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ম্যাজিক ও ইন্দ্রজালের নিগড় ছিন্ন করে স্বাধীন সত্তা লাভ করে আজ বিশ্বসভ্যতার মূল স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম সেই নিগড় সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে পারেনি ; এখনো কুহেলীতে আচ্ছন্ন ; অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক ও বাহক। থর্ণডাইক *(Thorndyke)* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ***A History of Magic and Experimental Science during the First Thirteen Centuries of our Era***-য় 'ম্যাজিক'-কে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন, "*including all occult arts and Sciences, superstitions, and folk-lore,*" সুতরাং আদিম বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হলে ধর্ম দর্শন, ম্যাজিক ইত্যাদি বাদ দিলে চলেনা।

পরমাণুবাদ একটি দার্শনিক ভাবনা। প্রাচীন ভারতে বৈশেষিক দর্শনের উদ্গাতা মহর্ষি কণাদ পরমাণুবাদের প্রবক্তা, প্রাচীন গ্রীসে লিউসিপাস ও ডেমোক্রিটাস। উভয় দেশেই এই ভাবনা বিশুদ্ধ দার্শনিক ভাবনা বলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য কোন মূল বিজ্ঞান এতে সহায়তা করেছিল কিনা, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। সাধারণভাবে মনে করা হয়, এই ভাবনা সম্পূর্ণ স্বজ্ঞামূলক বা প্রাতিভানিক *(intuitive)*। কিন্তু উভয় দেশে সেই সুদূর অতীতে পরমাণুবাদের মত বস্তুবাদঘেঁসা মতবাদের আবির্ভাব হলো কি করে? এই মতবাদ কি কেবল কণাদ বা লিউসিপাস-ডেমোক্রিটাসের মস্তিষ্কপ্রসূত, না তার কোন পূর্বাপর ভাবনা ছিল বা অন্য কোন দার্শনিক বা আদি বৈজ্ঞানিক ভাবনা এর অন্তরালে রাসায়নিক বিক্রিয়কের মত ভূমিকা নিয়েছিল? বিষয়টি নিঃসন্দেহে জটিল হলেও এ-নিয়ে এ-যাবৎ বিশেষ আলোচনা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। বৈশেষিক, ন্যায় দর্শন নিয়ে আলোচনা আমাদের দেশে দেখা যায়ঃ বিভিন্ন টীকাকার, ভাষ্যকার বিষয়টি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং বিরুদ্ধ মতও খন্ডন করেছেন। এ-সব অত্যন্ত মূল্যবান এইজন্য যে,এর ফলে কণাদের ও গোতম বা গৌতমের অতিসংক্ষিপ্ত সূত্রগুলি বোঝা ও ব্যাখ্যা—বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়েছে। এইসব টীকা-ভাষ্যের অন্য মূল্য হলো তা এই দর্শনকে সঞ্জীবিত রেখে দার্শনিক ভাবনা ও চিন্তায় সূক্ষ্মতা, গভীরতা ও মননশীলতা বৃদ্ধি করেছে।

প্রাচীন ভারতে পরমাণুবাদ কেবল ন্যায়-বৈশেষিকের বিষয়ই ছিলনা।

এই চিন্তা-ভাবনা প্রবাহে জৈন ও বৌদ্ধদের অবদানও কম নয়। বস্তুত, ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ, চার্বাক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মতবাদ কেন আলোচনার বিষয় হলো তা আমাদের বিস্মিত করে। এ-বিষয়ে পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কারণ, বিষয়টি খুবই মনোগ্রাহী বলে প্রতীয়মান হয়।

পরমাণুবাদ সম্পর্কে দীর্ঘদিন তথ্য সংগ্রহ ও অধ্যয়নের ফলে আমার মনে হয়েছে, পরমাণুবাদের ন্যায় একটি মতবাদের মধ্যে স্বজ্ঞার প্রভাব থাকলেও তার মধ্যে তৎকালীন সময়ের বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ ধারণা যেন একটু অধিক পরিমাণে আছে, অন্তত ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক 'কোন-কিছু'। তা না হলে প্রবল ভাববাদের দেশে, এই ভারতে এরূপ ধারণা একরূপ সম্ভবপর নয় বলে মনে হয়। এই ভাবনা—চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে পরমাণুবাদের পারম্পার্য অনুসন্ধান করার কাজে নিযুক্ত হয়ে নানা টুকরো টুকরো তথ্য ও ঘটনার সম্মুখীন হই। অনুসন্ধানে আদিম বস্তুতান্ত্রিক মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ-নিরুক্ত ইত্যাদিতে সূত্ররূপে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হলেও উদাহরণস্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রধান ঋষি উদ্দালক আরুণির নাম করা যেতে পারে। তিনি সম্ভবত বিশ্বের আদিম বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিরীক্ষক, অন্তত ইয়াকোবি *(Jacobi)*, রুবেন *(Ruben)*, অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাই মনে করেন। তা ছাড়া নিরুক্তকার যাস্কের পূর্বসূরী কৌৎস আর এক মহর্ষি যিনি ভাববাদের প্রতিকূলতা করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতে ভাববাদী দর্শনের পাশাপাশি আর একটি দর্শন ছিল। তার নাম চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন। এই দর্শনটি ভাববাদীদের দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়েছে। প্রায় সব প্রাচীন ভাববাদী দার্শনিকই, মায় রামায়ণকার ও মহাভারতকার পর্যন্ত চার্বাকদের নিন্দা করেছেন, তাঁদের মতবাদের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে খন্ডন করে ভাববাদী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যেমন, "যাবজ্জীবেৎসুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ", "অঙ্গনাদ্যালিঙ্গনাদিজনাং সুখমেব পুরুষার্থঃ" ইত্যাদি উদ্ধার করেছেন। আমাদের অনেক সময় মনে হয়েছে ভাববাদীরা এইসব চার্বাক-বাক্যের স্থূলার্থ করে নানা বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কারণ যে কোন দর্শনই হোক তার একটা সার্বিক আবেদন থাকে যা শাশ্বত, অন্তত আপে-

ক্ষিক শাশ্বত; তার মৌলিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী কেবল "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বা "অঙ্গনাদির আলিঙ্গনাদিজন্য সুখই পুরুষার্থ" ইত্যাদির মধ্যে সীমায়িত হতে পারে না। চার্বাক দর্শন উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ও বাক্যাংশের ন্যায় নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তা কিভাবে শত শত বছর ধরে টিকে ছিল তা বিস্ময়কর নয় কি? আমাদের ধারণা ভাববাদী দার্শনিকরা চার্বাক দর্শনের প্রকৃত তাৎপর্য গোপন করে অনেকাংশে বিকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা তন্ত্র থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করতে চাই। আমরা জানি, তন্ত্রে, কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয়ের মধ্যে 'পঞ্চ ম-কার'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে মদ্য, মাংস, মৎস, মুদ্রা ও মিথুন-কে গ্রহণ করলে তন্ত্রের দার্শনিক নীতির সুস্পষ্টতা খুঁজে পাওয়ার পরিবর্তে ব্যাভিচারিতা দেখা যায়। অনেক তন্ত্রে 'পঞ্চ ম-কার' সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

"বাহ্যমদে রতো খণ্ড মৈথুনে মাংসভক্ষণে।
তে সর্বে নরকং যান্তি ইতি সত্যং বচো মম॥"

চর্যাপদের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা সহজেই সহজযান তন্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন। বিশ্বখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তন্ত্রের চর্চা হতো, এবং আরো বিস্ময়কর যে, অষ্টম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চীনা গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ ই সিং (*Yi Xing*) মহাযান তন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যায়, তন্ত্রে 'পঞ্চ ম-কার' যেমন স্থূল অর্থে প্রযুক্ত হতো না, তেমনি চার্বাক শ্লোকাদির ঋণং কৃত্বা, অঙ্গনাদির আলিঙ্গন ইত্যাদিও স্থূলার্থে প্রযুক্ত হতো না—গূঢ়ার্থ কিছু ছিল। তাই হোক, চার্বাকদের কোন সম্পূর্ণ দর্শনগ্রন্থ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। ভাববাদী দর্শনের প্রবল আক্রমণে শি হুয়াংতি-র (Shi Huang Di) দল অগ্নিদগ্ধ করেছে বলে মনে করার ক্ষীণ কারণও আছে। আমার এরূপ মনে হয়েছে, এই কট্টর বস্তুবাদী চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন পরমাণুবাদের উদ্ভবের অনুকূলে অন্যতম প্রধান সূত্রস্বরূপ প্রেরণা ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে বা কার্যকর ভূমিকা নিয়েছে। কারণ, খুব সম্ভব গুপ্ত যুগের আগে চার্বাক দর্শন অধিক নিন্দিত হয়নি।

প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলির বিকাশ ও অগ্রগতিতে তন্ত্রসমেত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের কতটুকু অবদান বা প্রতিবন্ধকতা তার সুষ্ঠু ও সার্বিক বিশ্লেষণ অদ্যাপি হয়নি। স্যার যোসেফ নীডহাম তাঁর

সুবিশাল গ্রন্থ *Science and Civilization in China* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে যে বিচার-বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছেন সে-ধরনের পথ অবলম্বন বা অনুসরণ করে কোন গ্রন্থ লেখার প্রয়াস এখনো লক্ষিত হয়নি। অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *History of Science and Technology in Ancient India* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও এ-ধরনের প্রয়াস দেখা যায় না। তবে তাঁর *Lokāyata, Science and Society in Ancient India* ও '**ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে**' খুবই মূল্যবান গ্রন্থ। বেদান্ত সম্পর্কীয় গ্রন্থ রাশি রাশি দেখা হলেও মনস্বী নীডহাম যেমন তু চিয়া (Confucians), তাও চিয়া (Taoist), ফা চিয়া (Legalists), মো চিয়া (Mohists), মিং চিয়া (Logicians), ইন-ইয়াং চিয়া (Naturalists) ইত্যাদি দর্শন বিশ্লেষণ করে চীনা জ্ঞান-বিজ্ঞানে এদের প্রভাব বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন তেমনি আমাদের দেশে দেখা গেল না। উদাহরণস্বরূপ, 'তাওবাদ ও বিজ্ঞান' উপশীর্ষক আলোচনায় [Vol-2 p. 161] নীডহাম বলেছেন,—

"the philosophy of Taoism..., though containing the elements of political collectivism, religious mysticism and the training of the individual for material immortality, developed many of the most important features of the scientific attitude, and is therefore of cardinal importance for the histoiy of Science in China. Moreover, the Taoists acted on their principles, and that is why we owe to them the beginnings of Chemistry, mineralogy, botany, Zoology and Pharmaceutics in East Asia."

ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদ আলোচনায় যে-গ্রন্থ দেখা যায় তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা, কিছু কিছু শব্দার্থ ও অন্যান্য দর্শনের সহিত সাদৃশ্য ও ও বৈসাদৃশ্যই মুখ্যত স্থান পায়। এতে যে বৈজ্ঞানিক ভাবনার আভাস-ইঙ্গিত রয়েছে তার কোন আলোচনা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ সম্ভবত তাঁদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতবিদ ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। ফলত, বিজ্ঞানের নানা ধারণার সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্য তাঁরা এ-সব এড়িয়ে যান। প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদের মধ্যে *Proto-Science* বা *Pseudo-Science* যাই নিহিত থাক না কেন তার সম্যক বিচার-বিশ্লেষণে নীডহামের ন্যায় মনস্বিতা ও বিশ্বকোষ সদৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় পরমাণুবাদের দার্শনিক ভাবনা বা ভাবের মধ্যে যে-সব বৈজ্ঞানিক ভাবনা বা ভাবের আভাস-ইঙ্গিত আছে তা এই নগণ্য মেধা ও জ্ঞানসম্পন্ন লেখক

লিপিবন্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। এই কাজে লেখকের মৌলিকতার চেয়ে পূর্বাচার্য ও পূর্বসূরীদের মৌলিকত্বই রয়েছে। কিন্তু এতে কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে, প্রাচীনকালের এই পরমাণুবাদে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা বর্তমান অর্থে পরিপূর্ণভাবে ছিল। আমরা জানি, জৈব অণুর কাঠামোয় বহু পরমাণুর সমাবেশ দেখা যায়, যেমন,—আমাদের অতিপরিচিত গ্লুকোজ অণুতে ছ'টি কার্বন, বারটি হাইড্রোজেন ও ছ'টি অক্সিজেন পরমাণুর সমাবেশ দেখা যায় ($C_6H_{12}O_6$)। তেমনি আবার প্রাচীন পরমাণুবাদের ধারণাতেও অণু-ভাবনায় বহু পরমাণুর সমাবেশ দেখা যায়, যেমন—'ত্র্যণুক' বা 'ত্রাসরেণু'। কিন্তু এই ধারণা কোনক্রমেই আধুনিক বিজ্ঞানের অর্থে নয়,—পাঠকদের এই কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার।

এই পুস্তিকাটি প্রণয়নকালে "*national glory*" বা "*extreme historicism*" সম্পূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। কোন কোন দর্শনের বিশেষ বিশেষ মতের সমালোচনা থাকলেও ওইসব দর্শনের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা বা অশ্রদ্ধা কোনটাই পোষণ করিনা। অধ্যয়নের মাধ্যমে এই ধারণা হয়েছে যে, যে-কোন দর্শনেরই কম-বেশী ভাল দিক আছে। তবে এ-কথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, কোন কোন মতবাদের আনুকূল্য করার জন্য বিশিষ্ট বা বিশেষ দর্শনই সহায়তা করে। পরমাণুবাদ সম্পর্কে বলা যায় যে, এখানে বস্তুবাদই বেশী আনুকূল্য করে। মহামতি লেনিন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে পরমাণুবাদে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রভাব ও আনুকূল্য দেখিয়েছেন; এঙ্গেলেস-এর লেখাতেও আরো স্পষ্ট বর্ণনা আছে। কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষের মত খন্ডনের প্রয়োজন হয়ে পড়ায় তাঁদের সমালোচনা করতে হয়েছে। কিন্তু তা হলেও যেন কেউ মনে না করেন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লেখক অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন।

এই পুস্তিকার পরমাণুবাদ অংশটি বিখ্যাত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় ছ'টি কিস্তিতে 'প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদ' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। তা থেকে বহু অংশ এই পুস্তিকায় গৃহীত হওয়ায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্তৃপক্ষকে এবং ওই পত্রিকার সম্পাদনা সচিবকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদে খুবই উৎসাহী ও আগ্রহী অনুসন্ধিৎসু। এ-সম্পর্কে অধুনালুপ্ত একটি পত্রিকায় তিনি কিছু লেখাও

প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে আলোচনা করে আমি নানাভাবে উপকৃত হয়েছি। তা ছাড়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত অংশটির পাণ্ডুলিপি তিনি নিরীক্ষণ করে মূল্যবান অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সে-সব এই পুস্তিকা প্রণয়নকালে কাজে লাগাতে পেরে অশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেছি। পরম হিতৈষী ও সুহৃদ ডঃ চক্রবর্তীকে নমস্কার জানাই।

পুস্তিকা রচনাকালে কয়েকটি মূল্যবান ও অপরিহার্য গ্রন্থপাঠের অভাব একান্তভাবে অনুভব করি। সেই অভাব পূরণ করে দিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে আমার অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে "friend, philosopher and guide" ডঃ প্রদীপকুমার মজুমদার। এই বিদ্বান, পণ্ডিত, সহৃদয় ও উদার প্রকৃতির আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষটিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। ওঁর সার্বিক কুশল ও দীর্ঘজীবন কামনা করি এবং আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বোস ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন অধ্যাপক অরুণকুমার রায়চৌধুরী আমার কয়েকটি প্রবন্ধের ফটোকপি পাঠিয়েছেন। তাঁকে নমস্কার জানাই। Indian National Science Academy-র মাননীয় সচিব কয়েকটি প্রবন্ধের ফটো-কপি প্রদান করার অনুমতি দান করে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তা ছাড়া INSA-র লাইব্রেরীয়ান ও কর্মচারীদেরও ধন্যবাদ জানাই। NISTADS-এর ডাইরেক্টর ডঃ অশোক জৈনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি এ. রহমনের বইটি প্রদান করে অশেষ উপকার সাধন করেছেন।

ডাঃ কালাচাঁদ রায় ও শ্রীমতী প্রণতি রায়—এই বন্ধুবৎসল উদারচেতা দম্পতিকে পুস্তিকাটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা না থাকলে আশ্রয়হীন কলকাতায় গিয়ে স্বল্পকালীন পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজকর্ম কোনদিন সম্ভব হতো না। তাঁদের ও তাঁদের পুত্রকন্যাদের সহাস্য অভ্যর্থনা আমায় অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানে উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করে।

স্ত্রী শ্রীমতী সুধা, পুত্র দীপঙ্কর ও কন্যাদ্বয় পারমিতা ও সঙ্ঘমিত্রা আমায় পার্থিব প্রয়োজনের দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখায় তবেই এ-কাজ সম্ভব হয়েছে। তাদের আশীষ জানাই। অগ্রজ ডাঃ দুলালচন্দ্র মাইতি ও অনুজ ডাঃ গোপালচন্দ মাইতি আমায় অনুক্ষণ প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

এবার ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীরথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আসি। এই পুস্তকটি প্রকাশের সার্বিক

দায়িত্ব গ্রহণ করে ইনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন বললে সব কথা বলা হলো না। ইনি তাঁর প্রকাশিত ও এজেন্সিপ্রাপ্ত নানা গ্রন্থ আমায় অবাধে পড়ার সুযোগ প্রদান করে মহৎ উপকারসাধন করেছেন। তা না হলে অতি মূল্যবান কিছু পুস্তক ক্রয় করার মত আর্থিক সামর্থ কখনোই আমার হতো না বলে জ্ঞানের বহুধা বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে চিরকাল বঞ্চিত থাকতাম। তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ফার্মা কেএলএম প্রা. লি.-এর প্রকাশন বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীযুত শ্রীপতিপ্রসাদ ঘোষ এই পুস্তিকা প্রকাশকালে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সুপরিপক্ক জ্ঞান যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ নিয়ে আলোচনা করে সংশোধন করতে পেরে উপকৃত হয়েছি। তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই। তা ছাড়া ওই প্রকাশনীর অন্যান্য কর্মীবৃন্দ যাঁরা সকলেই আমার অতিপরিচিত তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রথম অধ্যায়

বস্তুবাদের আদি উৎস

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান নানা বিস্ময়ে পূর্ণ। মহাকাশ গবেষণা, পারমাণবিক গবেষণা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি এমনই চমক সৃষ্টি করে চলেছে যে, অতি সাধারণ মানুষ থেকে শিক্ষিত সবাই এ-সব বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের এই বিপুল অগ্রগতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার একদিনে সম্ভব হয়নি। এর পেছনে দীর্ঘ দিনের—শত শত বছরের পূর্বসূরীদের আপাত তুচ্ছ ও নগণ্য অবদান রয়েছে। কিন্তু তা যত তুচ্ছই হোক, আর যত নগণ্যই হোক, তা যে ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, চিন্তা-ভাবনার নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায়ের দিকে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। বস্তুত, মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তা দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে আবদ্ধ। এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী যাতে অনড়-অটল বলে কিছু নেই, সবই পরিবর্তনশীল,—জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গতিশীল। এই মতাদর্শে উদ্ভব ও বিলয়ের এক অবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া ছাড়া, নিম্নস্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ে অন্তহীন উদ্‌বর্তন ছাড়া আর কিছু নেই। এই ধারণা যে বিজ্ঞানের নানা মতবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা প্রাচীন ও আধুনিক পরমাণুবাদের ধ্যান-ধারণার পার্থক্যের মধ্যে দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাচীনদের মধ্যে কি দ্বান্দ্বিক ধারণা ছিল? কারণ, এটা আধুনিক যুগের দার্শনিক ধারণা—মার্কসীয় ধারণা। এর সুন্দর ও চমৎকার উত্তর দিয়েছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস যে, মানুষ যেমন গদ্যে বহুকাল কথা বললেও অনেক পরে 'গদ্য' সনাক্ত করতে পেরেছে, তেমনি প্রাচীন মানুষ দ্বান্দ্বিকতার পথই অনুসরণ করেছেন।[১] যাই হোক, মানবসভ্যতার প্রতিটি স্তর, তার উত্থান-পতন, সাফল্য-অসাফল্য ইত্যাদি বোঝার জন্য, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য, তা ছাড়া জাতির প্রকৃত স্বরূপ-প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য প্রাচীন ধর্মীয়-দার্শনিক যে-সব মতাদর্শ বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, সে-সবের চর্চার প্রয়োজন,—এটা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। আমাদের এই ছোট বই-এ সেই প্রচেষ্টাই আছে।

ভারতীয় মানসপ্রকৃতি

কিন্তু তার আগে ভারতীয় বিশ্বানদের মানসপ্রকৃতির গঠন নিয়ে সামান্য আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনার প্রয়োজন এই জন্য যে, ভারতবাসী ও ভারত সম্পর্কে বিশ্বে এখনো এই ভ্রান্ত ধারণা চালু আছে যে, এই দেশটা ম্যাজিক-ম্যাজিসিয়ানদের দেশ, অধ্যাত্মবাদের দেশ, বাস্তববাদ তথা বস্তু-বাদের ছোঁয়া এদেশে কোন কালে ছিলনা, ছিল ভাববাদে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত; তাছাড়া দেশটা একেবারে রাজা-রাজড়ায় ভরা। এইসব কথা পরাধীনতার যুগে বিদেশী পণ্ডিতরা, বিশেষত ইংরেজরা (ব্যতিক্রম আছে), ও জার্মানরা প্রচার করেছেন। এতে তাঁদের কি স্বার্থরক্ষিত হয়েছে, সে আলোচনা আমরা এখানে করব না। তবে এটা দেখাতে চেষ্টা করব যে, ওইসব বিদেশী পণ্ডিতরা যা বলেছিলেন, তা চাঁদের এক পিঠ, অন্য পিঠের অস্তিত্ব হয় তাঁরা ইচ্ছে করেই চেপে গেছেন, না হয় দেখার চেষ্টা করেননি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে। তাঁরা গুরুবাক্যে এমনই আস্থাশীল যে, স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার অবকাশ পাননি। তবে সম্প্রতি রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব প্রমুখ ঐতিহাসিকরা আশার আলো জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে ভারতীয়দের নিবিড় ও গভীর কল্পনাপ্রবণতার ছাপ দেখা যায়। অবশ্য যে-কোন কাজে বা পরিকল্পনায় কল্পনার আবশ্যকতা বা অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। শুধু কাব্য-সাহিত্য বা দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, অন্য যে-কোন ক্ষেত্রে, যেমন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 'প্রকল্প' রচনার জন্য কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু এর আধিক্য হলে, মাত্রাতিরিক্ত হলে বাস্তব-অবাস্তব বা সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হয় না। এবং তা তখন নিছক গগনবিহারী অলীক ভাবনায় পর্যবসিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা-ভাবনায় অনেক অলীকতা (Fantacy) অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, আর সম্পূর্ণ অবাস্তব, অলীক ভাবনার বশবর্তী হয়ে তর্কবিদ্যার দৃঢ় নিগড়ে তাঁরা তা স্বীকার করেও নিয়েছেন। 'বিশ্বজগতের ঐক্য যে তার সত্তায় নয়, তার বস্তুময়তায়',—এই কথাটি প্রাচীন ভাববাদী ভারতীয় দার্শনিকদের অধি-কাংশের উপলব্ধির বাইরে ছিল, এবং তাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি ও বিচারে কর্ণপাত করেননি সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তানায়কদের চিন্তা-ক্রিয়া সমাজের

মূলস্তর অর্থাৎ সমাজ-মন থেকে উৎসারিত হয়নি, বিচ্ছিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায় থেকেই হয়েছে। তাই "বস্তুই সংবেদন, ভাবনা ও উপলব্ধির মূল" এই চিন্তার পরিবর্তে তাঁরা বস্তুজগৎ সত্তা বা প্রকৃতির অস্তিত্ব চৈতন্য, সংবেদন, ভাবনা ও উপলব্ধির মধ্যে অন্বেষণ করেছেন।[৩]

প্রকৃতির সত্তা উপলব্ধিতে আত্মা আগে না প্রকৃতি আগে? অর্থাৎ জাগতিক ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা আত্মা দিয়ে, ঈশ্বর দিয়ে সমাধান করা হবে, না জাগতিক ঘটনা প্রাকৃতিক কারণের মধ্যেই খুঁজতে হবে,—ঐই প্রশ্নে একদল আত্মাকে বেছে নিয়েছেন,—ঈশ্বরকে বেছে নিয়েছেন। এঁরা ভাববাদী দার্শনিক; এঁদের কাছে বস্তু বড় নয়, চৈতন্য বড়; বস্তু এঁদের ভাবনা-চিন্তা জাগরিত করেনা, করে চৈতন্য—আত্মা যে-সবের কোন বাস্তবতা নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণেই প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ দার্শনিক ভাববাদী,—ব্রহ্মাণ্ডবিচারী কল্পনার অলীকতায় যাঁরা মশগুল। এই ধারণা—ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এই ভ্রান্ত মত এখনো বিদ্যমান। একেই ভারতীয় মনঃপ্রকৃতি বলে বর্ণনা করা হয়। অবশ্য এই প্রকৃতির মানুষ যে অনুমানভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চায়, রহস্যময় তাত্ত্বিক গবেষণায় অধিক মনোনিবেশ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর সে-কারণেই কোন প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি বা পূর্বাপর প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর ভারতীয় চিন্তাবিদদের অধিকতর আস্থা দেখা যায়—এটা তাঁরা 'প্রমাণ' হিসাবে গ্রহণ করেন। সেইজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-সব ক্ষেত্রে অনুমান বা তাত্ত্বিক ভাবনার ভূমিকা বেশী, যেমন,—দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষ, সেইসব ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের অনুরাগ ও আগ্রহ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু ভাববাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সর্বত্র ও সর্বদা আনুকূল্য করেনা। একটা স্তর পর্যন্ত পেঁাছে তার অবক্ষয় ও অধঃপতন শুরু হয়। আমাদের মনে হয়, ভারতীয় ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ, অধিবিদ্যাবাদ ইত্যাদির মধ্যে এই ধ্বংসের বীজ ছিল বলেই প্রাচীন ভারতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিকাশ-স্তরের একটি পর্যায় পর্যন্ত এসে থেমে গেছে, আর অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, শুধু ভাববাদের আনুকূল্যেই কি প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের বিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল বা এর অন্য কারণও ছিল? আমাদের মনে হয়, ঋগ্বেদের যুগ থেকেই ভারতীয় মানসে দ্বান্দ্বিকতার বীজ ছিল অর্থাৎ তাঁদের অনেকের বস্তু-তান্ত্রিক মনোভাব ছিল; অবশ্য তা কোন অর্থেই মার্কসীয় বস্তুবাদ নয়। তা না হোক, ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য আলোচনা করা যাক।

বৈদিক সাহিত্যে সমাজ ও অর্থনীতি

ঋগ্বেদের সমাজ আদর্শ সমাজ ছিল না। সমাজে চুরি-ডাকাতি ছিল—গরু চুরির ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক বলেই মনে হয়। এই সমাজ সাম্যের সমাজ নয়—যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। আর্যরা প্রধানত তিনটি সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: যোদ্ধা বা অভিজাত, পুরোহিত ও সাধারণ মানুষ। তখন বর্ণ বা জাতপাতের কড়াকড়ি ছিল না। ঋগ্বেদের একটি ঋকে বলা হয়েছে: "দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করছি" (৯।১১২।৩)।

সমাজকে নিয়মতান্ত্রিক চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করার জন্য প্রকৃতপক্ষে বর্ণভিত্তি গড়ে ওঠেনি। প্রথম তিনটি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট তত্ত্বীয় কাঠামোয় বিভিন্ন পেশা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। বর্ণের ভিত্তিতে পেশা বহুদিন ধরে পরিবর্তিত হতে পারত। বর্ণভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার আরও কারণ হলো যে, আর্যরা ছিল প্রধানত পশুপালক। পশুপালন থেকে কৃষিকর্মে জড়িত হয়ে স্থায়ী বসবাস করার ফলে তাদের দক্ষ শ্রমিক-মজুর আবশ্যক হয়ে পড়ে—জঙ্গল কেটে ভূমি বার করার তাগিদে। নতুন বসতির অস্তিত্বের ফলে ধীরে ধীরে বণিক সম্প্রদায় দেখা দিল এবং দ্রব্য-সামগ্রী বিনিময় হতে লাগল। কৃষক ও বণিকদের মধ্যে বিভাগ দেখা দিল; বিত্তশালী ও পুঁজিমালিকদের মধ্য থেকে, ভূমি মালিকদের মধ্য থেকে বণিকরা উদ্ভূত হলো। পুরোহিতরা নিজেরাই ছিল একটি শ্রেণী—বিশেষ শ্রেণী। রাজা যোদ্ধৃ শ্রেণীর নেতৃত্ব দিত, এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। তাই রাজা হয়ে উঠল প্রধান শক্তি। পুরোহিতরা রাজাদের আনুকূল্য করে চলতেন, স্বর্গীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা 'ব্রহ্মদেয়' না পেলেও যথেষ্ট গরু, দাস-দাসী লাভ করতেন।

পিতা, মাতা, সন্তান, দাস-দাসী ছাড়াও আরো অনেককে নিয়ে পরিবার গঠিত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারে কন্যা আকাঙ্ক্ষিত ছিল না, ছিল পুত্র। সমাজে বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, তবে আদিতম আচারাদি থেকে মুক্ত ছিল না। যম-যমীর কাহিনী এ-সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়। সূর্যের কন্যার সঙ্গে অশ্বিন ভ্রাতৃদ্বয় বাস করতেন, এটা দোষের ছিল না। নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়াকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবাহ করার প্রথা ও বিধবা বিবাহের উল্লেখ ঋগ্বেদে অলভ্য নয়। 'গৌরীদান' ছিল না।

এ-যুগের সামাজিক অবস্থা জানবার প্রকৃষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া

যায় না। 'অন্ধকার যুগ'—এই বৈদিক যুগের অতি নগণ্যই মাত্র খননকার্যের ফলে পাওয়া গেছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবের তিনটি স্থানে ও হরিয়ানার ভগবানপুরায় খননকার্য চালিয়ে সিন্ধুসভ্যতার শেষ দিকের মাটির তৈরী জিনিসপত্রের সঙ্গে চিত্রাঙ্কিত ধূসর বর্ণের মাটির পাত্র (PGW) আবিষ্কৃত হয়েছে। ঋগ্বেদের বর্ণনা অনুসারে এই চারটি স্থান ওই যুগের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া ভগবানপুরায় তেরোটি ঘরবিশিষ্ট একটি মাটির বাড়ীও আবিষ্কৃত হয়েছে। এস্থানে গবাদি পশুর দেহাবশেষও পাওয়া গেছে। মাটির পাত্রগুলির আনুমানিক সময়কাল ১৬০০—১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে অনুমানও করা হয়।[৪] সুতরাং এই তথ্য থেকে এরূপ ধারণা করা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগের জীবনযাত্রা অতি সহজ ও সরল ছিল ; পশুপালন ও সামান্য কৃষিকার্যের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সরল শিশুর ন্যায় কালিমারহিত ছিল তাদের জীবন।

ঋগ্বেদের যুগের অর্থনীতি প্রধানত পশুপালনকে কেন্দ্র করে। গবাদি পশুই ছিল তাঁদের প্রধান সম্পদ। বহু ঋকে তাই গবাদি পশুর জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। তবে এযুগে কৃষিকার্য একেবারে অজ্ঞাত ছিল না—বার্লি ও যবই প্রধান খাদ্য। আর্যরা তখনো পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়নি, কেন্দ্র 'সপ্তসিন্ধু' অঞ্চলে। এযুগে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের উল্লেখ আছে। যেমন, ছুঁতোর, রথকার, তাঁতী, চর্মকার মৃৎশিল্পী ইত্যাদি। লোহার কোন ব্যবহার ছিলনা, তবে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হতো। তখনো 'নগর' গড়ে ওঠেনি। সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় ছিল কিনা নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন, বড় নদীই সম্ভবত সমুদ্র নামে অভিহিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের যুগের সমাজ ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করার পর, পরবর্তী বৈদিক যুগ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগে সমাজ ও অর্থনীতির কিরকম অবস্থা ছিল, তা জেনে নেওয়া দরকার। এযুগে চারটি বর্ণ দেখা যায়, যদিও সব সময় তা কঠোর ছিল না অর্থাৎ মনু প্রমুখের অনুসারী ছিলনা। ব্রাহ্মণরা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, আবার এই দুই বর্ণের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বও দেখা যায়। বৈশ্যরা ক্রমশ তাঁদের বিত্তের গুরুত্বের জন্য প্রতিপত্তি লাভ করছিলেন। কারণ, রাজস্ব তাঁরাই দিতেন। রাজা বা রাজন্যরা তিন শ্রেণীর ওপরেই কর্তৃত্ব স্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে : ব্রাহ্মণেরা জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন, উপহার গ্রহণ করতেন, কিন্তু ইচ্ছা করলেই রাজা তাঁদের সরিয়ে দিতে

পারতেন। বৈশ্যরা কর দিতেন; শাস্তিলাভ ও শোষণ ছিল তাদের ভবিতব্য। শূদ্ররা ছিল দাস, অন্যের আজ্ঞাবহ; অন্যের দয়ায় জীবননির্বাহ করাই ছিল তাদের ললাট-লিখন। তবুও শূদ্ররা কখনো-সখনো সুযোগলাভে বঞ্চিত ছিল না। যেমন, রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে তারা অংশগ্রহণ করতে পারত, রথকারদের সামাজিক মর্যাদা ছিল, তাদের উপনয়নও হতো। ঋগ্বেদের যুগের চেয়ে এ-যুগে নারীদের মর্যাদা ক্রমশ সীমিত হতে থাকে; ব্যতিক্রম অবশ্য দেখা যায়। আশ্রম প্রথা এযুগে বৃদ্ধি পায় যা ঋগ্বেদের যুগে ছিল না।

এযুগের শেষের দিকে রাজার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। রাজপুত্র ও ধনীরাই সভা-সমিতির তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সভা-সমিতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণ ও অভিজাতরা। 'রাষ্ট্র' শব্দ এযুগেই প্রথম শোনা যায়। নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা হতে থাকে এযুগে। অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় ইত্যাদি তার কয়েকটি উদাহরণ। এযুগে রাজস্ব ও উপহার সংগৃহীত হতো। রাজারা অকৃপণ হাতে ব্রাহ্মণদের দান করতেন। যাজ্ঞবল্ক্য তো জনকের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করেই চার-পাঁচ হাজার গরু পেয়ে গেলেন। রাজকার্যে সহায়তা করতেন পুরোহিত, সেনাপতি, মহিষী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা। প্রশাসনের নিম্ন এককটি ছিল গ্রামীণ সভা-সমিতির ওপর। এগুলি নিয়ন্ত্রণ করতেন গোষ্ঠী-পতিরা, তাঁরা বিচারও করতেন।

লোহার ব্যবহার এযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফলে, জঙ্গল কেটে লাঙলে লোহার ফলা ব্যবহার করে কৃষিকার্যের উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। বার্লি, যব, গম, এমন কি ধানও উৎপন্ন হতে থাকে। মেয়েরাই সম্ভবত তাঁত বোনার কাজ করত। চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প ও সূত্রধরের শিল্প এযুগে বৃদ্ধি পায়। চার ধরনের মাটির পাত্র এযুগে তৈরী হত: লাল-কালোপাত্র, কালোপাত্র, চিত্রাঙ্কিত ধূসরবর্ণের পাত্র ও লালপাত্র। চিত্রাঙ্কিত ধূসরবর্ণের পাত্র উচ্চবিত্তরা ব্যবহার করতেন, অলঙ্কারও নির্মিত হতো।

সার কথাটি বলতে গেলে, এযুগে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় ঋগ্বেদের যুগের তুলনায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। পশুপালনে ছেদ ও কৃষিনির্ভরতা লক্ষ করার মত। কৃষিকাজই হলো জীবনযাপনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কৃষিকাজ, শিল্পকলা জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে এযুগের মানুষ উচ্চ গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে পাকাপাকি বসবাস আরম্ভ করল। রাজা ও পুরো-

হিতদের অন্নসংস্থানের যোগান দেওয়ার জন্য তাদের উদ্‌বৃত্ত ফসল খুব বেশী না থাকলেও 'বলি' প্রদান, 'দক্ষিণা' ইত্যাদি দিতে হতো অনুমান করা যায়।

বৈদিক সাহিত্যে দ্বান্দ্বিকতার বীজ তথা বস্তুতন্ত্র

ভারতে ভাববাদের সূচনা উপনিষদের যুগে; আর তার প্রাবল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং নাগার্জুনের সময় থেকে দার্শনিক যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখা যায়। ঋগ্বেদে আমরা ভাববাদের পরিবর্তে নানা স্তবস্তুতির মধ্য দিয়ে জাগতিক লাভ, সম্পদ ও ঐশ্বর্য কামনার কথাই জানতে পারি, এবং তা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, ২।৩০।৫ ঋকে ইন্দ্রের কাছে প্রভূত গোধন, পুত্র ও পৌত্রলাভের প্রার্থনা করা হয়েছে; ২।৩১।৭ ঋকে বিশ্বদেবতার কাছে অন্ন ও বলের জন্য প্রার্থনা করে স্তুতি রচনা করা হয়েছে; ২।৩৫।১ ঋকে অপাংনপাৎ-এর কাছে অন্নের জন্য প্রার্থনা, ৩।১৪।৬ ঋকে প্রিয়বাক্য রচনা করে ধনপ্রার্থনা জানানো হয়েছে। তাছাড়া কোন কোন ঋকে 'গোষ্ঠীপতি' নিজেই দেবতা হয়ে গেছে; যেমন, ত্রাসদস্যু নিজেই দেবতা হয়ে নিজ গুণকীর্তন করছে ৪।৫৭ সূক্তে। এ-যুগে দার্শনিক ভাবনা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠেনি, তবে তার বীজ উপ্ত হয়েছে, অন্তত দশম মণ্ডলে কিছু কিছু দেখা যায়। কিন্তু এ-যুগেও মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার অভাব ছিল না; প্রচলিত যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান, দেবতা, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে ঋষিদের মনে। দীর্ঘতমার জিজ্ঞাসা 'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্?'— প্রথম জায়মানকে কে দেখেছে? "আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর শেষ অন্ত কোথায়? আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ভূত জগতের নাভি কোথায়?" (১।১৬৪।৩৪)। আবার, দশম মণ্ডলে নারদীয় সূক্তে প্রজাপতি ঋষি সংশয় ব্যক্ত করে বলছেন, "কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মাল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হল? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন। কোথা হতে যে হল, তা কেই বা জানে? এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হল, কার থেকে হল, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি, তা তিনিই জানেন···অথবা তিনিও না জানতে পারেন।"[৫]

জগৎসৃষ্টি বিষয়ে ঋষিদের এই সংশয় সম্পূর্ণ অধ্যাত্মবাদ, ভাববাদ অবলম্বনে নয়, মনে হয় তা বস্তুকে কেন্দ্র করেই উৎপন্ন হয়েছিল। ঋষিরা

জগতের কারণরূপে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করতে দ্বিধা করছেন, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তখনো অজ্ঞাত। তাঁদের পার্থিব সম্পদলাভের আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া তখনো পরমার্থলাভে পর্যবসিত হয়নি। তাই আমাদের মনে হয়, ঋগ্বেদের বহু সূক্ত ও ঋকে দ্বান্দ্বিকতার বীজ উপ্ত যা ক্রমশ আরো উচ্চতর ভাবনার দিকে উত্তরণ করার পথে অগ্রসর হচ্ছিল তখনকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

উপনিষদ সাহিত্যের সর্বত্র 'ব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠার তোড়জোড়, কিন্তু তা একচ্ছত্র নয়। এখানে বস্তুবাদী ভাবনার অভাব নেই, বরং সহাবস্থান দেখা যায়। কিন্তু শুধু উপনিষদেই নয়, তার আগেও বেদবিরোধিতা দেখা যায়। বেদ যে অভ্রান্ত নয়, অপৌরুষেয় নয়, এটা কেবল চার্বাকদের মতই নয়, এর সূচনা অথর্ববেদের যুগ থেকেই, এবং নিরুক্তের অন্তর্গত কৌৎস ছিলেন প্রখর বেদবিরোধী। অবশ্য বেদবিরোধী হলেই যে তিনি বস্তুবাদী হবেন এমন কথা নেই; কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠতা রয়েছে নিঃসন্দেহে। অবশ্য আমরা কৌৎস-এর অভিমত বা দার্শনিক মতটি কি জানিনা, যাস্ক বলেননি বলে। কিন্তু গতানুগতিক চিন্তা-ভাবনা না করে তিনি যে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা করার পক্ষপাতী ছিলেন, এটুকু ধারণা করা যায়।[৬] "মার্কস এবং এঙ্গেলস দেখিয়েছেন নাস্তিকতা হল প্রগতিশীল শ্রেণীগুলির পক্ষে লাক্ষণিক" অর্থাৎ যাস্ক বা তাঁর সময়ের আগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে পণ্ডিতদের মধ্যে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল।

আমরা বারবার বলছি যে, উপনিষদ সাহিত্যে বস্তুবাদের ছোঁয়া পাওয়া অসম্ভব নয়। এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। তবুও দু-একটি বিষয় উল্লেখ না করলে চলেনা। কঠোপনিষদের বিখ্যাত নচিকেতা পরমার্থী হলেও তাঁর বাবা গৌতম বাজশ্রবস মোটেই ভাববাদী ছিলেন বলে মনে হয়না। যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের দান করার জন্য যে গরুগুলি তিনি এনেছিলেন, তাদের কারুর ঘাস-জল খাবার ক্ষমতা ছিল না, বাচ্চা দেবারও সামর্থ ছিল না। চোখ গর্তে ঢুকে গেছল, হাড় জিরজির করছিল; চলতে গিয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। এইসব বর্ণনা থেকে বেশ বোঝা যায় ওই ব্রাহ্মণ বস্তুনিষ্ঠ ছিলেন, সম্পদ-ঐশ্বর্যে, পার্থিব সুখে তাঁর বিন্দুমাত্র অরুচি ছিলনা। আবার, যম-নচিকেতার কথোপকথন থেকেও দেখা যাচ্ছে সে-যুগে আত্মা-অবিশ্বাসীর অস্তিত্ব ছিল: 'অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে'—কেউ বলেন আত্মা আছে, আবার কেউ বলেন নেই। বৃহদারণ্যক

উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য বহু আজগুবি তর্কাতর্কি করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ব্রহ্মজ্ঞ বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন, আর সাধারণ্যে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের খ্যাতিও খুব বেশী। কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানী জগৎ মায়া, মিথ্যা, ভুয়ো বলে যে উড়িয়ে দেননি, তার প্রমাণ যথেষ্ট। যেমন, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই জনকের 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ কে ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এক হাজার গাভী নেবার সাহস কেউ না দেখাতে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যকে ডেকে গাভীগুলি বাড়ী নিয়ে যেতে বললেন। এতে অন্যান্য ব্রহ্মিষ্ঠরা রেগে গিয়ে বললেন, তিনিই যে শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মিষ্ঠ তার প্রমাণ না দিয়েই গাভী নিচ্ছেন কেন? সবিনয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন যে, গাভীগুলিতে তাঁর খুবই প্রয়োজন ছিল, তাই নিয়েছেন। 'গোকামা এব বয়ং স্ম ইতি'। তা ছাড়া দুই স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করে যাজ্ঞবল্ক্য যে পার্থিব সম্পদ, ভোগলালসা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না —এ অনুমান কষ্টসাধ্য নয়।* কিন্তু টুকরো টুকরো কথা, দু-একটি যৎসামান্য উদাহরণের কথা ছেড়ে দিলেও উপনিষদে আর একটি চরিত্র আছে যাঁর মতামত কিছুটা অধিক বস্তুবাদ ঘেঁষা বলে মনে হয়। ইনি ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণি। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমেই দেখি উদ্দালক আরুণি ঋগ্বেদের ঋষির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলছেন, এই যে নানারূপে জগতকে দেখা যায়, তা সবার আগে এক অদ্বিতীয় সৎরূপে বর্তমান ছিল, এক ও অদ্বিতীয় অসৎ থেকে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট এটা ঠিক নয়।[৭] এখানে 'অসৎ'-এর অর্থ 'কিছুই না', আর 'সৎ'-এর অর্থ 'কিছু' অর্থাৎ জড় বা অচেতন।

উদ্দালক যে কিছু পরিমাণে হলেও বস্তুবাদী মতের পোষাক ছিলেন, তা তাঁর নানা মতাদর্শ থেকে প্রমাণ করা যায়। যেমন, বৃহদারণ্যকের শেষে আমরা তাঁকে কামশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করতে দেখি,এমন কি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুও কোন কামশাস্ত্র রচনা করে থাকবেন, এমন আভাস আছে। যাই হোক, ভূতবস্তুর বিদ্যমানতায় চৈতন্য বৃদ্ধি পায়, আর তার অবর্তমানে চৈতন্যের হ্রাস হয়,—এই তত্ত্বটি উদ্দালক আরুণি এমন পরীক্ষার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন যে, প্রাচীনকালের নিরিখে এটি বিস্ময়কর বলে গণ্য হতে পারে। বিষয়টা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

প্রথা অনুসারে পুত্র শ্বেতকেতু নির্দিষ্ট সময় বেদ অধ্যয়ন করে বাড়ীতে

*অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, পৃ-৪৯-৫৯ দ্রষ্টব্য।

ফিরে এসেছেন। কিন্তু উদ্দালকের মনে হলো পুত্রের অহমিকা—বিদ্যার অহমিকা ছাড়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ কিছু হয়নি। তিনি পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি তেমন জ্ঞান অর্জন করনি যাতে অশ্রুত বিষয় জানা যায়, অচিন্ত্য ও অজ্ঞাত বিষয় জানা যায়? পুত্র তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে বিশদ জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি লোহমণি, বালা-কুন্তল, নরুণ ইত্যাদি ভূতবস্তুর উদাহরণ দিয়ে বললেন, নামরূপ হলো সত্যের বিকার, আসল মূলীভূত কারণ হলো সৎ। আর এইটা বুঝলেই সব জানা হয়ে যায়। এই 'সৎ' থেকেই ক্রমে ক্রমে আগুন, জল এবং অন্নের উৎপত্তি হয়। আর আগুনের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে 'বাক', জলের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে 'প্রাণ' আর অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ থেকে 'মন' উৎপন্ন হয়। কিন্তু অন্ন থেকে মন কিভাবে উৎপন্ন হতে পারে, তা শ্বেতকেতুর বোধগম্য হলোনা। পুত্র পিতার কাছে এর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা চাইলেন। উদ্দালক বুঝলন শুধু তত্ত্বকথা বললে বোঝা কঠিন। জীবনের মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা না হলে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি শ্বেতকেতুকে এক অভিনব পন্থা বাৎলালেন। তিনি বললেন, তুমি পনেরো দিন কেবল জলপান করে থাকো, আর তারপর আমার কাছে এস। শ্বেতকেতু জল ছাড়া আর কিছু না খেয়ে পনেরো দিন পরে পিতার সম্মুখীন হলে উদ্দালক তাঁকে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব ইত্যাদি থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাতে বললেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শ্বেতকেতু যার কিনা ওই সব নখদর্পণে তিনি কোন ঋকই মনে করতে পারলেন না; বললেন,—'ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি'। আরুণি পুত্রকে পনেরো দিন উত্তম আহার করে আবার তাঁর সম্মুখে আসতে বললেন। এবার কিন্তু তাঁর ঋকাদি বিস্মরণ হলো না—গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন।

ঘটনাটি এই, কিন্তু ভাববাদীরা এই ঘটনা ও একটি বাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষত শঙ্কর-রামানুজ যা ব্যাখ্যা করেছেন তারই অনুসরণ আমাদের পণ্ডিতদের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কিন্তু বিশ্বখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ইয়াকোবি (Jacobi) ও রুবেন (Ruben) এই ঘটনা ও অন্যান্য নানা তথ্য থেকে দেখাতে চেয়েছেন যে, উদ্দালক-শ্বেতকেতু অল্প-স্বল্প পরিমাণে হলেও বস্তুবাদী। এটা লক্ষ করার বিষয়, উদ্দালক আরুণির মুখ দিয়ে উপনিষদ সাহিত্যের কোথাও 'ব্রহ্ম' শব্দটি উচ্চারিত হয়নি, এবং 'সৎ' থেকে যে ভাবে আগুন, জল ও অন্নের উৎপত্তির বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন, যে-সব উদাহরণ গ্রহণ করেছেন, তাতে বস্তুকে (:ıatter) উপেক্ষা

কোথাও করেননি। এমন কি, ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্য অধ্যায়েও তিনি 'পৃথিবীকেই আত্মা' বলতে দ্বিধা করেননি।[৮] এহ বাহ্য, তৈত্তিরীয় উপনিষদেও অন্নের গুরুত্ব স্বীকৃত, ব্রহ্মে পেঁছানোর প্রথম সোপান অন্ন—ভূতবস্তু।[৯]

তা হলে ভারতীয় মনঃপ্রকৃতি কেবল নিছক কল্পনা, অলীকভাবনা ও নিগূঢ় রহস্যময় ভাবনার অনুসারীই ছিল না, ঋগ্বেদের যুগ থেকে নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে বস্তুবাদী ভাবনা ছিল, চিন্তা-ভাবনায় নানা বিরোধী-সমাবেশ ছিল, ক্রমশ পরিমাণ থেকে গুণের দিকে উত্তরণের প্রয়াস ছিল; যাস্ক যে ঐতিহাসিকদের কথা ও কৌৎস-এর* কথা বলেছেন, তার মধ্যে বৈদিক দেব-দেবীর অস্বীকৃতি, নানা মন্ত্রের অর্থহীনতা ও নিষ্ফলতার স্বকৃতি যা খণ্ডনের মধ্যে হয়তো উচ্চ পর্যায়ের কোন চিন্তায় উত্তরণের প্রচেষ্টাও ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এই ভাবনা—বস্তুবাদ ঘেঁষা ভাবনাই চার্বাক দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের পথ পরিষ্কার করেছিল মনে করলে গঙ্গার জল অপবিত্র হয়ে যাবে বলে মনে হয় না। এই সব কারণেই—ঋগ্বেদ, কৌৎস, উপনিষদ সাহিত্যের সাক্ষ্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভারতীয় চিন্তাভাবনা ও চেতনার ইতিহাসে দ্বান্দ্বিকতার—আদিম দ্বান্দ্বিকতার বীজ বর্তমান ছিল, অন্তত এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method)

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে, সত্য নিরূপণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত, কাজ চালানোর মত কোন পদ্ধতি না থাকলে, এলোমেলো-ভাবে করলে, যে-যার খুশীমত করলে, অনেক সময়ই যে মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না,—একথা না বললেও চলে। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা অনড়-অচল তা দিয়েও চলে না,—পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী এর অদল-বদল হয়। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলগতভাবে বিকাশশীল পদ্ধতি। তাই বার্নাল বলেছেন,—এটা কোন নির্দিষ্ট জিনিস নয়, এটা বিকাশশীল প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি like science itself defies definition. কিছু মানসিক, কিছু কায়িক প্রক্রিয়া নিয়ে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।[১০] বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রকৃতির এই নিরিখে ভারতীয়দের পদ্ধতির প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা যাক।

যন্ত্রপাতি নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষার ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতে

* কৌৎস-এর দৃষ্টিভঙ্গী পরের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

থাকলেও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এ-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে নিজেদের জড়িত করতেন না। বেদ-ব্রাহ্মণ-মনুর শ্লোক আওড়েই তাঁদের বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সহজে মিলত। বুদ্ধিজীবী ব্রাক্ষণ সম্প্রদায় চৈতন্য, আত্মা, পরলোক —তার বিবিধ বিভাগ, আর সংখ্যাতীত নরকের কল্পলোক সৃষ্টি করে সাক্ষরহীন জনসাধারণকে তাদের নিপীড়ন, নির্যাতন ও নির্লজ্জ শোষণকে পরলোকে ততোধিক সুখের প্রলোভনের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য নিত্য-নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। বর্ণপ্রথা তথা জাতিবৃত্তি অবলম্বন করে কামার, কুমোর, তাঁতি, ভিষক্‌, কবিরাজরা গতানুগতিক পদ্ধতিতে রসায়ন ও শিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রহসন করত। কখনো কখনো প্রতিলোমী সম্প্রদায় স্বাভাবিক বুদ্ধিবশে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি নির্মাণ করলেও, তা সচেতন ছিল না, তার পিছনে তাত্ত্বিক ভাবনা ছিল না। এই প্রযুক্তি বংশপরম্পরাগত চলত। ফলে, অচিরকালেই প্রাণশক্তি হারাত। মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অনুমান করেছেন, এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকেই ভারতীয়রা বৈজ্ঞানিক 'প্রকল্প' ও 'সাধারনীকরণ' করত।[১১] কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, তা সচেতন নয়, অন্তত প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে ; অবশ্য একথাও একই সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক বিজ্ঞানের উদ্ভব খুব বেশী দিন হয় নি। কিন্তু কোন কোন ভারতীয় রসায়ন ও অন্যান্য গ্রন্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি যে আসক্তি দেখা যায় তা যদি বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের 'ভেদে' আনুকূল্যের পরিবর্তে এই দিকে হতো, তা হলে বিজ্ঞানে ভারত যে অতি প্রাচীনকালেই বিপ্লব সূচিত করতে পারত,—এরূপ অনুমান নিছক কল্পনা বা অন্ধ দেশপ্রেম নয় বলে মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদয়নের 'কিরণাবলী'-তে ছাড়া বিজ্ঞানবহির্ভূত কোন গ্রন্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনা পাওয়া যায় না।[১২]

আচার্য শীলের মতে, সত্য নিরূপণের জন্য ভারতীয় দার্শনিকরা প্রধানত এই চারটি পদ্ধতি (Methodology) প্রয়োগ করতেন : 'প্রত্যক্ষণ' *(Perception)*' 'অনুমান' *(Inference)*, 'সাক্ষ্য' বা 'প্রমাণ' *(Testimoney)* ও 'গাণিতিক যৌক্তিকতা *(Mathematical Reasoning)*। এই পদ্ধতি তিনি ন্যায় ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের গ্রন্থ থেকে চয়ন করেছেন। বস্তুতপক্ষে, সত্য নিরূপণের এই পদ্ধতি একান্তভাবেই দার্শনিক পদ্ধতি। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সত্য নিরূপণে ব্যবহৃত হতো কিনা, এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সম্প্রতি দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আচার্য

শীলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নতুন মূল্যায়ন করেছেন তাঁর *History of Science and Technology in Ancient India* গ্রন্থে। তিনি আচার্য শীলের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, প্রাচীন ভারতে দার্শনিকরাই যেন সত্য নিরূপণের রাজপথ আবিষ্কার করেছিলেন, এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে গবেষণার সূক্ষ্মতা নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথা ছিল না,—এটাই শীলের অভিমত, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও যেন দার্শনিকদের মস্তিষ্ক প্রসূত। অধিকন্তু আচার্য শীল একথা বলতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি যে, এই পদ্ধতি বিশ্বসমস্যা সমাধানের দ্রাবক (solvent) অর্থাৎ এটা কেবল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানেই পারঙ্গম নয়, এমন কি চরম অধিবিদ্যক আলোক লাভেও সক্ষম।·[৩]

আর এক প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আচার্য শীলের সহিত ঐকমত্য পোষণ করেন না। তাঁর মতে ন্যায়-শাস্ত্রের উদ্ভব আয়ুর্বেদ সংহিতায় প্রাপ্ত নৈয়ায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। তিনি নবম শতাব্দীর নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্টের একটি উক্তি অবলম্বন করে এই সম্ভাবনার কথা বলেছেন। জয়ন্ত তাঁর ন্যায়মঞ্জরীতে অক্ষপাদের ন্যায়সূত্রের সম্ভাব্য সূত্র বা উৎস সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তার উপাদান 'শাস্ত্রান্তর' থেকে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই 'শাস্ত্রান্তর' বলতে আয়ুর্বেদই বোঝায় না, অন্য কোন শাস্ত্রও হতে পারে। কিন্তু *"The Nyaya-Sutra, however expressly justifies the validity of the Vedas on the anology of the validity of Ayur-Veda"*[১৪] বলে ন্যায়সূত্রকারের উপাদান সংগ্রহের উৎস আয়ুর্বেদ,—একে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এবং এইসব তথ্য থেকে এটা মনে হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দার্শনিকদের মস্তিষ্ক প্রসূত হওয়ার চেয়ে কর্মরত বিজ্ঞানীদের মধ্যেই বিকশিত হয়ে থাকবে : আর দার্শনিকরা সম্ভবত তাঁদের চিন্তাভাবনা নির্মাণে ও পরিপুষ্টি সাধনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমাবেশের ওপর অধিক না হলেও কিছুটা নির্ভর করতেন। সেইজন্যই সম্ভবত 'চরক সংহিতা'-য় বৈশেষিক ও 'ন্যায়সূত্র'-এর আদিরূপ দেখতে পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. "Men thought dialectically long before they knew what dialectics was, just as they spoke prose long before the term prose existed.—*Anti-Dühring*, p. 174

২. এই প্রসঙ্গে থিওডোর সত্চারবাৎস্কি রাসেলের একটি মত উল্লেখ করে বলেছেন,— "The remark made by the leading mordern mathematician-Philosopher, Bertrand Russell, that one wishing to be a philosopher must learn not to be scared of absurdity, is fully applicable to the Indian methods of work,"—*Scientific Achievements of Ancient India,* in studies of the History of Science in India (SHSI) vol,—1. p. 5

৩. স্তালিন, জে. ভি—'দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ', পৃ-১১

৪. শর্মা, রামশরণ—'প্রাচীন ভারত', পৃ-৫৮

৫. কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎকুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব ॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥
১০।১২৯।৬-৭

৬. কৌৎস ও অন্যান্য মতের আলোচনা 'চার্বাক দর্শন ; পৃ-৫৪ ; *The Nighantu and the Nirukta,* L. Sharup, p, 74 ; পরে কৌৎসকে নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হবে।

৭. ছান্দোগ্য—৬।২।১-২ ; ঋগ্বেদ—১০।৭২।২-৩

৮. রাজা অশ্বপতি জিজ্ঞাসা করলেন, "অথ হোবাচ উদ্দালকম্ অরুণিম্—গৌতম কং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্স ইতি ? পৃথিবীমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ।" ৫।১৭।১

৯. 'অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ' ৩/১ : 'অন্নং ন নিন্দাৎ।...প্রাণো বা অন্নম্' ৩/৭ ; 'অপো বা অন্নম্' ৩/৮ ; 'পৃথিবী বা অন্নম' ৩/৯ ; 'অহমন্নম্-অহমন্নম্- অহমন্নম্' ৩।১০

১০. Bernal, J. D—*Science in History*, p. 35

১১. SHSI, vol-1, p. 58-62

১২. Ibid, p, 39-40

১৩. Chattopadhyaya, D—*History of Science and Technology in Ancient India*, p, 32

১৪. Dasgupta, S. N—*A History of Indian Philosophy*, vol-II p, 399

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার্বাক পূর্বসুরী ঃ কৌৎস প্রমুখ

প্রাচীনকালে ভারতে বেদবিরোধী বলতে চার্বাকদের বোঝায়। কিন্তু এই কট্টর ও আপোষহীন বস্তুবাদী সম্প্রদায় ছাড়াও প্রাচীন ভারতে বেদের অপৌরুষেয়তা, তার মন্ত্র-তন্ত্রে অবিশ্বাসী মানুষের অভাব ছিল না। এক তো উপনিষদ সাহিত্যের মধ্যেই তার আভাস আছে, আবার অন্যত্রও আছে। যেমন,—যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থে কৌৎস নামে এক বিদ্বান ঋষির পরিচয় জানতে পারা যায়। এই কৌৎস ছিলেন ঘোরতর বেদবিরোধী। এই কৌৎস মনে করতেন, বেদের মন্ত্রের কোন যুক্তিপূর্ণ অর্থ হয় না—অর্থহীন মন্ত্র মাত্র।* যাস্ক তাঁর গ্রন্থে কৌৎস-এর মত অন্তত সাতজন ঋষি-পন্ডিতদের বেদবিরোধী মনোভাবের উল্লেখ করেছেন। অবশ্য যাস্ক স্বয়ং বেদবিরোধী নন; তিনি অভিযোগগুলি একে একে খণ্ডন করে বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে যাই হোক, আমরা এখন কৌৎস-এর কথায় ফিরে আসি।

যাস্ক কেন তাঁর গ্রন্থে বেদবিরুদ্ধ কথাবার্তার অনুপ্রবেশ ঘটালেন, তা বলা খুবই কঠিন। বস্তুত, এ-ধরনের একেবারে বিরুদ্ধ কথাবার্তা নিয়ে আলোচনা শ্রুতিবিশ্বাসী মানুষের বিশ্বাসে, ভাবনায় চিড় ধরাতে যে পারে তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে কি যাস্ক যুক্তিতর্কে বিশ্বাসী ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন মানুষ ছিলেন? বিরুদ্ধ মতাদর্শ বা বিপরীত মতাদর্শের প্রতি তাঁর কি শ্রদ্ধা ছিল যা তিনি উপেক্ষা না করে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছিলেন? এ-সব যাই হোক না কেন, যাস্কের কৌৎস প্রমুখ সম্বন্ধে উল্লেখ থেকে একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট যে, তাঁর আগে ও সময়ে বেদবিরোধী গোষ্ঠী ছিল, এবং খুব সম্ভব তাঁরা বস্তুবাদী বা বস্তুবাদীর কাছাকাছি কোন-অভিমত পোষণ করতেন এবং তাঁদের মতাদর্শ সম্বলিত গ্রন্থাদিও নিশ্চয় ছিল। তা না হলে যাস্কের পক্ষে তাঁদের সবার মতামত জানা সম্ভব ছিল না। সুতরাং যাস্কের মত গ্রহণ করলে চাবার্কদের ন্যায় কোন গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

আমরা এখানে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কৌৎস

* বিস্তারিত আলোচনা 'চার্বাক দর্শন'।

বোধ হয় কোন এক ধরনের বস্তুতান্ত্রিক মতাদর্শের নেতা ছিলেন। অবশ্য প্রাচীনকালের ভাষায় নেতা না বলে গুরু বা ঋষি বলাই সংগত। কিন্তু তিনি এই মতাদর্শের জনক নন, তবে অন্যতম প্রবক্তা। একথা বলার কারণ হলো বেদবিরোধী মনোভাব তাঁর আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছল। এই প্রসঙ্গে এল. সরূপের ধারণা যুক্তিসংগত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *The Nighaṇṭu and The Nirukta* গ্রন্থে বলেছেন,— "Its origin is probably to be sought in a sectarianism." প্রকৃতপক্ষে, অথর্ববেদে বিশ্বাসীরা এই বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঋগ্বেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যেই, সেই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই বেদবিরোধিতার বীজ নিহিত। অনেকের জানা যে, অথর্ববেদ দীর্ঘ সময় ধরে ঋক-সাম-যজু এই 'ত্রয়ী'-র মর্যাদা পায়নি, এমন কি মহাভারতের অনেক জায়গায় বেদত্রয়ীর কথাই আছে। কিন্তু অথর্ববেদবাদীরা সাফল্যলাভ করেছিলেন ; শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা চার বেদ না মেনে পারেন নি। যাই হোক, অথর্ববাদীদের ঘোরতর আন্দোলন ত্রয়ীর পক্ষে মোটেই সুখকর ছিল না, ক্রমে সন্দেহবাদের জন্ম দিল ; বস্তুবাদ বা বাস্তববাদের মত একটা-কিছু মতাদর্শের জন্ম দিল। এখানে সরূপের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারলাম না। অথর্ববেদের প্রচারকদের আন্দোলন, তাঁদের ত্রয়ী আক্রমণ থেকে কিভাবে সন্দেহবাদের উদ্ভব ঘটল, এবং উপনিষদের যুগেও বিরুদ্ধ মতাদর্শের প্রতি সেকালের বিদ্বান ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল, সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,—"But their method of discrediting the other *Vedas* gave rise to a movement of inquiry and scepticism, a movement—the traces of which can still be discovered in isolated passages of the *Āraṇyakas* and the *Upaniṣads*. Besides the fact that the anti-Vedic ideas have been preserved in the *Āraṇyakas* and the *Upaniṣads*, which. according to the orthodox tradition, are a part of the scriptures, indicates that the movement must have been important and wide spread, so much so that even some of the Vedic scholars came under its influence and freely gave expression to their heterodox views, some of which have survived."[১ক]

কেবল বেদবিরোধী সম্প্রদায় বলতে কৌৎস, অথর্ববেদীয় আন্দোলনকারীরাই নয়, খ্রীস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথম দিকে আরো অনেকে ছিলেন।

যেমন, আমরা ঋষি ভরদ্বাজের নাম করতে পারি। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই ঋষির চার্বাক মতানুসারী কথা লক্ষ করা যায়। এমন কি, তাঁর কথার মধ্যে চার্বাক লোকগাথা পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে। মৃত্যুতেই সবশেষ—লয়, তার পর আর কিছুই নেই, একথা তিনি ভৃগুকে বলতে দ্বিধা করেননি। তা ছাড়া চার্বাকদের লোকগাথা—'ভস্মীভূতদেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'—দেহ ভস্মীভূত হলে তার পুনরাগমন কি প্রকারে সম্ভব, যুক্তির নিরিখে উপস্থাপিত হয়েছে। সেইজন্যই ঐতিহাসিকরা তাঁকে চার্বাকদের পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ-বিষয়ে পরে আরো আলোচনা আছে। এ-ছাড়াও ভেবার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *History of Indian Literature*-এ চার্বাকদের সম্বন্ধে কৌতূহলপ্রদ কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি বলেন শুক্ল যজুর্বেদের পরে কৃষ্ণ যজুর্বেদের উদ্ভব, এবং উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, নানা মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল। 'অধ্বর্যু' বলতে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ববিদদের বোঝায়। আর 'চরকাধ্বর্যু' বলতে এদের প্রতিবাদীদের বোঝায়। শুক্ল যজুর্বেদে অধ্বর্যু ও চরকাধ্বর্যুদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংস্রতার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, চরকাচার্য বলে কোন এক ব্যক্তিকে নরমেধ যজ্ঞে বলি দেওয়া হয় তার 'দুষ্কৃত' কর্মের জন্য। কিন্তু ভেবার এ-বিষয়ে মন্তব্য করছেন—"This is all the more strange, as the term Charaka is otherwise always used in a good sense, for "travelling" scholar ;...The explanation probably consists simply in the fact the name Charakas is also, on the other hand, applied to one of the principal Schools of the Black Yayus, whence we have to assume that there was a direct enmity between these and the adherents of the White Yuyus, who arose in oposition to them—a hostility similarly manifested in other cases of the kind."*

এই সীমিত আলোচনা থেকে এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, প্রাচীন ভারতে চার্বাকপন্থীরা একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তবে সেই ধূসর প্রাচীনকাল থেকে তাদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়নও কম হয়নি। কিন্তু সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের কখনো মৃত্যু হয় না। তাই তাদের পুঁথিপত্রাদি আজ অবলুপ্ত হলেও, শি হুয়াং-তির মত পুড়িয়ে দিয়ে তাদের অনেককে জীবন্ত কবর দিলেও তাদের শক্তিশালী মতবাদ ভারতে দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। বস্তুত, বেদ-ব্রাহ্মণ বিরোধিতা ভারতীয় ঐতিহ্যে বিদেশী পণ্ডিতদের

আমদানি নয়, এটা একেবারে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাধনার অংগ, সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান।* ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ, অধ্যাত্মবাদের দেশ, আত্মাকর্মফল-পুনর্জন্মের দেশ, একথা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়।

ভারতীয় বস্তুবাদ : চার্বাক মতাদর্শ

ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় চিন্তা-ভাবনায় অতীন্দ্রিয়তা, পারলৌকিক-সর্বস্বতা অনুপ্রবিষ্ট হয়নি ; আরণ্যক-উপনিষদের যুগেও ভাববাদের বন্যায় বিদ্বান-জগৎ প্লাবিত হয়নি ; যাস্কের 'নিরুক্ত' রচনার কালে এবং তাঁর আগেও যে বেদবিরোধিতা ছিল, তার সাক্ষ্য-প্রমাণও অলভ্য নয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতে কট্টর বস্তুবাদী ও বেদবিরোধী দর্শন একমাত্র চার্বাক বা লোকায়ত মতাদর্শ। যদিও এই মতাদর্শ জানার জন্য কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না, তবুও বিভিন্ন সূত্র থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্তব্য ও আলোচনা অবলম্বন করে প্রখর এই বস্তুবাদী মতাদর্শটির বেশ কিছুটা জানা যায়। চার্বাক-মত জানার মোটামুটি তিনটি উৎস : চার্বাকদের লোকগাথা যা ভাববাদী দার্শনিকদের রচনাবলীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ; দ্বিতীয় উৎসটি হলো এই দার্শনিকরা 'পূর্বপক্ষ' হিসাবে চার্বাক-মত ব্যক্ত করে তা খন্ডন করার জন্য যে-আলোচনা করেছেন ; আর শেষ উৎসটি হলো 'নিরুক্ত', 'অর্থ-শাস্ত্র', 'রামায়ণ', 'মহাভারত, 'উপনিষদ, 'পুরাণ' ইত্যাদি বিশাল গ্রন্থরাজির মধ্যে চার্বাক মতাদর্শ অথবা বস্তুবাদ-ঘেঁষা ইতস্তত মন্তব্য।

লোকগাথাগুলির মধ্যে চার্বাকদের ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল ইত্যাদি সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায়। এতে লজিকের সূক্ষ্ম যুক্তি বিস্তার দেখা যায়না বটে, কিন্তু এতে যে তাঁদের মতের পক্ষে কিছু কিছু যুক্তি আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এই লোকগাথা থেকে তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি অনুরাগ, দেহাত্মবাদের ঘোষণা সম্পর্কে জানা যায়। এই লোকগাথাগুলি পড়লে এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এতে তাঁদের দার্শনিক ভাবনার মূলকথা অল্প-স্বল্প হলেও নিহিত আছে। দ্বিতীয় উৎস অর্থাৎ 'পূর্বপক্ষ' হিসাবে গৃহীত ভাববাদী দার্শনিকদের চার্বাকমতটি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, অনেক সময় বিরোধী-

---

*Radhakrishnan, S—*Indian philosophy* vol-I, p. 272-276.

পক্ষ যে-মতের সমালোচনা বা খণ্ডন করেছেন, তা অনেকাংশে বিকৃত। সুতরাং দ্বিতীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত চার্বাক-মত যে একেবারে নির্ভেজাল, আগ মার্কা, 'ভেজাল প্রমাণে হাজার টাকা পুরস্কার'-এর মত হবে, তার কোন মানে নেই। কিন্তু তৃতীয় উৎস অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত বস্তুবাদী ভাবনা, রামায়ণ-মহাভারতে ছড়িয়ে থাকা বস্তুবাদী মত ও চিন্তা, পুরাণে বস্তুবাদী আদর্শের প্রতি বিষোদ্গার ইত্যাদি আমাদের কাছে এই বার্তা বহন করে আনে যে, প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী মত—চার্বাকদের মতন কোন-মত প্রচলিত ছিল।

এহ বাহ্য। চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা, এমন কি ন্যায়-বৈশেষিকদের মধ্যেও বস্তুবাদী মতাদর্শের পোষণ লক্ষ করা যায়। বিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, 'ন্যায়'-এর উৎস চরক সংহিতায় নিহিত। কণাদের 'বৈশেষিক সূত্র' ও গৌতমের 'ন্যায় সূত্র'-এ বস্তুবাদের প্রতি একেবারে শঙ্করসুলভ খড়্গহস্ত ভাব নেই। কিন্তু কালে কালে ন্যায়-বৈশেষিকরা চার্বাক-মত সমর্থন করেননি; অধিকিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লেগেছেন। অবশ্য এটা অকারণে হয়নি, কিন্তু তা পরে আলোচিত হবে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের উদ্ভব, বিকাশ ও সমৃদ্ধির বিষয়টি ঠিক মত বুঝতে গেলে চার্বাক মতাদর্শের সারকথাগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। তা হলে, আমার মনে হয়, প্রাচীন ভারতে পরমাণুবাদের উদ্ভব ও বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতিটি স্পষ্ট হয়। আমরা খুব সংক্ষেপে চার্বাকদের **প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দেহাত্মবাদ ও স্বভাববাদ**-এর আলোচনা করব।

১. প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ভারতীয় ভাববাদী দার্শনিকরা সবাই হৈহৈ রৈরৈ করে চার্বাকদের নিন্দা করে বলেছেন, এঁরা **প্রত্যক্ষ প্রমাণ** ছাড়া আর কিছু স্বীকার করেননা; **অনুমান** বলে যে-প্রমাণ সবাই স্বীকার করে, তা এঁরা গ্রাহ্য করেন না। নাগার্জুন, শঙ্কর, বাচস্পতি মিশ্র, হরিভদ্র সূরি, গুণরত্ন, জয়ন্তভট্ট, মাধব প্রমুখ ভর্ৎসনা, নিন্দা, এমন কি গালাগালি পর্যন্ত করতেও ছাড়েননি। বাচস্পতি চার্বাকদের জীবিত অবস্থায় মহানরকে গমনের কথা বলেছেন [কি করে জানলেন কে জানে !], আর গরু-ছাগলের মতও এদের জ্ঞানগম্যি নেই,—হিত-অহিত জ্ঞান নেই বলে সদম্ভ উক্তি করেছেন। কিন্তু বাচস্পতি

প্রমুখ যাই বলুন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে চার্বাকরা কি বোঝাতে চাইতেন সেটা আলোচনা করা যাক।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' গ্রন্থে জানাচ্ছেন, চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলতে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সব প্রমাণের সেরা প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষ প্রমাণ, দর্শনের ভাষায় 'প্রমাণ-জেষ্ঠ্য'। তবে চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়াও অন্য প্রমাণ স্বীকার করতেন। যেমন,—অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে তাঁদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তা শর্তসাপেক্ষে। কি রকম? অনুমান প্রমাণ অবশ্যই হবে বাস্তবভিত্তিক। ইহলৌকিক অর্থাৎ এই জগতের বিষয়ে অনুমান প্রমাণ স্বীকারে আপত্তি নেই, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু অবাস্তব বিষয়ে, যেমন—ঈশ্বর, আত্মা, কর্মফল ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ে অনুমান চার্বাকদের কাছে— বস্তুবাদীদের কাছে গ্রাহ্য নয়। নিষ্ফল অনুমান, শূন্যগর্ভ অনুমান কিরূপ বিভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, সে-সম্পর্কে হরিভদ্রের 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়'-এর এই চার্বাক লোকগাথা থেকে জানা যায়ঃ

লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো* ন নির্বৃতিঃ।
ধর্মাধর্মৌ ন বিদ্যতে ন ফলং পুণ্যপাপয়োঃ॥
এতাবানেব লোকোহয়ং যাবানিন্দ্রিয় গোচরঃ।
ভদ্রে! বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ॥

অনুবাদঃ "লোকায়তরা বলেনঃ দেবতা বলে কিছু নেই, মোক্ষ বলেও নয়। ধর্ম ও অধর্ম বলে কিছু হয় না, পুণ্য ও পাপের ফল বলেও নয়। যতোটুকু ইন্দ্রিয়গোচর ততোটুকুই ইহলোক (অতএব সত্য)। হে ভদ্রে! নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখো এবং তা থেকে মহাপণ্ডিতরাও কী বলেন ভেবে দেখো।"[১]

শেষের লাইনে যে গল্পটি আছে, তা না জানলে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব। গল্পটি সংক্ষেপে এরকমঃ কোন এক নাস্তিকের আস্তিক স্ত্রী ছিল। কিন্তু নাস্তিক কিছুতেই স্ত্রীকে নিজের বশে আনতে পারছিল না—নাস্তিক বানাতে পারছিল না। সে-জন্য সে একটি ফন্দী আঁটল। এক গভীর রাতে দু-জনে নগরের বাইরে গেল; আর নাস্তিক নগরের দরজা থেকে চৌমাথা পর্যন্ত ধুলোয় নেকড়ের ছাপ এঁকে রাখল। ব্যস্, কিস্তি

পাঠভেদ—জীবো, 'চার্বাক দর্শনম,' বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, পরিশিষ্ট, পৃ-৪৩

মাৎ! তারা ঘরে ফিরে এল। কিন্তু পরদিন সকালে আস্তিক মহাপণ্ডিতরা নেকড়ের পায়ের ছাপ দেখে গম্ভীর তর্কবিতর্ক শুরু করে দিল। শেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো নিশ্চয় নগরে রাতে নেকড়ে এসেছিল; তাই তার পায়ের ছাপ পড়েছে।

হরিভদ্রের ভাষ্যকার মণিভদ্রে এই গল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলছেন, "(বক্তব্য এই যে) যেমন ঐ ব্যক্তি তার মুগ্ধ পত্নীর বৃকপাদ দেখার আগ্রহ প্রকৃত বৃকপাদ না দেখিয়ে শুধুমাত্র নিজের আঙুল দিয়ে আঁকা ছবি দেখিয়ে অপরকে প্রবঞ্চনা করতে পারে তেমনি দক্ষ, কপটধার্মিক ব্যক্তিরাও কিছু কিছু অনুমান, শাস্ত্র প্রভৃতির দোহাই দেখিয়ে সাধারণ লোকের মনে স্বর্গ-সুখ ইত্যাদির প্রলোভন জাগিয়ে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, গ্রাহ্য-ত্যাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সংকটে ঠেলে দেয়...। পরমার্থতত্ত্ব-বেত্তা বলে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা এইভাবেই (প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান, শাস্ত্র, প্রভৃতি) প্রমাণের দোহাই দেখিয়ে থাকে।"[২]

এরূপ মনে হতে পারে যে, চার্বাকরা **প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমান** মানলেও অন্য আরো যে ছ'রকমের প্রমাণ আছে তা মানতেন না। কিন্তু ভাববাদী সব দার্শনিকই কি আট রকমের প্রমাণ মানেন? দেখানো যায় যে, নাগার্জুন থেকে একেবারে মাধব পর্যন্ত প্রায় সব তাবড়-তাবড় দার্শনিকরা কোন প্রমাণই মানেন না। নাগার্জুন 'প্রমাণ-বিধ্বংসন' লিখেছেন, শঙ্করাচার্য তো শাস্ত্র-প্রমাণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ মানতেই রাজী নন, আর শ্রীহর্ষ তাঁর 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য'-তে সব প্রমাণ নস্যাৎ করার সুচতুর আয়োজন করে শঙ্করের বেদান্ত মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সবার ওপরে মনু তো খুলেই বলেছেন শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি (ধর্মশাস্ত্র) চরম প্রমাণ। এসবের বাইরে যে যাবে তার 'নাহিক পরিত্রাণ',—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও রেহাই পাবেন না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিটাই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর—পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতেই অনুমান যুক্ত হয়ে তত্ত্বের জন্ম হয়। বিজ্ঞানের অনুমান ঊর্ধ্বমূলীয় নয়, তার মূল দৃঢ়-সংযুক্ত বাস্তব পরীক্ষার ওপর যা কিনা চার্বাক মতের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ—সর্বাংশে না হলেও তার বাস্তববাদিতার ওপর। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানেরও

বিকাশ ও উন্নতি যে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ নির্ভর ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার আভাস-ইঙ্গিত একেবারে বিরল নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তার নজির দেখিয়েছেন। কিন্তু তারও আগে সুশ্রুত সংহিতায় এর সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। এক সময় এদেশে শবদেহ স্পর্শ করাই পাপ বলে বিবেচিত হতো; ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মধুসূদন গুপ্তকে কেন্দ্র করে মেডিক্যাল কলেজে কিরূপ সোরগোল উঠেছিল, তাও আজ অজানা নয়। কিন্তু প্রাচীনকালে—সুশ্রুতের সময় বা তাঁর আগে এরকম ছিল না; তখন শবব্যবচ্ছেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানে অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতো। সুশ্রুতের শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়ে আয়ুর্বেদবিশারদের গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "...যিনি শবচ্ছেদ দ্বারা শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং শাস্ত্রে তৎসমস্ত অবগত হইয়াছেন, তিনিই আয়ুর্বেদবিশারদ।"[৩]

আয়ুর্বেদের আকর গ্রন্থে কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণই নয়, যুক্তিতর্ক ও অনুমানের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে ন্যায় দর্শনের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে চরক সংহিতায় পৌঁছানো যায়। ব্যাপারটা নিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।[৪]

চরক সংহিতায় (১।১১।২১-২২) অনুমানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ "যাহা প্রত্যক্ষপূর্ব, ত্রিবিধ এবং তিনকালেই অনুমেয় তাহাকে অনুমান বলে।" অনুমান তিন রকমঃ **কারণ-অনুমান, কার্য-অনুমান** ও **সামান্যদৃষ্ট-অনুমান**। উদাহরণ হিসাবে বলা হয়েছে, "ধূম দ্বারা বর্তমান অগ্নির অনুমান, গর্ভ দেখিয়া অতীত মৈথুনের অনুমান এবং বীজ দেখিয়া সেই বীজে একবার যেরূপ ফল ফলিয়াছিল, এবারেও তৎসদৃশ ফল ফলিবেক, এরূপ ভবিষ্যৎ অনুমান করা যায়।" ন্যায় দর্শনেও ওই একই কথা অন্য ভাষায় বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বিষয়ে আলোচনা করে ন্যায় সূত্রকার গোতম বলছেনঃ প্রত্যক্ষবিশেষমূলক জ্ঞান অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধঃ পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সমান্যতোদৃষ্ট। ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মতে ন্যায় সূত্রকার তাঁর সূত্রে যে-কথাটি বলতে চেয়েছেন, তা হলো "প্রত্যক্ষের জ্ঞান ব্যতীত অনুমানের জ্ঞান হইতে পারে না।"[৫]

২. দেহাত্মবাদ

চার্বাকরা আত্মা মানেন না, দেহ মানেন—দেহ ছাড়া আর কিছু তাঁরা মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, আত্মা বলে যদি কিছু মানতেই হয়, তা

হলে দেহকেই আত্মা বলে মানতে হবে। কী সাংঘাতিক কথা! তাই ভাববাদী দার্শনিকরা একযোগে চার্বাকদের দেহাত্মবাদী বলে অভিযোগ করেছেন। চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কে ধারণাটি জানতে গেলে তাঁদের একটি লোকগাথার উল্লেখ করতে হয়। এটি মাধবের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এ আছে।

অত্র চত্বারি ভূতানি ভূমি-বারি-অনল-অনিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যঃ চৈতন্যম্ উপজায়তে ॥
কিণ্ব—আদিভ্যঃ সমেতেভ্যঃ দ্রব্যেভ্যঃ মদশক্তিবৎ।
অহং স্থূলঃ কৃশঃ অস্মি ইতি সামানাধিকরণ্যতঃ ॥
দেহঃ স্থৌল্য-আদি-যোগাৎ চ স এব আত্মা ন চ অপরঃ।
মম দেহঃ অয়ম্ ইতি উক্তিঃ সম্ভবেৎ ঔপচারিকী ॥

অনুবাদ ঃ "এখানে মাটি, জল, আগুন, বাতাস—শুধুমাত্র এই চার রকম ভূতবস্তুই বর্তমান। এই চার রকম ভূতবস্তু থেকেই চৈতন্য উৎপন্ন হয়—যেমন কিণ্ব প্রভৃতি বস্তুগুলি থেকেই মদশক্তি উৎপন্ন হয়। 'আমি মোটা', 'আমি রোগা'—এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আসলে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্পর্কই বর্তমান। 'মোটা' প্রভৃতি শব্দ দেহেরই বিশেষণ বলে স্বতন্ত্র কোনো আত্মার কথা অবান্তর। 'আমার দেহ'—জাতীয় কথা নেহাতই কথার কথা—যাকে বলে উপচার।"[৬]

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, চার্বাক-মতে দেহ গঠনের মূল উপাদন চারটি—মাটি, জল, বাতাস ও আগুন। এগুলি সবই ভূতপদার্থ অর্থাৎ অচেতন বা জড়। চর্বাক-মতে নিছক জড় বা অচেতন থেকেই চেতনাবিশিষ্ট দেহের উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে তাঁদের মোক্ষম উদাহরণ হলো মদ তৈরীর ব্যাপার মদ। প্রস্তুতিতে যে-সব উপাদান দরকার, যেমন, কিণ্ব—খামির বা গাঁজ—এ-সবের মধ্যে মদের যে-ক্রিয়া নেশা-হওয়া সে-গুণটি নেই, অথচ এ-সব বস্তু থেকেই মদ তৈরী হয়, আর খেলে—বেশী পরিমাণ খেলে তো কথাই নেই, নেশা মায় মাতলামি পর্যন্ত হয়—গিরেবাজ পায়রার মত লুঠেলুঠে পথ চলতে হয়। আর ঠিক একইভাবে মাটি, জল, ইত্যাদি ভূতগুলিই দেহ আকারে পরিণত হলে তাতেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। অতএব, চার্বাক-মতে আত্মা 'আৎমা' ছাড়া আর কিছু নয় : আর শব্দটি যদি বলতেই হয়, তা হলে আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছু নয় ঃ 'তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা'।

ভাববাদীরা চার্বাকদের মদের দৃষ্টান্ত নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সম্ভবত ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মুখীন হওয়া কঠিন বা অসম্ভব ভেবে। তাঁরা কিন্তু

অন্যপথ ধরেছেন। ভাববাদীদের দৃঢ় মত, অচেতন থেকে অচেতন, চেতন থেকে চেতন হয় ; কোন ব্যতিক্রম নেই, থাকবেও না। চার ভূত অচেতন, জড়, আর মানুষ চেতনাবিশিষ্ট। সুতরাং জড় থেকে চেতন হবে কি করে? অতএব, আত্মা বলে চেতন কোন-কিছু না মানলে ব্যাখ্যা হয় কি করে? কিন্তু বেশ জম্পেস ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে চার্বাকদের চিৎ করতে না পারলে আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড় হয়। তাই তাঁরা মৃতদেহ অর্থাৎ মড়ার উদাহরণ হাজির করলেন তর্কের দরবারে। তাঁদের বক্তব্য হলো চৈতন্য যদি কেবল দেহেরই গুণ বা লক্ষণ হয়, তা হলে যতক্ষণ দেহ আছে বা যেখানেই দেহ আছে, সেখানেই ততক্ষণ চৈতন্য থাকবার কথা। কিন্তু মানুষ মরে গেলে দেহ থাকে অথচ চৈতন্য থাকেনা। জয়ন্ত ভট্টের ভাষায়ঃ "শরীরং চৈতন্য-শূন্যং, শরীরত্বাৎ, মৃতশরীরবৎ"—শরীর আসলে চৈতন্যশূন্য, কেননা তা নিছক শরীর, যেমন কিনা মৃতদেহ"। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রায় সব ভাব-বাদীরাই চার্বাকদের দেহাত্মবাদকে ভারত মহাসাগরে ছুঁড়ে ফেলার প্রয়াস পেয়েছেন।* অবশ্য চার্বাকরা এর বিরুদ্ধে কি বলেছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু আমরা ভাববাদীদের (এখনো পিলপিল করছেন) প্রশ্ন করতে পারিঃ মৃতদেহ আর জীবন্তদেহ কি এক? মড়ার লক্ষণ কি, আর জ্যান্তের লক্ষণ কি? উভয় লক্ষণ কি এক? কিন্তু ভাববাদী দার্শনিকরা তর্কাতর্কির সময় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে যখন মাটি থেকে তেল বা তেল থেকে ঘট তৈরীর মত সিদ্ধান্তে এসে পোঁছান, তখন অবাক হবার আর কিছুই বাকী থাকে না।[৭]

দেহাত্মবাদ ও বিজ্ঞান

দেহাত্মবাদ অর্থাৎ দেহই হলো আত্মা ; তাছাড়া আলাদাভাবে আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই,—একথা বলা খুব সহজ নয়। যদিও আমরা দেখছি উপনিষদ, নিরুক্ত, আদি সাংখ্য, ন্যায়, বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদের মধ্যে বস্তুবাদী ধারণা প্রকট ও প্রখর না হলেও অল্প-স্বল্প ছিল, তবে চার্বাকদের মত কট্টর বস্তুবাদ সে-সবে দেখা যায় না। তবুও অথর্ববেদে যার সূচনা বা তারও আগে সেই বাস্তব ঘেঁষা ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই চার্বকদের স্বাধীন চিন্তা, ভাবনা ও প্রচার করা সম্ভবপর করে তুলেছিল বলে মনে হয়। খুব সম্ভব

*মহাভারতের জনদেব-পঞ্চশিখ সংবাদে পঞ্চশিখ চার্বাক মত খণ্ডন করতে গিয়ে এই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ; পৃ-৬১২, ৩য় খণ্ড।

এই বাস্তব পরিস্থিতির ও ভিত্তির ওপর চরক-সুশ্রুত ও তাঁদের অনুগামীদের প্রত্যক্ষণ-পরায়ণতা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ এবং সেই অনুসারে স্মৃতি-বিরুদ্ধ আয়ুর্বেদিক নীতি ও বক্তব্য প্রকাশ করতে অসুবিধে হয়নি। চার্বাকরা যে বাস্তব পরিস্থিতি, যে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পোষকতা করতেন তা-ই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় গবেষণা করার সুযোগ অব্যাহত রেখেছিল।

চার্বাকদের মদশক্তির দৃষ্টান্তের বৈজ্ঞানিক মূল্য যে কী অপরিসীম, তা মদশক্তি নিয়ে নানা দেশে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করলে স্পষ্ট হয়। মদ এখনো খোদ ইংরেজদের কাছে *Spirit*। Spirit-এর আসল মানেটা হলো ভূত-প্রেত ধরনের একটা-কিছু। মদ খেয়ে অনেকে তাণ্ডব রকমের কাণ্ডকারখানা করে, এমন কি সবল, সুস্থ, একেবারে ভীষণ ভদ্র-লোকও অদ্ভুত ব্যাপার করে বসেন। সেইজন্যেই সম্ভবত মদ-এর সঙ্গে অলৌকিক ভূত-প্রেতের সম্পর্ক অন্বিত হয়ে থাকবে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত বার্নাল-এর উদ্ধৃতি না দিয়ে পারা গেল না। রসায়নবিদ পারাসেলসাস-এর (Paracelsus) মতে, "The crucial process of Chemistry, distillation, was essentially a process of capturing the invisible spirits those from a boiling liquid. That such spirits were indeed powerful was only too evident from the effect of drinking them."[৮] সপ্তদশ শতাব্দীর হেলমোসের ধারণাও এই রকম অর্থাৎ শুঁড়ির ভাঁড় থেকে এক ধরনের ভূত-প্রেত ধরার কৌশল। এ হেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে চার্বাকদের ধারণা যে বিপ্লবাত্মক তাতে সন্দেহ করার নেই বলে মনে হয়।

ভূতবস্তু অর্থাৎ জড় বা অচেতন পদার্থ থেকে চৈতন্যের উদ্ভব,—এই ধারণাটি খুবই অসম্ভব রকমের বৈপ্লবিক। শত শত বছর আগে প্রাচীন ভারতে চার্বাকরা কিভাবে এই ধারণা অর্জন করলেন, সে-কথা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকেনা। আধুনিক বিজ্ঞানে জেনেটিক কোড, ডি. এন. এ., আর. এন. এ. ইত্যাদির কথা ভাবলে চার্বাকদের ওই সিদ্ধান্ত কোন জাতের ছিল কিছুটা আভাসে-ইঙ্গিতে বোঝা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার গতি-প্রকৃতি, প্রবণতা যে ভূতবস্তু অতিরিক্ত কোন আত্মার কথায় ফিরে যাবার দিকে নয়, তা বোধ করি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও সম্যক অবগতির মধ্যে। অবশ্য একথা ঠিক যে, প্রাণ, চৈতন্যের উৎপত্তি বা উদ্ভবের সমস্যা এখনো বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। কিন্তু তা হলেও আধুনিক বিজ্ঞান

মৌল পদার্থ ছেড়ে ঘোলাটে আত্মারূপ ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছেনা,— একথা তো জোর করেই বলা যায়। চার্বাকদের মতাদর্শ বিশ্লেষণ করলে এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, ভারতীয় বিজ্ঞানের যতটা বিকাশ ও উন্নতি হয়েছিল, তার তত্ত্বগত ভিত্তি বা কাঠামো চার্বাক মতাদর্শের নানা উপাদানেই নিহিত।

৩. স্বভাববাদ

একথা সত্য, চার্বাকরা স্বভাববাদ-এর (*Naturalism*) প্রথম প্রবক্তা নন। কিন্তু তাঁরা যে স্বভাববাদের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোন হেতু নেই। বস্তুত, স্বভাববাদের অন্তর্নিহিত ধারণার সঙ্গে তাঁদের বস্তুবাদী ধারণার পরিকাঠামো খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যাই হোক, ঐতিহাসিক বিচারে স্বভাববাদের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-এ। এই উপনিষদে ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণ বলে ঘোষিত হবার আগে সেকালে এ-বিষয়ে যে-সব মত প্রচলিত ছিল তার উল্লেখ দেখা যায়। আমরা প্রাসঙ্গিক অংশটি উদ্ধৃত করছি ঃ

কালঃস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন তাত্মভাবাদাৎ আত্মাহপি অনীশঃ সুখদুঃখহতোঃ ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যুগে বা তারও আগে প্রচলিত ছ-টি মত হলো 'কাল', 'স্বভাব', 'যদৃচ্ছা', নিয়তি', 'ভূতবস্তু' ও 'যোনি-পুরুষ'। আমরা এখানে কেবল 'স্বভাব' ও 'ভূতবস্তু' নিয়ে সামান্য আলোচনা করব এইজন্য যে, এদের সঙ্গে চার্বাকমতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়ের মূলে রয়েছে 'স্বভাব', আর কিছু নয়। স্বভাবই পরম সত্য। অন্য মতটি হলো ভূতবস্তুই পরম সত্য। ভূতবস্তু মতটার সঙ্গে চার্বাক-মতের মিলটা কষ্ট করে ভাবতে হয় না। উপনিষদের মধ্যে লোকায়ত বা চার্বাক শব্দের উল্লেখ না পাওয়া গেলেও বস্তুবাদের ছোঁয়া দেখা যায় না, তেমন নয়। ভূতবাদ ও স্বভাববাদ—এই দুই-এর সম্পর্ক উপনিষদে আলোচিত না হলেও পরবর্তীকালের সাহিত্যে দেখা যায়। সেইজন্য প্রখ্যাত পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন,—"মনে হয় চরম স্বভাববাদের প্রতিনিধি বলতে সুপ্রাচীন ভারতের একদল একেবারে স্বাধীন চিন্তাশীল ছিলেন ; আদিতে এঁদেরই লোকায়ত বলে উল্লেখ করার প্রথা ছিলো, কিন্তু পরবর্তীকালে এঁরাই অনেক ব্যাপকভাবে চার্বাক নামে

অভিহিত হন। তাঁদের মতের আদি রূপটির বৈশিষ্ট্য বলতে কট্টর বস্তুবাদ, অদৃষ্টে (অর্থাৎ কর্মফলে) অবিশ্বাস, আপোসহীন যুক্তিবাদ বা হয়তো বিতণ্ডাও। মহাভারতে বলা হয়েছে "স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ"—যাঁরা কেবল ভূতবস্তুর চিন্তা করেন তাঁরাই স্বভাববাদী। কিন্তু ভারতীয় স্বভাববাদ ও চীনা স্বভাববাদ এক নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। চীনে তাও-পন্থীরা ছিলেন স্বভাববাদী এবং এই মতবাদ সেখানে প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের বিকাশে সহায়তা করেছিল।[৯] বৃহৎসংহিতার ভাষ্যকার ভট্টোৎপল বলেন, লোকায়িতকরা স্বভাবকেই জগৎকারণ বলে স্বীকার করেন ; মাধবাচার্য তাঁর 'সর্বদর্শন সংগ্রহ'-এ বলেছেন, চার্বাকরা জগৎ বৈচিত্র্যের কারণ হিসাবে 'স্বভাব' স্বীকার করেন। এই সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে প্রাপ্ত চার্বাকদের লোকগাথা হলো :

অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতলং সমস্পর্শস্তথাঽনিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

অনুবাদঃ "অগ্নি উষ্ণ, জল শীতল, বাতাস গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। এত বৈচিত্র্য কার সৃষ্টি? (কারুরই নয়) স্বভাবের জন্যই এগুলি ওই রকম।"[১০]

হরিভদ্র সূরিও লোকগাথা উদ্ধৃত করে চার্বাকদের স্বভাববাদের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা থাক, আধুনিক বিদ্বানদের কথায় আসা যাক। আমরা দেবীপ্রসাদের বইটি থেকে হিরিয়ান্নার বক্তব্য উদ্ধৃত করি : "এককালে স্বভাববাদ নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রচলিত ছিলো, কেননা শঙ্কর (ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ১।১।২) প্রভৃতি পুরোনো কালের দার্শনিকদের রচনায় আমরা তার উল্লেখ পাই। মহাভারত-এর নানা প্রসঙ্গে মতটির পরিচয় আছে (১২।১৭৯, ২২২ ও ২২৪)। মতটি প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হলো তার বস্তুতান্ত্রিকতা (Posivistic Character)। 'অদৃষ্টবাদ'-এর বা প্রকৃতি-অতীত বিষয়ের সঙ্গে স্বভাববাদের ঐকান্তিক বিরোধ থেকেই তা সুস্পষ্ট।...মনে হয় 'লোকায়ত' (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহলোক সংক্রান্ত দর্শন) বলতে আদিতে স্বভাববাদের এই বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই বোঝাতো, যদিও পরবর্তী সাহিত্যে লোকায়ত শব্দটিই সাধারণভাবে প্রচলিত।...স্বভাববাদের বিশেষ প্রবণতা বলতে প্রকৃতি-অতীত বস্তু অস্বীকারই। এইভাবেই স্থায়ী আত্মা অস্বীকার করার ফলে সাধারণত কর্মফল বলতে যা বোঝায় তাও স্বভাববাদে অস্বীকৃত।...স্বভাববাদীদের মতে পঞ্চভূতই পরম সত্য।"[১১]

স্বভাববাদ ও বিজ্ঞান

জাগতিক ঘটনাকে জাগতিক কারণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করার প্রবণতার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক চেতনা বিদ্যমান। এই ব্যাখ্যায় অতিপ্রাকৃত-কিছু স্বীকারের প্রয়োজন নেই,—ঈশ্বরকেও নয় আর অদৃষ্টকেও নয়। মনে হয়, স্বভাববাদ বলতে প্রাচীন বস্তুবাদীরা '**প্রাকৃতিক নিয়ম**' (Law of Nature) বলে কিছু একটা বুঝতেন। প্রাচীন চীনেও '**তাওবাদ**' প্রচলিত ছিল; এটাও স্বভাব-বাদের নামান্তর বলে মনে করা যেতে পারে, অন্তত জোসেফ নীডহাম তাই মনে করেছেন। 'তাও' বা "পথ' হলো প্রকৃতিতে ফিরে যাবার পথ—স্বভাবের অনিবার্যতা স্বীকার করা। প্রাচীন চীনা বিজ্ঞানের বিকাশে 'কনফুসিয়াজম' বা 'লিগালিজম'-এর চেয়ে তাওবাদের ভূমিকা বহুগুণ বেশী। ঋগ্বেদের 'ঋত' ও 'তাও' সমার্থক বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। কিন্তু সর্বাংশে যে নয়, তা জোর করেই বলা যায়।[১২] তবে 'ঋত' ও 'তাও' বলতে যদি প্রাকৃতিক নিয়ম বা শৃঙ্খলা বোঝায়, তা হলে অবশ্য স্বভাববাদের সঙ্গে এর কিছুটা মিল আছে স্বীকার করতে হবে। যাই হোক, স্বভাববাদের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

স্বভাববাদের মূল কথাটি হলো প্রতিটি ঘটনার পিছনে পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। আর সেই নিয়মের সন্ধান করতে হলে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে অতি-প্রাকৃত বা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু খুঁজতে যাওয়া মানে খ্যাপার পরশ পাথর খোঁজা। বস্তুত, প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের প্রবণতার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান মানসিকতা। জাগতিক ঘটনাকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখার মধ্যেই স্বভাববাদের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিহিত। এদিক থেকে দেখলে আবার ন্যায়-এর সঙ্গে এর গভীর আত্মীয়তা। আবার মহাভারতের ভাষ্যকার নীলকণ্ঠের "স্বভাব ইতি পরিণামবাদিনাং সাংখ্যনাম্"—পরিণামবাদী সাংখ্যমতে স্বভাব স্বীকৃত ধরলে সাংখ্যের আদি কোন রূপের মধ্যেও হয়তো স্বভাববাদের সারবত্তা স্বীকৃত হয়েছিল।

এযাবৎ আমরা যে আলোচনা করেছি, তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী বলতে চার্বাক বা লোকায়িতকরাই কেবল একক ও অনন্য ছিলেন, আর কেউ তেমন মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতেন না,—একথা কোনক্রমেই বলা যায় না। বরং আদি সাংখ্য, ন্যায়ের আদি রূপ, উপনিষদের যন্ত্রতন্ত্র বস্তুবাদ বা বস্তুবাদ ঘেঁষা মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভাববাদের ঢালাও প্রচারের ফলে ভারতীয় সংস্কৃতির ফল্গু-

ধারা সদৃশ এই ঐতিহ্যটি টের পাওয়া কঠিন। তাছাড়া অনেক সময় মহান ঋষিরা পর্যন্ত বস্তুবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসীদের প্রতি এমন সব চোখা-চোখা বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন যে, লোক-অপবাদ ও লোকভয়ে বহু প্রাচীন বিদ্বান মানুষ পর্যন্ত এই দর্শনে আপাত অনাস্থা প্রদর্শন করেছেন। রামায়ণে জাবালি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামচন্দ্র যাতে অযোধ্যায় ফিরে যায় তার জন্য তিনি লোকায়িতক মতাবলম্বনে যে উপদেশ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করা যাক: "লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ হইবে? কখনই না। যে-সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, ধীমান মানুষেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্মনামে কোন পদার্থ নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।"* মহাভারতের শান্তি পর্বে প্রাচীন ঋষি ভরদ্বাজ দেহ ও জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে ভৃগুকে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা একান্তই চার্বাক সম্মত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ভরদ্বাজ চার্বাক বা বস্তুবাদের পূর্বসূরী।** কথাটা ভেবে দেখার মত। যাই হোক, জীবাত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে ভরদ্বাজ বললেন, "আমি পরলোকযাত্রা করিলে এই গাভী আমাকে উদ্ধার করিবে, এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি গোদান করে, সেই গাভী কিরূপে তাহাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? যখন গাভী, গ্রহীতা ও দাতা এই তিন জনকে ইহলোকে লয়প্রাপ্ত হইতে হইবে, তখন তাহাদিগের পুনরায় সমাগমের সম্ভাবনা কোথায়?...বৃক্ষের মূলচ্ছেদন করিলে যখন উহা পুনরায় প্ররোহিত (প্রাদুর্ভূত) হয় না, তখন মৃত ব্যক্তি কিরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে?... আমার বোধ হইতেছে,...যাহা একবার পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহারা আর কখনই জন্মগ্রহণ করে না।"*** এই দুটি তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত

* 'রামায়ণ', পৃঃ ৩৩৩, রিফ্লেক্ট প্রকাশন।

** ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃঃ ২০৭, প্রগতি, মস্কো।

*** মহাভারত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৫৭, রিফ্লেক্ট প্রকাশন।

হয় প্রাচীন ভারতে কট্টর চার্বাক ছাড়াও বস্তুবাদের সমর্থকের অভাব ছিল না।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. (ক) Sarup, L.—*The Nighantu and the Nirukta, Introduction*, P. 75.

১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—**ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে**, পৃঃ ৫৭।

২. তদেব, পৃঃ ৫৮

৩. **সুশ্রুত সংহিতা**, শারীরস্থান, পঞ্চম অধ্যায়ঃ অনুবাদ—দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; দ্রষ্টব্যঃ ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে, পৃঃ ৭৮-৭৯

৪. বিস্তারিত বিবরণ S. N. Dasgupta-এর *History of Indian Philosophy*, Vol. I and II ; D. P. Chattopadhyaya-এর *Science and Society in Ancient India* দ্রষ্টব্য

৫. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ—**ন্যায় দর্শন**, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৩১ ; তাই গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'অনুমান'-কে 'অনুমিতি' বলেছেন ; 'ন্যায় পরিচয়', পৃঃ ১৪৭

৬. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—**ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে**, পৃঃ ৯৮ ; 'চার্বাক দর্শনম্', পৃঃ ২১

৭. পরিশিষ্টে অসৎকার্যবাদ' আলোচনা দ্রষ্টব্য

৮. Bernal, J. D.—*Science in History*, P. 399.

৯. Needham, J—*Science and Civilisation in China*, vol—2, p.161—164

১৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—**ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে**, পৃ-১৩৭

১১. তদেব, পৃ—১৪২-১৪৩

১২. Chaubey, B. B.—*Treatment of Nature in Ṛgveda*, p. 3-15

'ঋত'-এর অর্থ নিয়ে দেশী-বিদেশী নানা পণ্ডিতদের নানা মত। স্কন্দস্বামিন, উদ্গীথ, ভেঙ্কট মাধব, মাধব ভট্ট, সায়ন প্রমুখের মতে 'ঋত'-এর অর্থ 'যজ্ঞ', বা 'জল', বা 'সত্য'। আধুনিক বিদেশী পণ্ডিত—রোথ, ম্যাক্সমূলার প্রমুখের মতে শৃঙ্খলা বা নিয়ম ; প্রকৃতি, অনুষ্ঠান, মনুষ্য জীবনের সর্বত্র এটা প্রযোজ্য, অথবা সাধারণ অর্থে প্রাকৃতিক নিয়ম।

ওল্ডেনবার্গ, গ্রিফিথ প্রমুখের মতে মহাজাগতিক নিয়ম (Cosmic Law) বা শাশ্বত নিয়ম (Law Eternal)। ওয়ালিস বলেন, "The word used to denote the conception of order of the world is *Ṛta*." ভি. এস. ভাদের আবার 'ঋত' বলতে রাশিচক্র বোঝাতে চেয়েছেন। ভি. এস. ঘাটে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মতের সংশ্লেষণ করেছেন। ঋগ্বেদে 'প্রকৃতি' শব্দের উল্লেখ নেই, আছে ঋত। চৌবে মনে করেন ঋগ্বেদে 'ঋত' প্রকৃতি (Nature) অর্থে প্রযুক্ত হতো। বস্তুত, ঋত-এর আধুনিক অর্থ 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বিদেশী পণ্ডিতদের মতের অনুসরণ, বিশেষত ম্যাক্সমুলারের। 'তাও' রহস্যময়। এর সম্পর্কে বলা হয়েছে "Tao is actual, and demons rable but it is devoid both of action and form. It may be transmitted, but cannot be recieved. It may be obtained, but cannot be seen. It has its own beginning and its own end, before heaven or earth existed, from everlasting to everlasting. It extends further back than the remotest antiquity and yet it is not old." *Chinese Civilization*, Eichhorn, Werner, p. 100-101

তৃতীয় অধ্যায়

চার্বাক ও ন্যায়-বৈশেষিক

ভারতীয় দার্শনিকদের শ্রেণীবিভাগ

ভারতীয় দার্শনিকদের প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ শ্রৌত ও তার্কিক। জগতের মূলতত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে যাঁরা বেদের প্রমাণ্য মাত্র স্বীকার করেন, তা-ই যাঁদের একমাত্র শরণ, তাঁরা হলেন শ্রৌত দার্শনিক। পূর্ব-মীমাংসা সূত্রকার জৈমিনি, অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা পাণিনি আর ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ হলেন এই শ্রেণীর। এঁরা হলেন একেবারে আগমার্কা। আর যাঁরা জগতের মূলতত্ত্ব খুঁজতে প্রধানত তর্ককেই অবলম্বন করেন, তাঁরা হলেন তার্কিক। তার্কিকদের মধ্যে আবার দুটি উপশ্রেণী ঃ আস্তিক ও নাস্তিক। আস্তিকরা বেদের বিরুদ্ধতা না করলেও শ্রুতি ও তর্কে বিরোধ উপস্থিত হলে তাঁরা তর্ককেই গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিই প্রবল। তবুও এঁরা বেদের প্রামাণ্য নস্যাৎ করার সাহস দেখাতে পারেননি, খুব সম্ভব বাধ্য হয়ে। দক্ষিণারঞ্জন বেদের প্রতি এঁদের মনের ভাবটি টেনে বলেছেন চমৎকার ভাবে—"ইঁহাদিগের শ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধামান্দ্য বর্তমান।"*

বৈশেষিক দার্শনিকরা যে তার্কিক তাতে সন্দেহ নেই। বেদকে (শ্রুতি বা শব্দ) এঁরা আলাদা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। এঁরা 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনুমান'-প্রমাণে বিশ্বাসী বটে, তবু এঁরা কিন্তু নাস্তিক নন। বেদের প্রতি এঁদের 'শ্রদ্ধামান্দ্য বর্তমান'। নৈয়ায়িকরাও তার্কিক—আস্তিক তার্কিক। তবে এঁদের প্রায় সবাই বেদকে অপৌরুষেয় না বলে পৌরুষেয় বলেন। এঁদের মতে স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যেই বেদ রচনা করেছেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা অনেক হতে পারে, কিন্তু তাঁর পক্ষেও অখিল বিশ্ব প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কারণ, যুক্তিতেই তা গ্রাহ্য হতে পারেনা। এ-বিষয়ে তার্কিক বা লজিসিয়ানদের মতটি উদ্ধৃত না করে পারা গেলনা ঃ

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নৈব কার্যা বিচারণা।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

অর্থাৎ 'কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করা উচিত নয় ; যেহেতু

* চার্বাক দর্শন, পৃ—৪৫

যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি হয়।** এই অভিমত বৃহস্পতির। অবশ্য এই বৃহস্পতি কোন্ বৃহস্পতি তা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন বৃহস্পতির উল্লেখ দেখা যায়।[১] আবার এক বৃহস্পতি লোকায়ত বা চার্বাক মতাদর্শের প্রবক্তা,—এ কথাটিও জানা যায়। কিন্তু ভাববাদীরা বৃহস্পতিকে নিন্দা করেন না, কোন-না-কোন ব্যাখ্যা, কারণ ইত্যাদি দেখিয়ে তাঁকে নিজেদের দলে টেনে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণা-রঞ্জনের মতটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়ঃ "এক কথায়, বৃহস্পতিকে তাঁহারা কিছুতেই বেদবিরোধী ও দেববিরোধী হইতে দিবেন না। ভয়—বৃহস্পতির ন্যায় তীক্ষ্ণধী, সুপণ্ডিত, বাচস্পতি, প্রতিভাবান, অসাধারণব্যক্তিত্বসম্পন্ন গণপতি বেদবিরোধী হইলে বেদধর্ম বিলুপ্ত হইবে।"***

ন্যায়-বৈশেষিকের সহিত চার্বাক মতাদর্শের সম্পর্ক একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। একথা সত্য, চার্বাকরা আপোষহীন বস্তুবাদী। ধূলি-ধূসরিত এই পৃথিবী ছাড়িয়ে তাঁদের ভাবনা কখনো অবস্তু, অলৌকিক নিয়ে নয়; মনগড়া তত্ত্বে বা তথ্যে তাঁদের আস্থা নেই। বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদ প্রমাণে তাঁদের আস্থা নেই; প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁদের শ্রেয় ও প্রেয়,—এই প্রমাণই সেরা প্রমাণ। তবে অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে তাঁদের গ্রহণে বাধা নেই যদি তা অলৌকিক না হয়, অবাস্তব না হয়; লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ তাঁরা স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকরা আদিতে ছিলেন লৌকিক নৈয়ায়িক, ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় এঁরা উৎসাহী ছিলেন না, মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার বশবর্তী হয়ে 'হেতু' ও 'তর্ক' অবলম্বন করেই তাঁদের বুদ্ধি ও মেধাচর্চা। বৈশেষিকরাও এর ব্যতিক্রম নন। এই উভয় সম্প্রদায়ই আদিতে বস্তুনিষ্ঠ, ভৌত জগতের বাস্তব ব্যাখ্যা দিতেই ছিল তাঁদের আগ্রহ। 'গঙ্গা জল ছিটানো'র মত বেদের প্রামাণ্যে বিরোধিতা না করে তাঁরা যুক্তির প্রাবল্য মেনেই চলেছেন বৃহস্পতির অভিমত মত। ভিনটারনিজও এই মত পোষণ করেন যে, লোকায়ত ও বৈশেষিকে ভৌত জগতের ব্যাখ্যায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য নেই, তবে সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্কবিতর্কে পার্থক্য আছে।

ভুতচতুষ্টয় ধারণার বিকাশ : চার্বাক-ন্যায়বৈশেষিক

চার্বাক দর্শনের আলোচনায় আমরা দেখেছি, এই সম্প্রদায় মাটি, জল, আগুন ও বাতাস ছাড়া আর কোন ভূতবস্তু স্বীকার করতেন না। মনে

** তদেব, পৃ—১৫৫
*** তদেব, পৃ—১৫৮

হতে পারে যুঝিবা চার্বাকরাই এই চার ভূত তত্ত্বের জনক বা প্রবক্তা। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়,—জগত-কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতে ঋগ্বেদের সময় থেকে ধীরে ধীরে এই তত্ত্ব গড়ে ওঠে। বিষয়টার একটি ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি দেখানোর জন্য আমাদের কিছুটা আলোচনা না করে উপায় নেই।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নাসদীয় সূক্তে প্রজাপতি বলছেন: জগতের বৈচিত্র্য সৃষ্টির একেবারে গোড়ায় কি ঘন গভীর বিস্তীর্ণ জলরাশি ছিল ?—'অম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গম্ভীরং? এর উত্তরে বলা হলো জল বা জড় থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। আর এক ঋষি বলেন, বায়ুই হল প্রথমজ ; এ থেকেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে—'অপাং সখা প্রথমজা ঋতা বা'। এই বায়ুও জল বা জড়ের বন্ধু। আর এক ঋষি বললেন, সূর্য বা অগ্নি বা তেজই হলো সেই বৃক্ষ যার ফল হলো স্থাবর-জঙ্গমরূপ এই বিশ্ব এবং তার প্রতীক হলো ক্ষুদ্র এই মানুষের শরীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর সঙ্গে যুক্ত হলো 'অন্ন' বা পৃথিবী। ঋষি বললেন, অসৎ থেকেই সতের উৎপত্তি ; অসৎ প্রাণ থেকে তেজ, তেজ থেকে জল এবং জল থেকে অন্ন বা পৃথিবীর উৎপত্তি। প্রশ্নোপনিষদে কবন্ধী কাত্যায়ন চার ভূতের কথা স্পষ্ট করে বললেন,—"ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই ভূতচতুষ্টয় কোনও সচেতন কর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মিলিত হইয়া দেহের তথা বিশ্বের গঠন ও বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার বিনাশ করে।"[৩] এইসব আলোচনা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, চার্বাকরাই ভূত-চতুষ্টয় তত্ত্বের জনক বা প্রবক্তা নন, তবে তাঁরা যে এই তত্ত্বের ঘোরতর প্রচারক তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য ওই প্রশ্নোপনিষদেই পঞ্চভূতের কথাও আছে। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন চিন্তা-ভাবনায় পঞ্চতত্ত্বের আবির্ভাব প্রবল-ভাবে চীনে[৪] দেখা যায়, এবং সেদেশে এই তাত্ত্বিক ভাবনার প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও গণিতেও দেখা যায়। কিন্তু এখানে সে-বিষয়ে আলোচনার সুযোগ ও অবকাশ আমাদের নেই।

চার্বাক সম্প্রদায় যে চতুর্ভূত তত্ত্বের একমাত্র প্রবল সমর্থক তাতে সন্দেহ করার হেতু নেই। বস্তুতপক্ষে, তাঁরা সুদীর্ঘ কালব্যাপী এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে চলেছিলেন, এবং তা তাঁদের দার্শনিক চেতনার সহিত সঙ্গত ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ ছিল। উপনিষদের মধ্যে চতুর্ভূত ও পঞ্চভূত উভয় তত্ত্বই দেখা যায় যা সে-যুগের বৈষয়িক বিকাশ ও ওপর-কাঠামোর ক্রমপরিণতির সহিত সামঞ্জস্য-পূর্ণ। কিন্তু চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের বাইরে কোন দার্শনিক বা

বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী চতুর্ভূত তত্ত্বে একনিষ্ঠ ছিলেন না। ন্যায়-বৈশেষিকরা মূলত চতুর্ভূতে উৎসাহী, অনুরাগী হলেও, জগৎ-কারণ ব্যাখ্যায় তাঁদের চারভূতের প্রধান্য দেখা দিলেও, কিন্তু অবশেষে তাঁদের চাঁদের 'চেঙ মুড়ি কানী'-কে পূজা দেওয়ার মত করে আর এক ভূত—আকাশকে মানতেই হয়েছে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের বাইরে যাঁরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন, যেমন,—চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি, তাঁরা সাধারণত পঞ্চভূত তত্ত্বেই আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন। তবে চরক ও সুশ্রুতের ঝোঁকটা চতুর্ভূতের প্রতি। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত সংহিতাদ্বয়ে প্রক্ষেপজনিত কারণে তাঁদের আসল বক্তব্য উদ্ধার করা সহজ নয়, এবং তা স্বল্প পরিমাণে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভব হলেও প্রবল তর্কসাপেক্ষ। তা ছাড়া অনেক সময় ভারতীয় দর্শনে ভাষ্যকাররা মূল বক্তব্য উপস্থাপনে নানা বিকৃতি ও কষ্টকল্পনা করেছেন নিজনিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মা ও ঈশ্বর প্রতিষ্ঠায় এই উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়, এবং নাগার্জুন থেকে শঙ্করের মধ্য দিয়ে এই প্রয়াস প্রাবল্য লাভ করে। অধিকাংশ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ তাঁদের মূল গ্রন্থে ও ভাষ্যে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদের উল্লেখ করেছেন। বরাহমিহির, কণাদও লোকায়ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন, লল্লও তাঁর শিষ্যধীবৃদ্ধিদ তন্ত্রে কণাদের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু কেউই বিস্তারিত আলোচনা করেননি। সকলেই পঞ্চভূত তত্ত্বে আস্থা স্থাপন করেছেন। এ-বিষয়ে একমাত্র বিস্ময়কর ব্যতিক্রম মহান প্রথম আর্যভট। প্রথম আর্যভটের চতুর্ভূত তত্ত্ব, ভূ-ভ্রমণবাদ এবং তাঁর একান্ত অনুরাগী ও অনুসরণকারী ভাষ্যকার প্রথম ভাস্করের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ব্যাখ্যা করলে তাঁর মানসিক গঠন সম্বন্ধে আমাদের এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। 'অদ্ভুত পরিস্থিতি' বলার কারণ এই যে, আর্যভটের প্রতিভার এই দিকটি নিয়ে এযাবৎ আলোচিত হয়নি, একমাত্র লোভিন প্রায় তেরো-চোদ্দ বছর আগে *Aryabhata and Lokāyata* প্রবন্ধে বিষয়টির সূত্রপাত করেছিলেন।

প্রথম আর্যভট তাঁর একমাত্র গ্রন্থ 'আর্যভটীয়'-এর গোলপাদে পৃথিবীর অবস্থান, গঠন ও আকার সম্বন্ধে বলেছেন,—

বৃত্তভপঞ্জর মধ্যে কক্ষাপরিবেষ্টিতঃ খমধ্যগতঃ।
মৃজ্জলাশীখবায়ুময়ো ভূগোলঃ সর্বতো বৃত্তঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ বৃত্তাকার নক্ষত্রমন্ডলের মধ্যে গ্রহকক্ষাপরিবেষ্টিত আকাশের কেন্দ্রে পৃথিবী স্থিত,—চতুর্দিকেই গোল। এই পৃথিবী মাটি, জল, আগুন ও বায়ু দ্বারা গঠিত।

প্রথম আর্যভটের 'মৃজ্জলশিখিবায়ুময়ো'-র স্থলে বরাহমিহির লিখলেন 'পঞ্চমহাভূতময়,' লল্লও শিষ্যধীবৃদ্ধিদ-তন্ত্রে (১৭. ৪. ১) পঞ্চভূতের কথা বলেছেন। বস্তুত, প্রথম আর্যভট ছাড়া বাকী সব জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ একই মত পোষণ করেন। যদি বলা হয় এই বিষয়টা তাঁদের চিন্তা-ভাবনার বৃত্তের বাইরে, এবং বিষয়বহির্ভূত, তা হলে এটা মেনে নেওয়া কষ্টকর। কারণ, জ্যোতির্বিজ্ঞানে কেবল ধ্রুবক, গণনা, গাণিতিক পারদর্শিতাই পরিলক্ষিত হয় না, এতে পৃথিবীর আকার-প্রকার, তার গঠন, অবস্থান ইত্যাদি নিয়েও আলোচিত হয়,—অন্তত প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এ-সব স্থান পেয়েছে। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যে, পৃথিবী গঠনের মূল উপাদান নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে আর্যভট ছাড়া অন্য কোন জ্যোতির্বিদ মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করেননি—প্রচলিত মতবাদ অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিক মতবাদ মেনে নিয়েছেন।

স্বীকৃত যে, প্রথম আর্যভটের যুগ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ছিল প্রবল ব্রাহ্মণ্যবাদ অভ্যুত্থানের যুগ। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য, পুরাণ, ইত্যাদিতে প্রবল ভাববাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ হেন যুগে প্রথম আর্যভট কিভাবে ঐতিহ্য ভঙ্গ করে চার্বাকদের চতুর্ভূত তত্ত্ব প্রচার করলেন তা খুবই কৌতূহলজনক। তা ছাড়া তাঁর ভূ-ভ্রমণবাদ ছিল সে-যুগে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের নামান্তর। সবাই জানেন, প্রথম ভাস্কর ছিলেন প্রথম আর্যভটের একান্ত অনুরাগী ও বিশ্বস্ত অনুসরণকারী। 'আর্যভটীয়' গ্রন্থের ভাষ্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। 'অর্যভটীয়'-এর অতি সংক্ষিপ্ত ও ইঙ্গিতময় সূত্রগুলি তাঁর ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে বোঝা দুষ্কর। 'আর্যভটীয়'-এর সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি ওই যুগের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটিও পরিস্ফুট করে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমূল্য সংযোজন করেছেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তিনি আর্যভটের চতুর্ভূত তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেননি, এ-সম্বন্ধে একটি অতি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন মাত্র। তিনি 'মৃজ্জলশিখি বায়ুময়ো ভূগোলঃ' সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছেন 'প্রত্যক্ষং যত্ উপলভ্যতে' অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষের দ্বারা উপলব্ধ

হয়। ভাস্করের এই ব্যাখ্যা আর্যভটের বুদ্ধিস্থ ছিল ধরে নিলে বলতে হয় আর্যভট প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশ্বাসী ছিলেন, অনুমান-প্রমাণ তাঁর মনঃপূত ছিলনা। ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতি অনুরক্তি একমাত্র চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের। আবার, ভূ-ভ্রমণবাদ সম্পর্কে সোমেশ্বর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রধান্য দেখা যায়। সুতরাং আর্যভট যে প্রবল ভাববাদী হওয়ার পরিবর্তে কিছুটা বস্তুবাদী ছিলেন, এমন অনুমান নিছক কল্পনা নয়। মনে হয়, এই দার্শনিক ভাবনাই তাঁকে অসামান্য আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

ন্যায়-বৈশেষিকে দ্রব্য ন-রকমের। তবে তার মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও আকাশ এই পাঁচটি দ্রব্যই হলো ভৌত দ্রব্য। কিন্তু এই পাঁচটির মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ দু-রকমই হতে পারে ঃ নিত্য ও অনিত্য। এদের পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু স্থূল ক্ষিতি, স্থূল অপ ইত্যাদি যা প্রত্যক্ষ গোচর তা অনিত্য। তা হলে দেখা যাচ্ছে, পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে চারটি—মাটি, জল, আগুন ও বায়ু। ভূতবস্তু বিষয়ে মোটের ওপর চার্বাকদের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকদের বিশেষ অমিল নেই। এমন কি, পাঁচটি দ্রব্যের তর্ক তুললেও নয়। কেননা, পরবর্তীকালের কোন কোন চার্বাকপন্থী 'আকাশ'কে পঞ্চম ভূতবস্তু বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন একপ্রকারে।

কিন্তু চার্বাকদের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকদের পার্থক্য রয়েছে স্বভাববাদের ধারণায়। অবশ্য এখানেও স্বভাববাদ চার্বকরা আবিষ্কার করেননি। কিন্তু তাঁরা এই তত্ত্বের যেমন কট্টর সমর্থক ও প্রচারক, তেমন আর কেউ নন। ন্যায়-বৈশেষিকরা উৎপাদ-বিনাশশীল অর্থাৎ অনিত্য পদার্থে পূর্ণ এই যে জগৎ, তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য 'কার্যকারণবাদ' স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে যে-সব পদার্থ অনিত্য—এই আছে, এই নেই—তা একাধিক কারণের সমাবেশে উৎপন্ন হয়, আর ওই কারণগুলির মধ্যে এক বা একাধিক কারণের নাশ হলে বিনষ্ট হয়। কিন্তু চার্বাকরা এই 'কার্যকারণ' স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ঘট, পট (বস্ত্র) ইত্যাদি আমরা দেখি সত্য ; এদের উৎপত্তি হয় আর বিনাশও হয়, তাও ঠিক ঃ কিন্তু এদেরকে আমরা 'কার্য' (effect) বলে প্রত্যক্ষ করিনা। 'কার্য' বললে কেবল অনিত্যতা বা উৎপাদ-বিনাশশীলতা বোঝালে না হয় স্বীকার করা যায়। কিন্তু তা তো নয়। কার্যের উৎপত্তি যে 'কারণ-জন্য' এই কথাটিও বলতে হয় বলে তা স্বীকার করা যায় না।

ন্যায়-বৈশেষিকরা উত্তরে বলেন, ঘট, পট ইত্যাদি পদার্থ কারণ-জন্য। কেননা, তারা সাপেক্ষ পদার্থ। যেমন, ঘটের উৎপত্তির জন্য কুমোর, চাকা, তার লাঠি, অংশগুলির সংযোগ ইত্যাদি পদার্থের অপেক্ষা করে থাকে। চার্বাকরা জবানীতে বলেন, আমরা অনুভবে পাচ্ছি বটে যে, কুমোর, চাকা, তার লাঠি ইত্যাদি 'পূর্বভাবী' Antecedent) পদার্থ, আর ঘট 'পরভাবী' (Precedent) পদার্থ। কিন্তু পরভাবী পদার্থ পরভাবী বলেই তাকে পূর্বভাবী পদার্থের সাপেক্ষ হতে হবে,—এমন কথা কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বলেনি।

ন্যায়-বৈশেষিকরা আরো দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বললেন, ঘটটি কেমন লক্ষ করা যাক। এটি একসময়ে ছিলনা, কিন্তু এখন আছে, আবার ভবিষ্যতে থাকবেনা। তাই এই ধরনের পদার্থ হলো গিয়ে 'কাদাচিৎক'। ঘট কি সব সময় উৎপন্ন হয়? হয় কেবল যখন কুমোর, তার চাকা, লাঠি, অংশ দুটি, আর সেই দুটির সংযোগ ইত্যাদির দ্বারা ঘট উৎপন্ন করে, ঠিক সেই সময়—সেই সন্ধিক্ষণে কারণগুলির সমাবেশ ঘটে, আর ঠিক তার পরক্ষণেই ঘটটি উৎপন্ন হয়। কারণের সমাবেশও সব সময় ঘটেনা, আর ঘটও সব সময় উৎপন্ন হয়না, দর্শনের ভাষায় 'সর্বকালবৃত্তি' হয় না।

চার্বাকরা এর উত্তরে বলেন, আরে বাবা, সামান্য একটা মাটির কলসি তৈরী, বা কাপড় তৈরীর ব্যাপার নিয়ে অত 'কাদাচিৎক', 'সর্বকালবৃত্তি' ইত্যাদি তাবড়-তাবড় শব্দ ব্যবহারের দরকার কি? ঘটের, পটের স্বভাবই হচ্ছে এই আছি, এই নেই। 'কাদাচিৎ' আসলে, 'স্বভাব' ছাড়া আর কি! জলের স্বভাব নীচের দিকে প্রবাহিত হবে, তেমনি তোমাদের ওই 'সর্বকাল-বৃত্তি' না হওয়াটাই তো ঘট-পটের ছটপটানি। এর জন্য,—কাদাচিৎকত্ব ধর্মের জন্য কারণ-জন্যত্ব স্বীকারের কোন দরকার নেই। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়!

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা ফ্যাকড়া তুলতে ওস্তাদ। তাঁরা 'অবধি' নামে একটি দার্শনিক পরিভাষার আমদানি করলেন। **'অবধি'-র মানে 'সীমা'**। এই-সীমা আবার দু-রকমঃ 'উৎপত্তি-সীমা' আর 'বিনাশ-সীমা'। ন্যায়-বৈশেষিকরা বললেন, ঘট-পটের উৎপত্তি যদি স্বভাবের জন্যে হয়, তা হলে ঘট-পটের সীমা থাকতনা—নিয়ত অবধি থাকতনা। তাঁরা বললেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ঘট-পটের সবসময় থাকা বা না থাকা স্বভাব, তা হলে কেন তারা **বিশেষ কাল** অর্থাৎ সময়কে বেছে নেয় উৎপত্তি বা বিনাশের জন্য?

কূটকচালে তর্ক তুলে তাঁরা বললেন, ঘটের উৎপন্ন হওয়া যদি স্বভাব হয়, তা হলে কুমোর, চাকা ইত্যাদি সমাবেশ ক্ষণকে না বেছে, তাঁতি, তন্তু, মাকু ইত্যাদি সমাবেশ ক্ষণকে বেছে নিয়েই তো ঘট উৎপন্ন হতে পারে। ব্যস, কিস্তি মাৎ। কিন্তু চার্বাকরা এর কি উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে তাঁরা হয়তো বলতে পারতেন যে, তা হয় না স্বভাবের পার্থক্যের জন্য। আগুন উষ্ণ, জল ঠাণ্ডা,—তাদের স্বভাবের জন্য, উভয় স্বভাব এক নয়।

কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, কারণের দ্বারাই ঘট-পট ইত্যাদি উৎপন্ন বলে তা বিশেষ সময়ে উৎপন্নও হয় আর ধ্বংসও হয়। সুতরাং 'কার্যকারণ-বাদ' স্বীকার করতেই হবে।

দেহ-আত্মা : চার্বক ও ন্যায়-বৈশেষিক

ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা একটি দ্রব্য। আত্মা-দ্রব্য জ্ঞান গুণের আধার। সুতরাং আত্মার এরূপ সংজ্ঞা : যে-দ্রব্য জ্ঞান গুণের আধার, তা-ই আত্মা। এই আত্মা আবার দু-রকম : জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যে দ্রব্য অনিত্য জ্ঞানের আধার, তা হচ্ছে জীবাত্মা ; আর যে-দ্রব্য নিত্য জ্ঞানের আধার তা পরমাত্মা। সাম্যন্য গুণ ছাড়াও জীবাত্মায় বিশেষ গুণ আশ্রিত থাকে।• চার্বাক মতে দেহই আত্মা। জ্ঞানের গুণের আশ্রয় হিসাবে আত্মা বলে কোন দ্রব্য স্বীকারের দরকার নেই। তাঁদের মতে শরীর বা দেহই জ্ঞান গুণের আশ্রয়। ন্যায়-বৈশেষিকরা মৃত দেহের নজির দেখিয়ে চার্বাক-মত খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন। চার্বাকরা এর বিরুদ্ধে কি যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তা আমরা জানিনা সত্য, কিন্তু তাঁদের মতাদর্শ যে আধুনিক বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি অনুসারী ছিল, তাতে সন্দেহ করা যায় না।

ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনও জ্ঞান গুণের আশ্রয় হতে পারেনা বলে আত্মা বলে একটি দ্রব্য স্বীকার করতেই হবে। যেমন, 'আমি মোটা', 'আমি রোগা', 'আমি কালো' ইত্যাদি বলতে গেলে 'আমি' পদটি দিয়ে দ্রব্যকেই বোঝায়। এই দ্রব্য 'আত্মা' ছাড়া কিছু নয়, যদিও গৌণভাবে 'মোটা', 'রোগা' ইত্যাদি শরীরের ধর্মকেও আত্মার ধর্ম বলে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু চার্বাকরা বলেন, এই 'আমি মোটা', 'আমি রোগা' ইত্যাদিতে 'বিশেষ্য-বিশেষণ' সম্পর্কই রয়েছে। এ-সবই হলো দেহের বিশেষণ সুতরাং 'আমার দেহ' এই ধরনের কথা নেহাতই কথার কথা—বাজে কথা ;

ওই 'রাহুর মাথা'-র মত আর কি। বৌদ্ধ দার্শনিকরাও এক্ষেত্রে আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, প্রত্যেক জ্ঞানই স্বপ্রকাশ, এবং যখন নিজেকে প্রকাশ করে তখন 'অহং'-বা 'স্ব'-রূপেই প্রকাশিত হয়। একেই—এই অহং আকারে প্রকাশিত জ্ঞানকে তাঁরা বলেন 'আলয়বিজ্ঞান'। আলয়-বিজ্ঞানের প্রবাহ বা ধারাই হচ্ছে আত্মা। ন্যায়-বৈশেষিকরা অবশ্য অদ্বৈত-ও সাংখ্য-মতের আত্মা যা কিনা শুদ্ধচেতনা বা নির্বিষয়ক জ্ঞান তাকে স্বীকার করেন না। তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক হবে। যেমন, ঘট-জ্ঞান, পট-জ্ঞান।

চার্বাক, বৌদ্ধ, অদ্বৈত ও সাংখ্য মতের সহিত ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মায় পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু চার্বাকদের সঙ্গে যেন অনেক বেশী সূক্ষ্ম দার্শনিক তর্কবিতর্কের দিক থেকে। অথচ ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মা ঠিক শঙ্করা-চার্যের চৈতন্যস্বরূপ আত্মা নয়। তাঁদের আত্মার স্বরূপের সঙ্গে চার্বাক-মতের সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করার মত।

ন্যায়-বৈশেষিকে আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় বা আধার হলেও আত্মার কিন্তু সর্বদা জ্ঞান থাকেনা। তাঁদের মতে, কর্মফল ভোগ শেষ হয়ে গেলে যখন আত্মা মুক্ত হয়ে যায়, তখন আত্মায় জ্ঞান-গুণ থাকে না। আত্মা তখন কেমন? আত্মা তখন একখণ্ড নুড়ির মতই জ্ঞানহীন অর্থাৎ জড়দ্রব্যের মতন অচেতন। বস্তুতপক্ষে, আত্মা স্বরূপত অচেতন—জড় দ্রব্যের মত। চার্বাকরা মনে করেন, ভূতবস্তুচতুষ্টয়ের বিশেষ বিন্যাস বা দেহাকারে পরিণামের ফলেই দেহে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। আত্মা বলে কোন দ্রব্য নেই। আত্মা বলে যদি কোন শব্দ নেহাৎ মানতেই হয়, তবে তা দেহ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ন্যায়-বৈশেষিকেও আত্মা দেহান্তর্গত হলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মুক্ত আত্মা জড়—অচেতন, নুড়ির মতন। তাই প্রবল ভাববাদীরা ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা বলেন, এমন আত্মা নিয়ে—এই পাথরের নুড়িখণ্ডের মতন আত্মা নিয়ে আমাদের মুক্তি বা মোক্ষের দরকার নেই বাবা; তারচেয়ে বরং আমরা বৃন্দাবনের শেয়াল হয়ে বনে বনে পথে পথে ঘুরে মরব, সেও আচ্ছা।[৭] যাঁদের যে-ইচ্ছা তাঁরা করুন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো চার্বাকে ও ন্যায়-বৈশেষিকে প্রথম দিকে অন্তত বেশ ভাল রকমের একটা সম্পর্ক ছিল। বস্তুত, বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বা তারই কাছ ঘেঁষা মতাদর্শের মাধ্যমেই পরমাণুবাদীরা তাঁদের লজিক, চিন্তা-ভাবনা, প্রত্যয়াদি গড়ে তুলেছিলেন। গ্রীকদের আত্মা-ধারণার সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকের পার্থক্যটিও

এখানে লক্ষ করার মত। পরে গ্রীক ধারণাটি পড়লেই পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবেনা বলে মনে হয়।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ : চার্বক ও ন্যায়-বৈশেষিক

চার্বাকরা কি ধরনের প্রমাণ স্বীকার করতেন তা বলতে গেলে কবির ভাষার অনুকরণ করে বলা চলে : 'সবার উপরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্য। তাহার উপরে নাই'। কথাটা সত্য যে, চার্বাকরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই স্বীকার করেন, অন্য কোন প্রমাণ তাঁরা স্বীকার করেন না। কিন্তু এই অভিযোগ ভাববাদীদের, পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকদের মত টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যে তাঁদের এই অভিযোগ—পূর্বপক্ষ হিসাবে চার্বাকমতের উপস্থাপনা। তাই সন্দেহ হয়, চার্বাকরা কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করতেন? চার্বাকদের লোকগাথাগুলি পড়লে এবং তা থেকে যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার করে দেখলে এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে আলোচনার প্রকৃতি অনুধাবন করলে এটা মনে হয় যে, চার্বাকরা অনুমানকেও প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করতেন। তবে অনুমানকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা নিঃশর্ত ছিল না; যে-কোন অনুমানকেও তাঁরা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তা হলে কি ধরনের অনুমানকে তাঁরা প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করতেন? যে অনুমান প্রত্যক্ষগামী, যে অনুমান ইহলোক প্রসঙ্গে, সে-ধরনের অনুমান স্বীকারে বাধা নেই। কিন্তু যা প্রতাক্ষগামী নয়—অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে, যা পরলোক সম্পর্কীয়, তেমন অনুমান কোন চার্বাক স্বীকার করতেন না। যেমন, কর্মফল, আত্মা, নরক, পরলোক, স্বর্গ ইত্যাদি নিষ্ফলা অনুমান স্বীকার তাঁরা করতেন না। তাঁদের প্রধান বক্তব্য প্রত্যক্ষ প্রমাণই সেরা প্রমাণ। তবে লোকপ্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকারে বাধা নেই।

এখন দেখা যাক, ন্যায়-বৈশেষিকদের সঙ্গে চার্বাকদের মতের কি সম্পর্ক। বস্তুতপক্ষে, লক্ষ করা যায় যে, ন্যায়-বৈশেষিক মতের আদি রূপের সঙ্গে চার্বাকদের 'প্রত্যক্ষই সেরা প্রমাণ' এই মতের কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা হলেন গোতম। তাঁর ন্যায়-সূত্রে 'প্রত্যক্ষ' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, **"চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় শব্দাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ।"[৮]** বস্তুত, প্রত্যক্ষ

প্রমাণ সবাই স্বীকার করেন। যাঁরা অনুমান ও অন্যান্য প্রমাণ স্বীকার করেন, তাঁরাও সবাই প্রত্যক্ষকেই সেরা প্রমাণ না বলে পারেননি। কারণ, অন্য প্রমাণের মূলই নিহিত প্রত্যক্ষ প্রমাণে। গোতম প্রত্যক্ষের কথা বলার পরেই বলছেন, "অনন্তর অনুমান (নিরূপণ করিতেছি)। তৎপূর্বক, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিশেষ-মূলক জ্ঞান অনুমান-প্রমাণ ত্রিবিধ ঃ পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট।"[৯] নিঃসন্দেহে ভারতীয় দর্শনের এই কথাগুলি বোঝা কঠিন। ফণিভূষণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেও যে অদীক্ষিতরা খুব বেশী বুঝবেন তা মনে হয় না। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা থেকে যে কথাটা বুঝতে পারা যায়, তা হলো ন্যায় দর্শনের ধ্যরণার সঙ্গে চার্বাক ধারণার মিল রয়েছে এবং তাঁর বই থেকে স্বল্প উদ্ধৃতি আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। বস্তুতপক্ষে চার্বাক দৃষ্টিভঙ্গী, আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গী ও ন্যায়-বৈশেষিকের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা সূত্র দেখা যায়, যদিও তা সব সময় স্পষ্ট নয়। অবশ্য তা যে-কারণে তার আলোচনা এই পুস্তিকার শেষে আমরা অল্প-স্বল্প করেছি। যাই হোক, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অনুমান প্রমাণ প্রসঙ্গে চার্বাক যে অভিমত পোষণ করেন, তার সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকদের খুব বেশী একটা তফাৎ নেই। ন্যায়-সূত্রের বিখ্যাত ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পর্যন্ত "দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ অনুমানের মূল্য স্বীকার করা যায় না।"[১০] বৈশেষিক মতে প্রমাণ দু-প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ; আর ন্যায় মতে চার-প্রকার ঃ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। কিন্তু উভয় মতাদর্শেই 'প্রত্যক্ষ' সবার আগে অর্থাৎ সেরা প্রমাণ। "প্রত্যক্ষ প্রমাণের সত্তা ব্যতীত কোন প্রমাণেরই সত্তা সিদ্ধ হয় না। তাই মহর্ষি গোতম প্রমাণ-বিভাগে প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই উদ্দেশ করিয়া" বলেছেন ১।১।৪ সূত্রটি।[১১]

তথ্য ও টীকা

১. এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'চাবাক দর্শন'-এর ১৫৬-১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বৃহস্পতি বিষয়ে আরো আলোচনা 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে'-এর আলোচনায় দেখা যেতে পারে।

২. এ-বিষয়ে ভিনটারনিজের মত হলো **"The Vaiśeṣika system, that tries to explain nature independently of religious belief, in its character does not appear to be widely separated from the Lokāyata system."—*History of Indian Literature*, Vol-III, Part II, P. 520.**

৩. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন—**চার্বাক দর্শন**, পৃ—১১৯-১২১।

৪. চীনা পঞ্চভূত বা পঞ্চতত্ত্বের বর্ণণায় দেখা যায় প্রথমটি জল (Water), দ্বিতীয়টি আগুন (Fire), তৃতীয়টি বন বা অরণ্য (Wood), চতুর্থটি ধাতু (Metal) ও শেষ বা পঞ্চমটি মাটি বা পৃথিবী (Earth), এই পঞ্চভূত বা পঞ্চতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে নীডহাম বলছেন, —"All this suggests that the conception of the elements was not so much one of a series of five fundamental matter (particles do not come in to the ques ion), as of five sorts of fundamental process. Chinese thought here characteristically avoided substance and clung to relation."—*Science and Civilisation in China*, Vol.-2, P. 243.

৫. **কারণ-জন্য ঃ** যার উৎপত্তি যার অপেক্ষায় থাকে, তা তার দ্বারা জন্য। কার্যের উৎপত্তি কারণের অপেক্ষায় থাকে, তাই কার্য কারণের দ্বারা জন্য অর্থাৎ কারণ-জন্য।

৬. 'সামান্যগুণ' হল্যে সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ ও পৃথকত্ব এবং বিশেষগুণ হলো জ্ঞান, সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম অধর্ম ও সংস্কার।

৭. ভিনটারনিজ 'সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ' থেকে একটি শ্লোকের অনুবাদ এভাবে করেছেন ঃ 'I would rather like to be born as a Jackal in Vṛindāvana than attain emancipation according to the principles of Vaiśeṣika"—*History of Indian Literature*, Vo.-III, P. 521.

৮. শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন— **চার্বাক দর্শন** ; পৃ-৯৭ ; ন্যায়-সূত্র—১।১।৪

৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—**ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে**, পৃ-৮৪

১০. তদেব, পৃ-৮০

১১, ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্য—
মব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ ॥ 'ন্যায়-পরিচয়,' পৃ-১৩৬

চতুর্থ অধ্যায়

পরমাণুবাদের উৎস

ভারতীয় চিন্তাবিদ দার্শনিকরা কল্পণাপ্রবণ ভাববাদী, রহস্যময় অধি-বিদ্যাবাদীই হন বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে স্বজ্ঞাবাদীই হন অথবা বস্তুবাদী-ঘেঁষা মনোভাবাপন্ন যাই হন না কেন, স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগে পরমাণুবাদের সূত্র (source) বা প্রত্যয় (concept) বা ভাব (idea) তাঁরা পেলেন কোথায় ? অথবা এই দেশে—এই প্রাচীন ভারতে কোন্ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ায় ফলে পরমাণুবাদের অভ্যুদয় ঘটল ? একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, বস্তু বা ঘটনাকে কেন্দ্র করেই মানুষের চিন্তার জাল বিস্তারিত হয়। সুতরাং প্রশ্ন—জিজ্ঞাসু মনের তো বটেই যে, কোন্ বস্তু বা ঘটনা তাঁদের পরমাণুর ধারণা করতে প্রেরণা দিয়েছিল ? যে-কোন জিজ্ঞাসু মনের কাছে প্রশ্নটি সহজ ও স্বাভাবিক, কিন্তু এর ইতিবাচক উত্তর পাওয়া বা দেওরা খুবই কঠিন, অন্তত বর্তমান জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ভারতের ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ প্রথম নগরায়ণ *(First urbanization)* ,অন্ধকার যুগ *(Dark Age)* এবং দ্বিতীয় নগরায়ণ *(Second urbanization)*। হরপ্পা সভ্যতা প্রথম নগ-রায়ণের অন্তর্গত ; আর্যদের ভারতে আগমনের পর থেকে প্রায় 600 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময় 'অন্ধকার যুগ' ; আর তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় 'নগরায়ণ'। কণাদের পরমাণুবাদ এই দ্বিতীয় পর্বের শেষ দিকের ঘটনা বলে অনুমিত হয়। কিন্তু কণাদের সময়কাল নিয়ে নানা মুনির নানা মত।[১] তা যাই হোক, যে কোন ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠার মূলে অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি অপরিহার্য। বস্তুবাদী দর্শনে একেই বলে 'ভিত্তি-কাঠামো' *(Infra-Structure)*। এর ওপরেই 'উপরি-কাঠামো'র *(Super*-Structure) নাচন-কুঁদন—অর্থাৎ সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির অবশ্য উভয়ে উভয়কে প্রভাবিত করে, পরিবর্তিত করে—পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হতে হতে অগ্রসর হয়। এটাই দ্বান্দিকতার নিয়ম। তাই পরমাণুবাদের উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের এই দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগে সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কথা ভুললে চলবেনা। সে-

কারণে আমরা যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এই পর্বের ওই তিনটি বিষয় আলোচনা করব।

সামাজিক জীবনযাত্রা

ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দ নাগাদ মধ্যগাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে 'দ্বিতীয় নগরায়ণ' শুরু হয়। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে যে-সব নগরের উল্লেখ আছে—কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, অযোধ্যা, কপিলাবস্তু, বারাণসী, বৈশালী, রাজগীর, পাটলিপুত্র, চম্পা এগুলি খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রতিটি নগরেই যে বাসস্থানের পরিচয় পাওয়া গেছে, তা মাটির তৈরী। এ যুগে জনসংখ্যা বেড়েছিল বটে, কিন্তু সুরম্য অট্টালিকা দেখা যায়নি।

নগর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, আর রাজাদের কার্যালয়ও। প্রধানত কারিগর ও ব্যবসায়ীরা নগরে বাস করত ও কারিগররা আবার সঙ্ঘবদ্ধভাবেও বাস করত। কারিগর ও ব্যবসায়িরা সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিল। কর্মকার, দারু-শিল্পী, চর্মকার, গজদন্ত শিল্পীদের কথাও জানতে পারা যায়। বস্তুত, স্থানীয়করণ ও সংঘ গঠনের ফলে বিশেষ ধরনের কারিগরি দক্ষতার পরিচয় এযুগে দেখা যায়। সারারণ জীবিকা ছিল বংশপরম্পরাগত। পিতার কাছ থেকে পুত্র পারিবারিক পেশায় শিক্ষা নিত। তবে বংশ পরম্পরাগত বৃত্তি একেবারে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয় নি।

এযুগের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ নগরই নদীর তীরে বাণিজ্য পথের ওপর অবস্থিত ছিল। বারাণসী ও কৌশাম্বীর সহিত সংযোগ ছিল; শ্রাবস্তী থেকে একটি পথ কপিলাবস্তু ও কুশীনর হয়ে বৈশালী পর্যন্ত গিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা পাটনার কাছে গঙ্গা পেরিয়ে রাজগীরে যেত। গঙ্গা ধরে যাওয়া চলত একেবারে ভাগলপুরের কাছে চম্পা পর্যন্ত। জাতক থেকে জানা যায় যে, কোশল ও মগধের ব্যবসায়ীরা মথুরা হয়ে তক্ষশীলা পর্যন্ত যেত,—এইভাবে উজ্জয়িনী ও গুজরাট উপকূলে। এযুগে মুদ্রার ব্যবহার ছিল—খোদাই করা মুদ্রার। প্রথম দিকের মুদ্রাগুলি রূপার, কিন্তু তাম্র মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।

একথা সত্য, এ-যুগের গ্রামীণ জীবনের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি। কিন্তু সরল গ্রামীণ ভিত্তি ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, নগরায়ন যে সম্ভব ছিল না, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। যথেষ্ট পরিমাণ কর, রাজস্ব, উপঢৌকন ইত্যাদি না পেলে রাজা, পুরোহিত, কারিগর, ব্যবসায়ী,

প্রশাসক কারুর পক্ষেই নগরে বসবাস করা সম্ভব হতো না।* কৌশাম্বীতে এ যুগে ব্যবহৃত লোহার কুঠার, ছুরি ও অনেক সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হয়েছে।

পালি সাহিত্য থেকে তিন ধরনের গ্রামের কথা জানা যায়। গ্রামের অধিপতির নাম 'ভোজক'। দ্বিতীয় ধরনের গ্রাম কারিগরি শিল্পের জন্য খ্যাত ছিল। তৃতীয় ধরনের গ্রাম একেবারে জঙ্গলের কাছে বা ভেতরে। গ্রামের চষদ দমি পরিবারের ভিত্তিতে ভাগ করে দেওয়া হতো। প্রতিটি পরিবার নিজেরাই চাষ করত। উৎপাদিত ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ ($\frac{1}{6}$ ভাগ) কর হিসাবে দিতে হতো। তবে প্রমোদের জন্য ব্রাহ্মণ বা ব্যবসায়ীদের কোন কোন গ্রাম উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া হতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

গ্রামীণ ও নগর অর্থনীতির উন্নতিতে যে প্রযুক্তির সবিশেষ অবদান রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এ-বিষয়ে লোহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল জলা-জঙ্গল পরিষ্কার করতে বা রুক্ষ ও বন্ধ্যা জমিকে উর্বরা করে তুলতে। রাজঘাটে এমন কয়েকটি লোহার সরঞ্জাম পাওয়া গেছে যা সম্ভবত সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ থেকে আহৃত আকরিক থেকে তৈরী। সমৃদ্ধশালী খনিগুলির সঙ্গে পরিচয় কৃষি ও কারিগরিতে বিপ্লব সূচিত করেছিল, অনুমান করা যায়।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও পালি সাহিত্য থেকে এ-যুগের অর্থনীতির যে ছবিটি ফুটে ওঠে তা পশ্চিম উত্তর প্রদেশের পরবর্তী বৈদিক যুগের থেকে অনেকটাই আলাদা। এ যুগেই সর্বপ্রথম খাদ্য উৎপাদনকারী অর্থনীতি ও নগর অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অর্থনীতি কেবল প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের কাজে জড়িত মানুষদেরই নয়, চাষাবাদ বা কারিগরির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষদেরও অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করেছিল। এই অর্থনীতি এমন একটি বনিয়াদ রচনা করেছিল যার ওপর আঞ্চলিক রাজ্যগুলি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

রাজনৈতিক অবস্থা

বৌদ্ধযুগে ষোড়শ জনপদের অস্তিত্ব জানা যায়। এই জনপদগুলির মধ্যে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল পার্বত্য

* R. S. Sharma—*Material Culture & Social Formations in Ancient India*, P. 108.

অঞ্চলে, আর রাজতন্ত্র ছিল গাঙ্গেয় সমতলভূমিতে। হিমালয়ের পাদদেশে বা তার দক্ষিণে এইসব প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাব্য কারণ হলো স্বাধীন চেতনাবিশিষ্ট আর্যরা গোঁড়া আর্যদের ত্যাগ করে এইসব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং গোষ্ঠীবদ্ধতার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিলেন। এই প্রজাতন্ত্রগুলির কয়েকটি ছিল একক আর কয়েকটি সংযুক্ত (Confederecy)। শাক্য, কোলিয়, মল্ল ছিল একক ধরনের, আর বৃজি, যাদব সংযুক্ত ধরনের। ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহের মধ্য দিয়ে এদের মধ্যে গোঁড়ামি ছিল না। এদের অধঃপতিত ক্ষত্রিয় বা শূদ্র বলা হতো এইজন্য যে এরা ব্রাহ্মণদের বিশেষ 'কেয়ার' করত না। এমন কি বৈদিক আনুষ্ঠানিক কর্মেও বিশ্বাস ছিল না।

প্রাজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে কম হস্তক্ষেপ করা হতো যা ছিল রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ গোঁড়ামি ও মৌলবাদিতায় প্রশ্রয় দেওয়া। এ-কারণেই সম্ভবত এই প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুদ্ধ ও মহাবীরের মত দুই মহান ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব হয়।

সমতলের অধিকার নিয়ে রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহ কেবল ভৌগোলিক অধিকারের জন্যই নয়, এর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল অর্থনৈতিক দিকটি। কারণ, তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলি নদী-বন্দরে অবস্থিত ছিল, অরে রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা কায়েম করতে এইসব নিজ অধিকারে রাখার বাস্তব প্রয়োজন থেকেই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া রাজাদের গত্যন্তর ছিল না। কাশী কোশল, মগধ ও বৃজি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। অবশেষে মগধ বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

মগধের প্রথম রাজা বিম্বিসার প্রথম প্রশাসনিক কার্যে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কর্ম অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেন এবং রাস্তা নির্মাণের উপযোগিতাও উপলব্ধি করেন। জমি পরিমাপের জন্য তিনি রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন, এবং শস্যের পরিমাণ নির্ধারণেরও ব্যবস্থা করেন। কেবল যজ্ঞবেদীই নয়, কৃষিক্ষেত্র পরিমাপ থেকে শুল্বসূত্র উদ্ভূত হতে পারে, অধ্যাপক বাসা এরূপ ধারণা পোষণ করেন।*

গ্রামের চারদিকেই ছিল পতিত জমি, জঙ্গল। এ-সব ছিল রাজার সম্পত্তি; রাজাই কেবল জঙ্গল কেটে চাষের জমি উদ্ধারের অনুমতি দিতেন; অবশ্য রাজাই ছিলেন সব ভূ-সম্পত্তির মালিক। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি

* প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ-১০৮

বেশী ছিল না। গ্রামে বসতির চারদিকে ছিল খেত ও পশুচারণ ক্ষেত্র। কৃষির বিকাশ নিঃসন্দেহে শূদ্রদের ওপর নির্ভর ছিল।

অজাতশত্রুর সিংহাসন আরোহন 493 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং মৃত্যু 461 খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ; 415 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শিশুনাগের অভ্যুদয় ; মাত্র অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই নিম্ন বংশীয় মহাপদ্মের অভ্যুত্থান। এই যুগে ভারতীয় ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ও অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করা যায়ঃ এই যুগের ধর্মীয় গুরুরা বেশীর ভাগই ব্রাহ্মণদের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় ; আবার কোন কোন রাজাও ছিলেন ব্রাহ্মণ।[২]

ভারতীয় ইতিহাসে আর দুটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণঃ একটি 530 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাইরাস (Cyrus[১]) কর্তৃক কম্বোজ, গান্ধার ও সিন্ধুসংলগ্ন অঞ্চল থেকে বিনতি ও উপঢৌকন গ্রহণ অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে পারস্যের সংযোগ এবং অপরটি হলো আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ তথা ভারত-গ্রীক সংযোগ। ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্য ও গ্রীক অভিঘাত উপলব্ধ হয়।

ইতিহাসের তাৎপর্য

এতক্ষণ যে ঐতিহাসিক তথ্য আমরা পরিবেশন করেছি তাতে পূর্ববর্তী যুগ থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিবর্তন, যেমন. নগরের বিকাশ, শিল্পী-কারিগরি শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধি জীবনের অন্য দিকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অর্থাৎ ভিত্তি-কাঠামোর পরিবর্তনে উপর-কাঠামোর পরিবর্তন। এই পরিবর্তন দেখা গেল ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান-ভাবনায়। এই সময়ের ভিত্তি-কাঠামো ও উপর-কাঠামোর মধ্যে দ্বান্দ্বিকতার ভাবটি রোমিলা থাপার সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে বলেছেন,—"The conflict between the established orthodoxy and the aspiration of the newly rising groups in the urban centres must have intensified the process, which resulted in a remarkable richness and vigour in thought which was rarely surpassed in the centuries to come. The ascetic and wandering sophists of the earlier age maintained a tradition of unorthodox thinking, and, in general philosophical speculation ranged from determinism to materialism."[৩] এই যুগেই নানা

দার্শনিক সম্প্রদায় দেখা যায়। চার্বাক তাদের মধ্যে একটি। সুতরাং বস্তু-বাদ ঘেঁষা বৈশেষিক দর্শন যে এই সময়েই আবির্ভূত হবে, এটা ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা।

পরমাণুবাদের উৎস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বুদ্ধের সময়ের কিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে প্রাচীন ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন তুলে ধরেছি। বস্তুত, ওইসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই ভারতীয় চিন্তাবিদদের জগৎকারণের অন্বেষণ করার চিন্তা জাগরিত হয় বলে মনে হয়; অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে, ঋগ্বেদের সময় থেকে জগৎকারণের মূল নিয়ে ভারতীয়দের ভাবনা ছিল, কিন্তু তা তখনো সুসংবদ্ধ আকারে দেখা দেয়নি,—সংশয়রহিতও ছিল না। কিন্তু বিদ্বান পণ্ডিতরা এই ঐতিহাসিক উল্লেখ স্বীকার করবেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত এধরনের বিশ্লেষণ আমার সীমিত জ্ঞানে এখনো আসেনি।* যাই হোক, পরমাণুবাদের উৎস সম্পর্কে আরো তিনটি মত প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সব মত বিশ্লেষণ করলেও সংশয়হীন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

১. প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের মত

সুবিদিত, কণাদ পরমাণুবাদের প্রবক্তা। তাঁর পর থেকে পরমাণুবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তিতর্কের অবতারণা দেখা যায়। এমন কি, পরমাণুবাদে বিশ্বাসী কোন কোন ধর্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায় বৈশেষিক দর্শনসম্মত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার পক্ষে যুক্তি দেখাতে থাকেন। আবার, যাঁরা পরমাণুবাদে বিশ্বাস করেননি—পরমাণুই জগৎকারণ বলে স্বীকার করেননি, তাঁদের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল যে, এই মতবাদ বা মতাদর্শ বেদ-উপনিষদ-স্মৃতি সমর্থিত নয়। সত্যি কথা বলতে কি, বেদ-উপনিষদ ইত্যাদিতে পরমাণু সম্পর্কিত কোন আলোচনা নেই; এমন কি,

* বি. ভি. সুব্বারায়াপ্পা অবশ্য এ-সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি পরমাণুবাদের প্রারম্ভে যে 'heterodox in its position' ছিল, তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর সূত্র গ্রন্থের উল্লেখ থেকে মনে হয় তিনি উই, বোডাস ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতানুসারী; প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের বা বৌদ্ধ পরবর্তী যুগের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে তাঁর আলোচনা নেই। দাশগুপ্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বৈশেষিক দর্শন বা পরমাণুবাদের উদ্ভব প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে বলেই শেষ করেছেন।

অণু বা পরমাণু শব্দের পর্যন্ত নামগন্ধ নেই। সুতরাং পরমাণুবাদ সমর্থন করা যায় না। বাদরায়ণ, বিশেষত শঙ্করাচার্য পরমাণুবাদের তীব্র সমালোচক ও ঘোর বিরোধী ছিলেন।[৪]

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মতবাদীরা অবশ্য এতে বিচলিত হননি, অন্তত প্রশস্তপাদের সময় পর্যন্ত বৈদিক সমর্থনের জন্য প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তাঁরা বেদ বা তৎসম্পর্কিত কোন ঋক, সূত্র বা শ্লোক উদ্ধার করে তাঁদের মতবাদের প্রমাণিকতা দেখাবার প্রচেষ্টা করেননি। মনে হয়, পরমাণুবাদের প্রথম দিকে, অন্তত প্রশস্তপাদ পর্যন্ত এই অভিযোগ তেমন তীব্র আকার ধারণ করেনি, আর ভাববাদী বা সনাতনবাদীরা বোধ হয় অবকাশ ও সুযোগও পাননি। কারণ, গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভাববাদীদের, অধ্যাত্মবাদীদের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রাবল্যের বিরুদ্ধে টিকে থাকার সংগ্রামেই নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। তারপর গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ঘটায় সপ্তম শতাব্দীব প্রায় মাঝামাঝি থেকে পরমাণুবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তীব্র হয়ে ওঠে। তাই শঙ্কর প্রমুখকে সামাল দিতে দশম শতাব্দীতে উদয়ন 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ থেকে একটিমাত্র শ্লোক[৫] কোনক্রমে উদ্ধার করে এই মতবাদ বা মতাদর্শের বেদভুক্তি প্রমাণ করার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। কিন্তু উদয়ন শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা দেন, তা কষ্টকল্পনা ও গোঁজামিল বলেই মনে হয়।* এই শ্লোকটির উদয়নকৃত ব্যাখ্যা এরকম ঃ ঈশ্বর জীবের পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতে পরমাণু সংযোগে তামাম জগৎ সৃষ্টি করেছেন। শ্লোকের প্রথম অংশে কয়েকটি বিশেষণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিভূতির প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন, 'সর্বজ্ঞত্ব', 'সর্বব্যাপকত্ব' ইত্যাদি। উদয়নের মতে, দ্বিতীয় অংশে 'বাহুভ্যাং' ও 'পতত্রৈঃ', শব্দ দুটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'বাহু' শব্দের অর্থ সবার জানা ; এই শব্দটির উৎপত্তি 'বহ' ধাতু থেকে যার মানে 'বহন করা' (to carry)। সুতরাং 'বাহুভ্যাং' দ্বিবচনে বোঝাচ্ছে এমন দুটি বাহু যার দ্বারা বিশ্বসৃষ্টি পাপ-পুণ্যের দ্বারা প্রবহমান। আবার, 'পতত্রঃ' এখানে পরমাণুর রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'পতত্রঃ'-এর মানে আবার পক্ষ বা পাখনাও *(wing)* হয়। পাখায় থাকে গতি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সৃষ্টির আদিতে পরমাণুতে অদৃষ্টের প্রভাবে গতি সঞ্চারিত হয়। সুতরাং উদয়নের মতে, পরমাণু ও পাখনা সমার্থক

---

* ফণিভূষণ তর্কবাগীশ বলেন, "অবশ্য উদয়নাচার্য্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যা অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করেন নাই এবং করিবেন না।" 'ন্যায় পরিচয়', পৃ-৬৫-৬৬

অর্থাৎ পাখনা বা 'পতত্রঃ'-কে পরমাণু বলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে, অধিকাংশ পণ্ডিত তাঁর এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেননি।

সাংখ্যসূত্রও পরমাণুবাদ বেদ বা শ্রুতি সমর্থিত নয় বলে পরমাণু অনিত্য বা বিনাশশীল বলে মনে করে। কিন্তু মধ্যযুগের ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলেন, পরমাণুবাদ সমর্থিত শ্লোকাদি বেদ-উপনিষদে একসময়ে ছিল, কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। 'মনু সংহিতা'-য় পরমাণুর অনিত্যতা সম্পর্কিত নানা যুক্তি আছে বলে তিনি মনে করেন, মনু নিশ্চয় অবলুপ্ত শাস্ত্রীয় শ্লোকের সমর্থনে এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন।[৬] অবশ্য মনু থেকে তাঁর উদ্ধৃত শ্লোকে 'মাত্রা' বলতে সাংখ্যের 'তন্মাত্রা' বোঝায়, আর 'অণু' খুব সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র অর্থ বোঝায়। এবং তা নিঃসন্দেহে 'মাত্রা'-র বিশেষণ। অথচ অণু যখন পরমাণু বোঝায় তা অবশ্যই বিশেষ্য পদ। মেধাতিথিও অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা ও অভিমত সমর্থন করেননি। তবে একটি কথা এই যে, কণাদ, গোতম ও কপিল পরমাণুবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা আলোচনা করায় এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হবেনা যে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে হয়তো এ-সম্পর্কে আলোচনা ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ আর নিঃসন্দিগ্ধ কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রচলিত বেদ-উপনিষদে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, কণাদ পরমাণুবাদের প্রবক্তা, কিন্তু জনক নন। কথাটি গোতমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২. ক্লাসিক্যাল গবেষণা

দেশ বিদেশের ক্লাসিক্যাল গবেষকরা স্বীকার করেছেন বেদ-উপনিষদে পরমাণুবাদ সম্পর্কিত কোন শ্লোকাদি নেই। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত বেণীমাধব বড়ুয়া ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি কাহিনী বিবৃত করে দেখিয়েছেন পরমাণুবাদের মূল ধারণা এখানেই নিহিত আছে। তাঁর মতে, পুত্র শ্বেতকেতুর একটি প্রশ্নের উত্তরে পিতা উদ্দালক আরুণি যে উত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্যেই পরমাণুবাদের বীজ নিহিত।[৭] তাঁর মতে, উদ্দালক আরুণিই প্রকৃতপক্ষে পরমাণুবাদের প্রবক্তা। কারণ, উদ্দালক বলেন, কণিকার (particle) সংযুক্তি-বিযুক্তির ফলেই বস্তুর উৎপত্তি।[৮] বৈশেষিক দর্শনে 'সংযোগ' (Conjunction) ও 'বিয়োগ' (disjunction) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে উদ্দালকের সঙ্গে কণাদের সাদৃশ্য লক্ষ করার মত।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্যত্রও (৬।১২।১-২) এমন একটি কাহিনী পাওয়া যায় যা থেকে পরমাণু-ভাবনার আদি রূপটি উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এখানেও অবশ্য ঋষি হচ্ছেন উদ্দালক আরুণি। এই উদ্দালক আরুণি এক অদ্ভুত ঋষি যিনি প্রবল ভাববাদী ছিলেন বলে মনে হয় না। ছান্দোগ্যের সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় জুড়ে তিনি বিরাজ করছেন, আবার বৃহদারণ্যকেও তাঁর কম উপস্থিতি নয়। কিন্তু সর্বত্র বাস্তববাদী, অন্তত বস্তুবাদের কাছঘেঁষা।[৯] বৃহদারণ্যকের শেষে তো তিনি কামশাস্ত্র নিয়েও আলোচনা করছেন। আবার ছান্দোগ্য-এর সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায়ে গভীর তত্ত্ব বোঝানোর জন্য তিনি যে-সব উদাহরণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবতারণা করেছেন, তা যেন একেবারে একালের বিজ্ঞানীদের মত। এই উদ্দালক আরুণি সম্পর্কে প্রখ্যাত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেছেন, তা শ্রদ্ধার সহিত বিবেচনার যোগ্য বলে মনে হয়। অবশ্য তিনি অন্য প্রসঙ্গে—ঋষির বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী একটি পরীক্ষা ভিত্তিতে ব্যক্ত হওয়ায় এই মন্তব্য করলেও এটি বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গেও সমপরিমাণে প্রযোজ্য। যাই হোক, তিনি বলেন,—"পৃথিবীর ইতিহাসে পরীক্ষামূলকভাবে কোনো বিষয় প্রমাণ করার এর চেয়ে প্রাচীন কোনো নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। সেদিক থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে উদ্দালকের প্রাপ্য সম্মান তিনি এখনো পাননি। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় প্রচলিত পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিকতা অবশ্যই তার একটি কারণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারতীয় বিদ্বানদের পক্ষে উদ্দালককে নিছক আত্মাবাদী বা ভাববাদী বলে ধরে নেবার সুদীর্ঘ প্রথাও নিশ্চয় সম্পূর্ণ দায়মুক্ত নয়।"[১০] এবার ছান্দোগ্যের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক :

পুত্র শ্বেতকেতু প্রশ্ন করছেন : কিভাবে বিশ্বের তাবৎ ভৌত জগৎ অনন্ত-সূক্ষ্ম 'সৎ' থেকে উৎপন্ন হয়েছে ? উদ্দালক সরাসরি এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটি পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করলেন। পিতা-পুত্রের প্রশ্নোত্তর এরকম :

উদ্দালক : সামনের ওই বটগাছ থেকে একটা ফল নিয়ে এস।

শ্বেতকেতু : পিতা, এই যে বটফল।

উ : চূর্ণ করে ফেল।

শ্বে : করেছি।

উ : কি দেখছ ?

শ্বে ঃ দানাগুলি খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বোধ হচ্ছে (অণ্ব্য ইমেবা ধানা ভগব ইতি)।

উ ঃ একটিমাত্র দানা নাও ; চূর্ণ কর।

শ্বে ঃ করেছি, ভগবন।

উ ঃ এখন কি দেখছ ?

শ্বে ঃ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, ভগবন (ন কিঞ্চন ভগব ইতি)।

এবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চারটি পর্যায় 'প্রত্যক্ষণ', 'অনুমান' ইত্যাদি প্রয়োগ করলেন উদ্দালক। তিনি বললেন, বটের বীজ চূর্ণ হওয়ায় দেখা গেল না সত্য, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণিকা দিয়েই বটফল উৎপন্ন হয়েছিল। আবার অতি ক্ষুদ্র বটের বীজ থেকেই বৃহৎ বৃক্ষের উদ্ভব হয়। তেমনি এই স্থূল ভৌত জগৎ অতি ক্ষুদ্র 'সৎ' থেকে উৎপন্ন। দর্শনের চুলচেরা বিচারে উদ্দালকের ধারণা, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির সঙ্গে কণাদের মতবাদের অসঙ্গতি দেখানো অসম্ভব নয়। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, জ্ঞানের বিকাশের প্রথম দিকে উপনিষদের ধারণা ও দার্শনিক ধারণা একান্তই অনুমানভিত্তিক—মাজাঘষার কাজ অনেক বাকী ছিল।[১১]

বেদ-উপনিষদ ছাড়া অন্যত্র পরমাণুবাদের উৎস সন্ধান করেন বিখ্যাত পণ্ডিত উই (Ui)। তাঁর মতে, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক পকুদ্ধ কচ্চায়ন পরমাণুবাদের প্রবক্তা এবং শাশ্বতবাদের মধ্য দিয়েই পরমাণুবাদের উদ্ভব। 'দীর্ঘনিকায়'-এর 'সামন্ন-ফল-সুত্ত'-এ কচ্চায়নের পদার্থ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে, সাত প্রকার 'কায়' (thing) সৃষ্ট হয় না, প্রস্তুত করাও যায় না ; তারা বন্ধ্যা। এই 'কায়' সকল 'পৃথিবী', 'জল', 'অগ্নি', 'বায়ু', 'শান্তি', 'বেদনা' ও 'আত্মা'। বৈশেষিক দর্শনে 'পৃথিবী', 'জল', 'অগ্নি' ও 'বায়ু' এই চারটি দ্রব্যের (Substance) পরমাণু নিত্য বা অবিনাশী।

৩. আধুনিক গবেষণা

আধুনিক গবেষকরা বেদ-উপনিষদের মধ্যে পরমাণুবাদের উৎস খুঁজতে না গিয়ে অবস্থা বা পটভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, গ্রীক পরমাণুবাদ যেমন পারমেনাইডিস ও হেরাক্লিটাসের পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সংশ্লেষণের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল,* ভারতীয় পরমাণুবাদও তেমনি ব্রাহ্মণ্য বা উপনিষদিক ও বৌদ্ধ মতের সংশ্লেষণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। পারমেনাই-

* এই ধারণা ফ্যারিংটনের ; দ্রষ্টব্য : *Greek Science*, P. 63.

ডিস ও হেরাক্লিটাসের পরস্পর বিরোধী ধ্যান-ধারণার সংশ্লেষ ঘটিয়ে ডিমোক্রিটাস তাঁর সময়কার সমস্যার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেন। তেমনি কণাদও উপনিষদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম—নিত্যকে বৌদ্ধধর্মের অনন্ত প্রবাহ-এর (flux) সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটিয়ে পরমাণুবাদের অবতারণা করেন : বস্তুত, পরমাণু নিত্য, অখণ্ডনীয়, অবিভাজ্য—একক সত্তার প্রতীক ; আবার পরমাণুর 'সংযোগ' ও 'বিভাগ' হওয়া তথা বিকাশশীলতার (becoming) প্রতীক।

এই গবেষণা বা দৃষ্টিভঙ্গী বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হলেও, এতে দর্শনের গভীরতা থাকলেও, এতে সমাজ-কাঠামো ও বিভিন্ন বিষয়ের সহিত তার জটিল প্রক্রিয়া উপেক্ষিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে, এখানে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ উপেক্ষিত হয়েছে। "কারণটা খুব সহজ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের বাস্তব চিত্রটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরা প্রস্তুত নন। তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে ধনতন্ত্র এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে ধরবার বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করে দার্শনিক ভাববাদ বা দুর্জ্ঞেয়বাদে আশ্রয় নেবার একটি মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।"[১২] ইতিপূর্বে আমরা পরমাণুবাদ তথা বৈশেষিক দর্শনের উদ্ভবের সম্ভাব্যতা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করেছি। সেই ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে যেমন এই বিশুদ্ধ গবেষণা সমর্থিত হচ্ছেনা, তেমনি আবার সাংখ্য দর্শনের মতেও হচ্ছেনা। কারণ, সাংখ্যের 'প্রধান' বা 'প্রকৃতি'-র মধ্যে এই বিশ্লেষণ দেখতে পাওয়া যায়। 'প্রধান'-কে বিশ্বের প্রথম কারণস্বরূপ বলা হয় যা কিনা আকারহীন, অনন্ত ; সৃষ্টি বা অভিব্যক্তিতে তার নিত্য গতি ও ভৌত জগতে নানা বিচিত্র আকারে তার প্রকাশ। পরিদৃশ্যমান বা ভৌত জগতের প্রেক্ষিতে অনন্তকাল ধরে তার রূপান্তর ঘটে চলেছে।[১৩] এখানে দু-মতের সংশ্লেষ বা দ্বন্দ্বের লক্ষণ স্পষ্ট। আমাদের মনে হয় উদ্দালকীয় স্থূল পরীক্ষাসমূহই ছিল সম্ভবত পরমাণুবাদের উদ্ভবের তাত্ত্বিক কাঠামো।*

* বেঞ্জামিন ফ্যারিংটন ডিমোক্রিটাসের তত্ত্বের তথ্যগত ভিত্তির সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন : "Its factual basis consists in observations of technical and natural processes by the unaided senses, together with a

পরমাণুবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা নানা মুনির নানা মত পেলাম। কিন্তু ইতিবাচক—নিশ্চয়তাবাচক তেমন-কিছু পাইনি। বিজ্ঞান-ভিক্ষুর বিশ্লেষণ গ্রহণ করলে মনে হয় বেদ-উপনিষদে এ-বিষয়ে ছিল, কিন্তু বর্তমানে অবলুপ্ত। তবে গবেষণায় বস্তুতান্ত্রিক ঐ দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গ্রহণ করে অগ্রসর হলে যার কিছু আমরা গ্রহণ করেছি, তাতে কিছু ফল মিলতে পারে। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলসের নামে আতঙ্কগ্রস্তরা এদিকে অগ্রসর হবেন কিনা সন্দেহ। আবার একথাও স্মরণ রাখতে হবে ইতিহাসে পরিবর্তন বা ভাবাদর্শ বা মতাদর্শ উদ্ভবের সঠিক ক্ষণ নিরূপণ করার চেয়ে কালপর্ব গ্রহণ করে বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়। বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য ও গ্রহণীয়।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। কণাদের ব্যক্তিগত পরিচয় কিছু জানা যায় না এবং কোন সময়ে তাঁর আবির্ভাব এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইয়াকোবি (Jacobi) বলেন, ন্যায়সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র সম্পাদিত হয়েছিল 200 থেকে 500 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ; মীমাংসাসূত্র ও বৈশেষিক-সূত্র এর পূর্বে কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়ে থাকবে। বোদা (Bodas) বলেন, কণাদ ও গোতমের গ্রন্থ 400 খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী নয়, কিন্তু জৈমিনি ও বাদরায়ণের পরে অর্থাৎ 600 খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর। কুপ্পুস্বামী মনে করেন বৈশেষিকসূত্র 400 খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্ববর্তী ; আবার প্রখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন বৈশেষিকসূত্র বৌদ্ধপূর্ব যুগের এবং তিনি দৃঢ় মত পোষণ করেন যে, বৈশেষিকসূত্র 'চরক সংহিতা'-র (80.A.D) পূর্বেই লেখা হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, চরকের গ্রন্থ বৈশেষিক দর্শনের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং তার সমর্থনে একটি বৈশেষিক সূত্রও উদ্ধৃত করেছেন তিনি। সুব্বারায়াপ্পা

few experimental demonstrations... ...", *Greek Science*, P. 63 আমরাও পাঠকদের বৌদ্ধ ও পরবর্তী যুগের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, কারিগরিবিদ্যা, কারুশিল্প ও স্বাভাবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা স্মরণ করতে বলি যা আমরা এখানে ও অষ্টম অধ্যায়ে করেছি।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মত সমর্থন করেন, BNISI, 22, P. 127, 1961.

২। Thapar, Romila—*A History of India*, vol-I, P. 57.

৩। Ibid P. 63.

৪। এই সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত History of Hindu Chemistry গ্রন্থে শঙ্করাচার্যের 'বেদান্ত সূত্র' থেকে প্রমাণ উদ্ধার করে লিখেছেন,—[Observed Sankara] "It thus appears that the atomic doctrine is supported by very weak arguments only, is opposed to those scriptural passages which declare the Lord to be general cause, and is not accepted by any of the authorities taking their stand on scripture, such as Manu and others." পরে আমরা মূল সংস্কৃত অংশ উদ্ধৃত করব।

৫। বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতঃপাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন দেব একঃ ॥ ৩/৩

৬। বিজ্ঞানভিক্ষু মনুস্মৃতি (I. 27) থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন :

অণ্বো মাত্রা বিনাশিন্যো দশার্ধানাম্ চ যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্ধম্ ইদম্ সর্বম্ সম্ভবত্যনুপূর্বশঃ ॥

৭। শ্বেতকেতুর প্রশ্ন ঃ পদার্থের অন্তিম অবস্থা কি ? কিভাবে ক্রমশ বস্তু উৎপন্ন হয়েছে ?

৮। Barua, B. M—*A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy*, P. 137-138

৯। ইয়াকোবি (Jacobi) ও রুবেন (Ruben) প্রমুখ পণ্ডিতরা তাই মনে করেন। শেষ অধ্যায়ে আমরা রুবেনের মত আলোচনা করেছি।

১০। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে,' পৃ—১২৬

১১। বিস্তারিত আলোচনা *Indian Atomism*, p. 42-43 দ্রষ্টব্য।

১২। টমসন, জর্জ—'ধর্ম ও সমাজ', পৃ-৯

১৩। Gangopadhyaya, M. K.—*Indian Atomism*, p. 8

পঞ্চম অধ্যায়

পরমাণুবাদ : ভারতীয় দর্শনে

প্রাচীন ভারতে পরমাণুবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল এবং তার অগ্রগতি প্রথম দিকে অনবচ্ছিন্ন ধারায় না হলেও পরের দিকে প্রবহমান ছিল সুদীর্ঘদিন ধরে। যদিও কণাদের পর থেকে প্রশস্তপাদ পর্যন্ত বৈশেষিক দর্শন তথা পরমাণুবাদে সামান্য উপাদান সংযোজিত হয়েছে, কিন্তু তারপর আর বিশেষ কিছুই নেই ন্যায়-বৈশেষিকের সূত্র, ভাষ্যের ব্যাখ্যা ছাড়া, আর বিরুদ্ধবাদীদের তোলা নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া।* জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একদল বিদ্বান সোচ্চার ছিলেন, বিশেষত সপ্তম শতাব্দী থেকে। একটি আপাত আশ্চর্য ও অদ্ভুত বিষয় লক্ষ করা যায় যে, একই ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়েও পরমাণুবাদের মূল ভাবনায় বিশ্বাসী চিন্তাবিদদের অভাব এ-দেশে দেখা যায়নি। যেমন, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়। ন্যায়-বৈশেষিক মতাদর্শের সহিত তাঁদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই ছিল। আবার, বৌদ্ধদের মধ্যে সবাই পরমাণুবাদে আস্থা স্থাপন করেননি। যেমন, মহাযানীরা ছিলেন বিরুদ্ধবাদী, বিশেষ করে যোগাচারীরা। ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্তবাদীরা ছিলেন পরমাণুবাদের ঘোর বিরুদ্ধে; মীমাংসকগণ অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মত পরমাণুবাদ নস্যাৎ করার কাজে উঠেপড়ে লাগেননি বটে, কিন্তু এতে তাঁদের সায় তেমন দেখা যায় না, আর সোচ্চার তো ছিলেনই না। সাংখ্যদের ঠিক পরমাণুবাদী বলা যায় না, যদিও কখনো-সখনো দু-একজন ভাষ্যকার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেননি। কিন্তু তা অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। যেমন,—সাংখ্য-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর (১৬৫০ খ্রীস্টাব্দ) মতে, বৈশেষিকের 'পরমাণু' ও সাংখ্যের 'তন্মাত্র' সমার্থক। এই দুই সম্প্রদায় বাহ্য জগৎ-সত্তায় বিশ্বাসী সত্য, কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা ব্যক্ত জগতের বৈচিত্র্যে বিশ্বাসী; অপরপক্ষে, সাংখ্যেরা একটিমাত্র কারণ—'প্রকৃতি' বা 'অব্যক্ত'-এর কারণে জগতের উৎপত্তি বলে বিশ্বাস করেন। ক্ষুদ্রতা বা সূক্ষ্মতার দিক থেকে দেখলে অবশ্য 'পরমাণু' ও 'তন্মাত্র'-য়

* অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়-বৈশেষিক নানা মতের খণ্ডন করে কিছু অভিনবত্ব দেখান।

সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু দুটির ধারণা বা প্রত্যয় এক নয়। পরমাণু পদার্থের অন্তিম সত্তা, অবিভাজ্য, নিরংশী ও অবিনাশী ; প্রলয়েও তার বিনাশ নেই, রূপান্তর বা পরিবর্তন নেই। কিন্তু তন্মাত্র তিনটি গুণের সমষ্টি বা সম্যাবস্থা—পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তিম সত্তা নয় ; প্রলয়ে এরা প্রকৃতি বা অব্যক্তে লীন হয়। কার্যকারণবাদেও উভয় মতাদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বৈশেষিকরা অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী, আর সাংখ্যেরা সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী। *

ন্যায়-বৈশেষিক-জৈন-বৌদ্ধ-সাংখ্য-মীমাংসা এই ষড়দর্শনের মধ্যে কেউ কেউ পরমাণুবাদী, আবার কেউ কেউ এর বিরুদ্ধে। এই ছোট বই-এ সব মতের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, আর তা আমাদের পরিকল্পনারও বাইরে। পরমাণুবাদের কথা বলতে সাধারণত আমরা কণাদ তথা বৈশেষিক দর্শনের কথাই বুঝি। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকরা একযোগে পরমাণুবাদের সমর্থক ছিলেন, এবং তাঁদের দর্শনের প্রাণবস্তু বলতে পরমাণুবাদ। তাই, মূলত আমরা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে প্রাপ্ত পরমাণু সম্পর্কে নানা ধারণা নিয়েই আলোচনা করব। কিন্তু আমাদের আলোচনায় জৈন ও বৌদ্ধ মতে পরমাণুবাদ এড়িয়ে গেলে চলবে না। কেননা, প্রাচীনকাল থেকেই এই দুই সম্প্রদায় পরমাণুবাদ সম্পর্কে নানা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তা ছাড়া পরমাণুবাদের প্রবক্তা হিসাবে পণ্ডিতরা কখনো কখনো জৈনদের, আবার কখনো কখনো বৌদ্ধদের পক্ষে ভোট দিয়ে থাকেন। এই অধ্যায়ে আমরা প্রধানত ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধ মতাদর্শ অনুযায়ী পারমাণবিক তত্ত্ব আলোচনা করলেও, আলোচনা সূত্রে অন্যান্য দার্শনিক মতাদর্শেরও উল্লেখ না করে পারা যাবেনা।

১. ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুবাদ

ভারতীয় পরমাণুবাদের কথা উঠলেই কণাদের নাম এসে পড়ে। তাঁকেই বৈশেষিক দর্শনের প্রবক্তা ও পরমাণুবাদের জনক বলা হয়। জৈন-বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের আগেই তিনি বর্তমান ছিলেন,—এরূপ অনুমান করেন প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।[১] কিন্তু তাঁর সূত্রের অর্থ করা তো কঠিনই, এমন কি মর্ম গ্রহণ করাও সহজ নয়।[২] তবে এই দর্শনের ওপর পরবর্তীকালে অনেক অনেক নামী-দামী টীকা-ভাষ্য রচিত হয়েছে বলে পরমাণুবাদ

* উভয় মতের আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অবশ্য প্রশস্তপাদকে ঠিক ভাষ্যকার বলা যায় না; তাঁর 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' মৌলিক গ্রন্থ বলেই মনে হয়। কিন্তু উদয়ন, শ্রীধর প্রমুখ ভাষ্যকার সন্দেহ নেই। পরমাণুবাদের আলোচনায় কেবল বৈশেষিকদের অবদানই নেই, নৈয়ায়িকদের অবদানও অসামান্য। এই দুই দর্শনে কিছু কিছু অমিল থাকলেও উভয় মতাদর্শের প্রাণবস্তু পরমাণু যা কিনা পরিদৃশ্যমান জগৎ বৈচিত্র্যের মুখ্য কারণ। প্রাচীন নৈয়ায়িক হচ্ছেন গোতম বা গৌতম; তাঁর গ্রন্থ—'ন্যায়সূত্র'। এই গ্রন্থটিও চতুর্থ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের আগে রচিত বলে দাশগুপ্ত ও কুপ্পুস্বামীর ন্যায় পণ্ডিতরা মনে করেন। বস্তুতপক্ষে, বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন পরে পরে এমন মিলে-জুলে যায় যে, প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে 'ন্যায়-বৈশেষিক' নামে আখ্যাত হয়। খুব সম্ভব, দশম শতাব্দীর উদয়ন এই কাণ্ডটি ঘটান।[৩] যাই হোক, ন্যায় সূত্রের নানা টীকা-ভাষ্যও পরমাণুবাদের প্রবহমানতায় সবিশেষ আনুকূল্য প্রদান করেছে। প্রাচীন ভাষ্যকার হলেন বাৎস্যায়ন (৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) (কামশাস্ত্রের রচয়িতা নন), উদ্দ্যোতকার (৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দ), বাচস্পতি মিশ্র (৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ), উদয়ন (৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ। এঁদের সঙ্গে আমাদের এই বাংলার—ভুরশুট গ্রামের শ্রীধরের নাম অবশ্যই যুক্ত হবে বৈশেষিক দর্শনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হিসাবে। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, তাঁর 'ন্যায়-কন্দলী' (৯৯০/৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ) রঙ্গব্যঙ্গ-দেশ রাঢ়ে পঠিত ও আলোচিত হয়নি, সমাদৃত হওয়া তো দূরের কথা।

দর্শনের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে না হলেও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের কাছে এটা আশ্চর্য বলে মনে হতে পারে যে, কণাদের বৈশেষিকসূত্রে 'পরমাণু' শব্দটির উল্লেখ নেই—'অণু' শব্দের উল্লেখ আছে। উপনিষদে 'অণু' শব্দটি বিশেষ্যপদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি সত্য, কিন্তু 'অণু'র স্ত্রীলিঙ্গ আকার বা বিশেষণ পদ হিসাবে ব্যবহার আছে খুব ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম অর্থে। কণাদ কি উপনিষদ থেকে শব্দটি নিয়ে বিশেষ্যপদ হিসাবে ব্যবহার করে তাঁর দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন? পণ্ডিতরা চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারেন বলে এমন একটি জিজ্ঞাসা বা সম্ভাব্যতার কথা বলা গেল মাত্র। যাই হোক, ভাষ্যকার ও অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে 'অণু'-ই হলো 'পরমাণু'; আর অণুর এই মানেটাই কণাদের 'বুদ্ধিস্থ' বা মাথায় ছিল।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদেরও জানা, যৌগের তুলনায় মৌলের সংখ্যা নগণ্য, —একুনে বিরানব্বুইটি বা একশ' পাঁচটি। কিন্তু তা হলেও এই বিরানব্বুই বা

একশ' পাঁচটি মৌলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হওয়া যে কঠিন, তা বোধ করি রসায়নের ছাত্র-ছাত্রীরা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছেন। যাইহোক, এটাও জানা যে, কাজটি সহজ করার জন্য পর্যায় সারণীর (Periodic Table) উদ্ভব। কিন্তু এটি তো এই সেদিনের—অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের আবিষ্কার। মেন্দালয়েদকে ধন্যবাদ, আর আমাদের ওই বৃদ্ধ কণাদকেও ধন্যবাদ জানাতে হবে। মনে হয়, প্রাচীন ভারতে কণাদও অনুরূপ কোন আনুমানিক ধারণার বশবর্তী হয়ে অনুমান ও যুক্তির সাহায্যে জাগতিক পদার্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ করেন। এরূপ শ্রেণীই এক-একটি 'বর্গ' ; এক-একটি বর্গ হচ্ছে এক-একটি পদার্থ। কণাদ ছ-রকমের পদার্থ স্বীকার করেছেন: 'দ্রব্য', 'গুণ', 'কর্ম', 'সামান্য,' 'বিশেষ' ও 'সমবায়' ; আবার প্রশস্তপাদ এর সঙ্গে আর একটি পদার্থ 'অভাব' যোগ করেছেন। অবশ্য ন্যায়সূত্রকার গোতম ষোল রকমের পদার্থের কথা বলেন।[৪] সে যাই হোক, বর্তমানে পদার্থসমূহ অর্থাৎ মৌলগুলি সাতটি পর্যায়ে (period) বিভক্ত,—এটা লক্ষ না করে পারা যায় না। এটা অবশ্য কাকতালীয়ও হতে পারে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য (Substance) নয় রকমের হলেও পাঁচটি হলো ভৌত দ্রব্য। ক্ষিতি (পৃথিবী বা মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বায়ু) ও আকাশের এমন কোন-না-কোন বিশেষ গুণ (Specific quality) আছে যা কিনা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। যেমন, মাটির চারটি গুণ—'স্পর্শ', 'রূপ', 'রস' ও 'গন্ধ' যথাক্রমে 'ত্বক,' 'চোখ,' 'জিব' ও 'ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের' দ্বারা বোঝা যায়। তেমনি জলের তিনটি বিশেষ গুণ—'স্পর্শ,' 'রূপ' ও 'রস'ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য ; আগুনের বিশেষ গুণ 'স্পর্শ' ও 'রূপ' এবং বায়ুর বেলায় কেবল 'স্পর্শ'।

ভূতদ্রব্য পাঁচটি হলে কি হবে, চার ভূতদ্রব্য—মাটি, জল, আগুন ও বায়ুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করার মত ঃ এরা নিত্য আর অনিত্য—দু-রকমই হতে পারে। এরা যখন পারমাণবিক অবস্থায় অর্থাৎ এদের পরমাণুগুলি নিত্য—তখন এদের উদ্ভবও নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু আমরা এই চর্মচক্ষু দিয়ে যখন মাটি, জল ইত্যাদি দেখি, তখন এরা স্থূল। তাই তখন এরা অনিত্য।

পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার কেন করতে হবে, এ-নিয়ে আলোচনার আগে ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণুর ধারণাটি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মাটি, জল, আগুন ও বায়ুর পরমাণু নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী। পরমাণু অবিভাজ্য ও পরিমাণরহিত। পরমাণু অতিশয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা; সব রকম উৎপাদশীল পদার্থের উপাদান কারণ (material cause)। প্রত্যেক দ্রব্যের নিজস্ব পরমাণু ও তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম বর্তমান। পরমাণু বর্তুলাকার বা পরিমন্ডলীকার বলে অনুমিত। গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে অর্থাৎ গুণ (quality) দ্রব্যকে ছেড়ে থাকতে পারেনা। তাই পরমাণুর মধ্যেও গুণ বর্তমান। পরমাণুর সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই; এমন কি, প্রলয়কালেও (খন্ড প্রলয়ে) এদের বিনাশ হয় না। পরমাণুবাদ নিয়ে আরো আলোচনার আগে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকারের বিরুদ্ধে যে-সব দার্শনিক যুক্তিতর্ক ছিল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

পরমাণুর অস্তিত্ব ঃ তর্কবিতর্ক

এরকম প্রশ্ন হতে পারে ঃ আমরা যে মাটি, জল ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি, তাদের অস্তিত্ব স্বীকারে কোন বাধা নেই, আপত্তিও নেই, কিন্তু মাটি, জল ইত্যাদির পরমাণু স্বীকার করব কেন? ন্যায়-বৈশেষিকদের যুক্তি এরকম ঃ যে-কোন জড় দ্রব্যকেই আমরা প্রত্যক্ষ করিনা কেন, তাদের বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ দর্শনের ভাষায় 'অবয়ব'-এ বিভক্ত করা যায়। উদাহরণ হিসাবে ন্যায়-বৈশেষিকদের ঘট (Jar) খুব প্রিয়। তাই এটা ধরেই বলা যাক ঃ ঘটটিকে দু-ভাগ করতে পারি : প্রতিটি খন্ডকে আবার দু-ভাগ করতে পারি ; আবার, ওই খন্ডগুলিকে ছোট ছোট খন্ড করে করে একেবারে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে পারি যে, তখন আর খন্ড করা বা ভাগ করা বা ভাঙা সম্ভব নয়। এই রকম অবস্থায় যে-ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পাব, তা-ই হলো পরমাণু। এই দু-ভাগ বা অর্ধাংশ করে করে পরমাণু ধারণায় পৌঁছানো এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন সভ্যদেশ চীনেও দেখা যায়। এটি এশীয় বৈশিষ্ট্য বা সমান্তরাল চিন্তাধারা কিনা পন্ডিতরা বলতে পারেন। তবে আমরা বলতে পারি যে, এই ধারণা চীনা নৈয়ায়িকদের মধ্যে চতুর্থ-তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দেখতে পাওয়া যায়। মিং চিয়া (Ming Chia) সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ হুই শি-এর (Hui Shih) এ-বিষয়ে প্রকাশভঙ্গীটি অবশ্য ধাঁধার মত,—গ্রীসের জেনোর মত। যাই হোক, তাঁর এই ধাঁধার মধ্যে পরমাণুর ধারণা নিহিত ছিল বলে পন্ডিতরা মনে করেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক একটি ধাঁধা ঃ "সর্বাপেক্ষা

ক্ষুদ্রের মধ্যে আর কিছু নেই, এবং সেইজন্য তাকে ক্ষুদ্র একক বলে" (…"the smallest has nothing within itself, and is called the Small Unit")।[৫]

জড় দ্রব্যের বিভাগের শেষ আছে, এটি অনেকে মানতে চাননা। তাঁদের যুক্তি, বিভাগের শেষ আছে,—একথা মানব কেন ? যদি বলা হয়, 'অনবস্থা দোষ' (Fallacy of infinite regress) এড়ানোর জন্যে মানতে হবে, তা হলে এক্ষেত্রে কিন্তু মানার দরকার নেই। কারণ, 'প্রামাণিক অনবস্থা' স্বীকার তো করতে হয়। সুতরাং পরমাণু বলে কিছু মানার দরকার নেই বলে পরমাণুর অস্তিত্ব নেই।

আর যদি বা বিভাগের শেষ আছে বলে নেহাৎ স্বীকার করতেই হয়, তা হলে শেষ হবে শূন্যতায় ; তখন জড় দ্রব্যের কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এই দুটি বিরুদ্ধ মতের মোকাবিলা কিভাবে ন্যায়-বৈশেষিকরা করলেন, তা লক্ষ করা যাক। প্রথমত, বিভাগের শেষ নেই অর্থাৎ জড় দ্রব্য অনন্ত-বিভাজ্য, এটি যুক্তির নিরিখে টেকেনা। কারণ, জড় পদার্থকে অনন্তবিভাজ্য বললে 'অনবস্থা দোষ' হয়। এই অনবস্থা প্রামাণিক নয়। কেননা, তা হলে বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণের যে-পার্থক্য আমরা উপলব্ধি করি, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পর্বত ও সর্ষের দানার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন। যুক্তিটি এরকম ঃ পর্বত অনন্তবিভাজ্য, আর সর্ষের দানাও অনন্তবিভাজ্য। তা হলে পরিমাণের দিক থেকে তারা সমপরিমাণ! কিন্তু এই যুক্তি কি মানা যায় ?

আবার, জড় বস্তুর বিভাগের সীমায় এসে আমরা শূন্যতা পাইনা। কারণ, যত বিভাগই আমরা করিনা কেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দ্রব্যই পাওয়া যায়। কেননা, 'বিভাগ' হচ্ছে কিনা একটি গুণ (quality), আর তা দ্রব্যকে আশ্রয় করেই থাকে। শেষ বিভাগে শূন্যতা পেলে বিভাগ-গুণটি কোন্ দ্রব্যকে আশ্রয় করে থাকবে ? সুতরাং শেষ বিভাগের আশ্রয় যে-দ্রব্য, তা-ই হলো পরমাণু। কারণ, নিরাশ্রয় বিভাগ অলীক।[৬]

পরমাণু থেকে স্থূল দ্রব্যসৃষ্টি

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পরমাণুগুলির বিশেষ গুণ আছে সত্য কিন্তু তাদের নিজেদের গতি নেই। কিন্তু তবুও পরমাণু থেকে কিভাবে স্থূল

থেকে স্থূলতর পদার্থ সৃষ্টি হয় ? তাঁদের মতে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করেন জীব যাতে তাদের অদৃষ্ট অনুযায়ী কর্মফল ভোগ করতে পারে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছার ফলেই পরমাণুগুলির মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয়। আর এর ফলেই দুটি পরমাণু সংযুক্ত হয়ে একটি 'দ্ব্যণুক' সৃষ্টি করে। দুটি এক-জাতীয় পরমাণুই 'দ্ব্যণুক' সৃষ্টি করে, ভিন্ন জাতীয় দুটি পরমাণু 'দ্ব্যণুক' উৎপন্ন করতে পারেনা। অর্থাৎ দুটি মাটির পরমাণু দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে, কিন্তু একটি মাটির পরমাণু আর একটি জলের পরমাণু সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক উৎপন্ন করতে পারেনা। পরমাণুগুলি অপ্রত্যক্ষ, আর দ্ব্যণুকও অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ দেখা যায় না। আবার, তিনটি দ্ব্যণুক মিলে একটি 'ত্র্যণুক' বা 'ত্রসরেণু'* উৎপন্ন করে ; চারটি ত্র্যণুক মিলে একটি 'চতুরণুক' উৎপন্ন করে। 'ত্র্যণুক'-ই সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষগোচর জড় দ্রব্য, এবং 'চতুরণুক' ত্র্যণুকের চেয়ে বেশী স্থূল। এইভাবে ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর মাটি, জল, আগুন ও বায়ু পদার্থের সৃষ্টি হয়।

স্থূল দ্রব্যের সৃষ্টি ঃ আপত্তি ও ব্যাখ্যা

ন্যায়-বৈশেষিক মতাদর্শে পরমাণু 'সংযোগ'-এর (conjoin) দ্বারা স্থূল দ্রব্যের সৃষ্টি করে। পরমাণু সংযোগ নিয়ে নানা আপত্তি আমরা একটু পরেই আলোচনা করব একটু বিস্তারিতভাবে। কিন্তু তার আগে স্থূল দ্রব্যের উৎপন্ন হওয়া নিয়েই আপত্তিটা দেখা যাক। আমরা দেখলাম, প্রতিটি পরমাণু অতি সূক্ষ্ম, এবং এমন সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র যে, তা প্রত্যক্ষগোচর হয় না বা দেখাই যায় না। অপ্রত্যক্ষ কোন-কিছু থেকে কিছু উৎপন্ন হলে তাও অপ্রত্যক্ষ হওয়া উচিত লজিকের নিয়মে। কিন্তু আমরা যে মাটি, জল ইত্যাদি দেখি তা তো স্থূল। সুতরাং লজিকের নিয়মের ব্যতিক্রম করে এই স্থূলত্বের উৎপত্তি হয় কি করে ?

পরমাণুবাদীরা এর যথাযথ উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন 'বহুত্ব' শব্দটি প্রয়োগ করে। সংস্কৃতে তিনটি বচন ; একের বেশী দুটি হলে কিন্তু 'বহু' বোঝায় না। 'বহু' বোঝাতে গেলে কমপক্ষে তিনটি হওয়া দরকার। ন্যায়-

* নব্যন্যায় সম্প্রদায়ের প্রবক্তা রঘুনাথ শিরোমণি পরমাণু ও দ্ব্যণুক স্বীকার করেন না। তিনি বলেন ত্র্যণুক বা ত্রসরেণুতেই 'বিশ্রান্তি' অর্থাৎ ত্র্যণুকের পর আর কিছু নেই —'ত্রুটাবেব বিশ্রামাৎ'। কিন্তু ন্যায় সূত্রকার গোতম বলেন,—'পরং বা ত্রুটেঃ' অর্থাৎ 'ত্রুটি হইতে পরই পরমাণু'। কণাদ বলেছেন,— 'তস্য কার্যং লিঙ্গং'।

বৈশেষিকরা তাই বলেন, স্থূলত্ব উৎপত্তির কারণ হচ্ছে পরমাণুর বহুত্ব সংখ্যা। দুটি পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়; দ্ব্যণুকের 'অবয়ব' বা অংশ (part) হচ্ছে দুটি পরমাণু—বহু পরমাণু নয়। আর এই কারণেই দ্ব্যণুকের স্থূলত্ব নেই, কিন্তু ত্র্যণুকের আছে। কারণ, ত্র্যণুকের অবয়ব হচ্ছে তিনটি দ্ব্যণুক। উপাদান অবয়বের বহুত্বের জন্যই ত্র্যণুক বা অন্যান্যদের স্থূলত্বের কারণ।

ছয়টি পরমাণু দিয়ে কি ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়?

আমরা আলোচনা করলাম যে, দুটি পরমাণু দিয়ে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, আর তিনটি দ্ব্যণুক দিয়ে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়। কিন্তু ছয়টি পরমাণু দিয়ে কি ত্র্যণুক উৎপন্ন হয় না? আর যদি নাই হয়, তাহলে তার কারণই বা কি? ন্যায়-বৈশেষিক মতে, পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। কারণ, পরমাণুর সাক্ষাৎ সংযোগে দ্রব্য গঠিত হয়—এই অনুমান করলে পরমাণুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া স্বীকার করতে হয়। আর তাতে পরমাণু-বাদ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। একটি উদাহরণ নিয়ে এই গোলমালে বিষয়টা স্পষ্ট করা যাক। আমরা জানি, 'অসমবায়ি-কারণ'* (*non-inherent Cause*) নষ্ট হলে কার্য* দ্রব্যটি নষ্ট হয়। কাপড় সুতো দিয়ে তৈরী; সুতোর সংযোগ নষ্ট হলে কাপড়ও নষ্ট হলো। আবার, বহু পরমাণু যদি ঘটের 'সমবায়ি-কারণ'* (inherent cause) হয়, এবং ওই পরমাণুগুলির সংযোগ যদি 'অসমবায়ি-কারণ' হয়, তা হলে যতক্ষণ না সব পরমাণুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ততক্ষণ ঘটের নাশত্ব হতে পারে না। যদি এমনটিই হয় অর্থাৎ সব পরমাণুর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, তা হলে ঘটের বা কাপড়ের কোন অবয়ব-ই (part) আর প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি? কুঁজো ভাঙল, কাপড় ছিঁড়ল, কিন্তু তার অংশগুলো রয়ে গেল—অর্থাৎ অবয়ব প্রত্যক্ষ করা গেল। সুতরাং বাস্তবের স্বীকৃতি দিতেই পরমাণু-গুলিকে সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হয়ে কোন দ্রব্য উৎপন্ন করতে অনুমতি দেওয়া যায় না। সুতরা, পরমাণু কখনো কোন দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ হতে পারে না। অতএব, ছ'টি পরমাণু মিলেজুলে ত্র্যণুক সৃষ্টি করে না, তাই দ্ব্যণুক থেকেই আরম্ভ করতে হবে; আবার চতুরণুকের বেলায় তার আগের ত্র্যণুক থেকেই শুরু করতে হবে ইত্যাদি।**

* এই দার্শনিক পরিভাষার সংজ্ঞা পরিশিষ্টের টীকায় দেওয়া হয়েছে।

** বিস্তারিত আলোচনা 'ন্যায়-পরিচয়', পৃ—৭০-৭১ দ্রষ্টব্য।

ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু-সংযোগ ধারণা অদ্ভুত, আপত্তিও বিস্তর এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। তাই বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পরমাণু-সংযোগ সমস্যা ঃ তর্ক-বিতর্ক

প্রাচীনকাল থেকেই পরমাণু-সংযোগ সমস্যাটি নিয়ে ন্যায়-বৈশেষিকদের খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যদিও কণাদ বা প্রশস্তপাদ এই সমস্যাটি সম্পর্কে কিছু বলেননি, তবুও সমস্যাটি খুবই প্রাচীন। কারণ, গোতমের 'ন্যায়সূত্র' গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে, এবং তারপর থেকে প্রায় সব ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরাই অস্বস্তিকর এই সমস্যার সম্ভাব্য উত্তর দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রশ্নটি হলো কেমনভাবে এবং কেন পরমাণুরা সংযুক্ত হয়।

প্রথমে 'কেমনভাবে' সমস্যাটির কথা কিছু বলা যাক। এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত মূল সমস্যা হলো একটি পরমাণু কিভাবে আর একটি পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হয়। আমরা জানি, ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু অবিভাজ্য, নিরংশ অর্থাৎ এর কোন অংশ নেই। কিন্তু যার অংশই নেই তা কি করে সংযুক্ত হবে? কেননা, আমরা জানি যার অংশ আছে সে-ই কেবল সংযুক্ত হতে পারে। সমস্যার উদ্ভব খুব সম্ভব ন্যায়-বৈশেষিকদের 'সংযোগ' *(conjunction)* সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের ধারণার জন্য,—অন্তত সে-কালের দৃষ্টিতে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে 'সংযোগ' একটি 'গুণ' (quality)। গুণ আবার দু-রকম ঃ ব্যাপ্যবৃত্তি (pervading) এবং অব্যাপ্যবৃত্তি (non-pervading)। সংযোগ হচ্ছে অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। এই অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ পরমাণু-সংযোগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করলে বলতে হয় পরমাণুর কোন অংশে এইগুণ আছে, আবার কোন অংশে নেই। আর এই কথাটি স্বীকার করলেই পরমাণু যে-নিরংশ তা আর থাকেনা। সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ন্যায়-বৈশেষিকদের দুটির যে-কোন একটি অবস্থা মেনে নিতে হয় ঃ মূল ভাবনা পরিত্যাগ অর্থাৎ পরমাণুর অংশ আছে মেনে নেওয়া; অথবা একটি অসাম্ভব্যতা স্বীকার করা যে, পরমাণু-সংযোগ অসম্ভব। কিন্তু দুটির যে-কোন একটি গ্রহণ বা স্বীকার করতে গেলেই পরমাণুবাদ তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে।

ন্যায়-বৈশেষিকরা 'অবয়ব' (part) থেকে 'অবয়বী' (whole) উৎপন্ন হওয়ার ধারণা দিয়ে এর কিছু উত্তর দিয়েছেন। তাঁদের মতে অবয়বী অবয়ব

থেকে পৃথক বস্তু, অবয়বীর সত্তা ও অবয়বের সত্তা এক নয়। কিন্তু অবয়ব থেকে ভিন্ন হলেও অবয়বী অবয়বেই আশ্রিত। যেমন,—সোডিয়াম পরমাণু ও ক্লোরিন পরমাণু অবয়ব, আর খাবার নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড অণু অবয়বী,—বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধরা অবয়বীর পৃথক সত্তা স্বীকার করেনা। এখানে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রসিদ্ধি'-কার বসুবন্ধুর যুক্তি তুলে ধরা যাক। প্রথমে তিনি বৈভাষিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাহ্য বিষয়ের সত্তা কেটে টুকরো টুকরো করতে বলেছেন,,—

ন তদেকং ন চানেকং বিষয়ঃ পরমাণুশঃ।
ন চ তে সংহৃতা যস্মাৎ পরমাণুর্ন সিধ্যতি ॥

অর্থাৎ "তাঁহাদিগের স্বীকৃত বাহ্য বিষয়কে অবয়বীরূপ একও বলা যায় না, অনেকও বলা যায় না এবং সংহত বা পুঞ্জীভূত বা মিলিত পরমাণু-সমষ্টিও বলা যায় না। কারণ পরমাণুই সিদ্ধ হয় না।" পরমাণু কেন সিদ্ধ হয় না তা প্রমাণ করতে তিনি বলেছেন,—

ষট্‌কেন যুগপদ্‌ যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা।
ষন্নাং সমানদেশত্বাৎ পিণ্ডাঃ স্যাদনুমাত্রকঃ ॥

কারণ, মধ্যস্থিত কোন একটি পরমাণুতে যখন তাহার ঊর্ধ্ব, অধঃ এবং চতুষ্পার্শ্ব, এই ছয় দিক হইতে ছয়টি পরমাণু আসিয়া যুগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে সংযুক্ত হয়, তখন সেই পরমাণুর "ষড়ংশতা" অর্থাৎ ছয়টি অংশ আছে,—ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সেই পরমাণুর একই প্রদেশে একই সময়ে ছয়টি পরমাণুর সংযোগ হইতে পারেনা, যে প্রদেশে এক পরমাণুর সংযোগ জন্মে, সেই প্রদেশেই তখনই আবার অন্য পরমাণুর সংযোগ সম্ভব হয় না। সুতরাং উক্ত স্থলে সেই মধ্যস্থিত পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি অংশ বা প্রদেশেই ভিন্ন ভিন্ন ছয়টি পরমাণুর সংযোগ জন্মে—ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে উহাকে আর পরমাণু বলা যায় না।* কারণ সংযোগ স্বীকার করলেই পরমাণু সিদ্ধ হয় না।

বৌদ্ধ ও জৈনরা 'সমবায়' ও 'সংযোগ'-এর পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না। এঁদের মতে সংযোগ-কার্য 'অবস্থাবিশেষ' বা 'বিশিষ্ট-পরিণাম' ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। বৌদ্ধ পরমাণুবাদীদের মতে বস্তু পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, আর জৈনদের মতে 'অবয়বী' পরিবর্তিত অবস্থার অংশ ছাড়া কিছু নয়।

* 'ন্যায় পরিচয়,' পৃ-৬৬-৬৭

এসবের উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকরা নানা দার্শনিক আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকরা বলেন, পরমাণুকে লজিকের অপরিহার্যতার খাতিরে নিরংশ অর্থাৎ অংশহীন হিসাবে গ্রহণ করতেই হবে। তা না হলে কোন উপায় নেই। আর ঠিক এই কারণেই তাদের পারস্পরিক সংযোগও স্বীকার করতে হবে পদার্থ উৎপন্ন হওয়ার জন্য। তাঁরা বলেন, নিরংশ দুটি দ্রব্যের সংযোগ হতেই পারেনা, এমন নয়। সাবয়ব দুটি দ্রব্য যেমন পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হতে পারে, নিরবয়ব দুটি দ্রব্যও সেই রকম পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। যখন দুটি দ্রব্যের সংযোগ হয়, তখন ওই দুটি দ্রব্য, দ্রব্য বলেই, তাদের সংযোগ সম্ভব হয়।*

ন্যায়-বৈশেষিকদের যে দ্বিতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো একটি পরমাণু আর একটি পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয় কেন? অর্থাৎ এই সংযোগের পিছনে প্রকৃত কারণটি কি? আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, কে দুটি পরমাণুর সংযোগ ঘটায়,—পরমাণুর কোন অন্তঃধর্ম না বহিঃধর্ম? এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন তিন রকম উত্তর পাওয়া যায় বিভিন্ন পরমাণুবাদীদের কাছ থেকে।

প্রথমে জৈন দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলা যাক এবং ন্যায়-বৈশেষিকদের সাথে তাঁদের পার্থক্যও আলোচনা করা দরকার। জৈনদের মতে কোন কোন পরমাণু 'স্নেহ' ও কোন কোন পরমাণু 'রুক্ষ'। এই দু-ধরনের পরমাণুর সংযোগ হতে পারে, যদিও স্নেহত্ব ও রুক্ষতার মাত্রায় ভিন্নতা থাকতে পারে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্নেহ ও রুক্ষ-পরমাণুর সংযোগ সম্ভব নয়। জৈন মতে, চারভূত-বিভাগ গৌণ, কিন্তু বৈশেষিক মতে, এই বিভাগ মুখ্য—প্রাথমিক (fundamental) এবং গুণগতভাবে তারা পরস্পর ভিন্ন। স্নেহগুণ কেবল জলের, অন্য তিনভূতের নয় বলে সংযোগ সম্ভব নয়। কারণ, সংযোগ কেবল একই বা সদৃশ পরমাণুতে ঘটে। দুটি জলের পরমাণু সংযুক্ত হয়ে জলের দ্ব্যণুক, দুটি আগুনের পরমাণু আগুনের দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে—এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

* ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আত্মার কোন প্রদেশ বা অংশ নেই; আবার মনও পরমাণুর মত নিরবয়ব অতি সূক্ষ্ম দ্রব্য পদার্থ। সুতরাং আত্মা ও মনের সংযোগ প্রাদেশিক নয়। সুতরাং নিরবয়ব পদার্থে, সংযোগ উৎপন্ন হয় না,—একথা বলা যায় না। বিস্তারিত বিবরণ 'ন্যায় পরিচয়,' পৃ—৭৩ দ্রষ্টব্য।

আবার বৌদ্ধ মতানুযায়ী পরমাণুরা প্রকৃতপক্ষে সংযোগ সাধন করে না ; তারা কেবল একত্রিত হয়—পুঞ্জীভূত হয়। এই পুঞ্জীভূত হওয়ার কারণ হলো তাদের 'দ্রব্য শক্তি'। শুভগুপ্ত উদাহরণ হিসাবে মন্ত্রের দ্বারা সাপ বশ করা বা গর্ত থেকে বার করার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য পুঞ্জীভূত হলেই সব সময় দ্রব্য গঠিত হয় না তাদের শক্তির তারতম্যের জন্য—তখন পরমাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করে। এখানে মুক্ত পরমাণুর ধারণা আছে বলে মনে হয়। শুভগুপ্ত আরো বলেন, পরমাণুপুঞ্জে পরমাণুরা তাদের 'প্রত্যাসত্তি'র (close proximity) জন্য পরস্পরকে প্রভাবিত করে 'বিশিষ্ট-পরিণাম' প্রাপ্ত হতে পারে। এ-বিষয়ে তিনি হীরকের উদাহরণ তুলে ধরেছেন ঃ 'পরস্পরানুগ্রহস্য বিশেষাৎ পরিণামিতাঃ। /পরণবশ্চ বজ্রাদের্ন বিচ্ছিন্না ভবন্তি তে ॥'[৭] বলা বাহুল্য, যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র তাঁরা সহজেই অনুমান করতে পারেন হীরকের কাঠিন্য কেন। হীরকের কেলাসের গঠনের চিত্রটি তাঁদের স্মরণ করতে কোন অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

ইতিমধ্যে আমরা ন্যায়-বৈশেষিকদের 'অবয়ব-অবয়বী' সম্বন্ধটির উল্লেখ করেছি। সৃষ্টির প্রারম্ভে দুটি পরমাণুর সংযোগ ঘটে যাতে প্রথম উৎপাদ-দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সংযোগ সাধিত হয় 'কর্ম'-এর দ্বারা। এই বিষয়ে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকদের ঐকমত্য দেখা যায় না।

কণাদ বারবার বলেছেন, সৃজন-গতির কারণ 'অদৃষ্ট'। পরমাণুগুলি নিজেরা গতিহীন যদিও বিশিষ্ট গুণবিশিষ্ট। জীব যাতে কর্মফল ভোগ করতে পারে সেজন্য জীবদের নানা অদৃষ্ট অনুযায়ী ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির ইচ্ছা করেন। আর সেই ইচ্ছার ফলেই পরমাণুগুলির মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয়। এবং দুটি পরমাণু সংযুক্ত হয়ে প্রথমে একটি দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে। নৈয়ায়িকরা এই ধারণা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের কাজে লাগিয়েছেন। উদ্দ্যোতকার থেকে এই প্রবণতা দেখা দিলেও কণাদের মধ্যে ঠিক এরকম ধারণা দেখা যায় না। পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিকে অদৃষ্টকে 'ধর্মাধর্ম'-এর সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে বটে, কিন্তু কণাদের সূত্রের তাৎপর্য থেকে এটা মনে হয় যে, 'অদৃষ্ট' অর্থে যা দেখা যায় না তেমন কোন শক্তি যা অতিপরিচিত বা সাধারণ কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।[৮] কণাদের এই অদৃষ্ট-ধারণা বিখ্যাত ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন স্বীকার করেননি : আর বাচস্পতি মিশ্র ও বিশ্বনাথ জৈন মত বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এ-যুগেব বৃদ্ধসম্মতি গ্রহণ করলে, ফণিভূষণ বলেন যে, এই অদৃষ্ট-ধারণা নিশ্চয় কোন প্রাচীন

মত যা কিনা প্রাচীন গ্রন্থের বিলুপ্তিতে নষ্ট হয়ে গেছে।[৯] অবশ্য শংকর, রামানুজের পরামাণুবাদ বিরোধিতা, জয়ন্ত ভট্টের আলোচনা থেকেও মনে হয় ন্যায়-বৈশেষিক পরবর্তীকালে 'অদৃষ্ট' বলতে যা বুঝতেন তা ঠিক কণাদের বা প্রাচীনদের বুদ্ধিস্থ ছিল না।* এই সব দিকের অল্পস্বল্প আলোচনা করে ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি খুবই সমীচীন ও গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেন, "যাই হোক, ভৌত কর্মাদি সম্বন্ধে অদৃষ্ট হলো দ্রব্যাশ্রিত কোন অজানা শক্তি; পরামাণুতে প্রাথমিক গতি সঞ্চারের জন্য এই শক্তিই দায়ী।"[১০]

এখানে গ্রীক পরমাণুবাদীদের সহিত ভারতীয়দের এই পরমাণু-সংযোগ ধারণার সামান্য তুলনা করা যেতে পারে, যদিও অন্যত্র আমরা উভয় ধারণা মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করেছি। গ্রীক পরমাণুবাদে পরমাণুগুলির নিজস্ব গতি স্বীকৃত এবং তারা নিজেরাই পরস্পরের সহিত যুক্ত হয়ে জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেননি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা (কণাদ ব্যতিরেকে) পরমাণুগুলিকে জগতের মূল উপাদান বললেও ঈশ্বরকেই 'নিমিত্ত কারণ' *(efficient cause)* বলেছেন। পরমাণু গতিহীন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই তাদের মধ্যে গতি সঞ্চারিত হয় এবং তারা পরস্পর মিলিত হয়। প্রশস্তপাদ তো মহেশ্বর স্তবে গদ্‌গদ।

গ্রীক পরমাণুবাদীরা মনে করেন, পরমাণুগুলি পরিমাণের দিক থেকে বিভিন্ন রকমের—কোনটি বড়, কোনটি ছোট ইত্যাদি। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন গুণগত প্রভেদ নেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ গুণ পরমাণুর নেই। ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরিমাণের দিক থেকে পরমাণুগুলির কোন পার্থক্য নেই। সব পরমাণুই অণু পরিমাণ। কিন্তু তাদের গুণগত পার্থক্য আছে।

গ্রীক পরমাণুবাদীরা পরমাণু থেকে পৃথক আত্মা বলে কোন বস্তুর স্বীকার করেন নি। ডিমোক্রিটাসের মতে খুব সূক্ষ্ম পরমাণুই আত্মা। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকগণ আত্মাকে পরমাণু থেকে ভিন্ন একটি অজড় দ্রব্য বলে স্বীকার করেন, যদিও প্রথম দিকে ব্যাখ্যায় ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

* Subbarayappa, B.V.—IJHS, Vol—2, No. 1, 1967, P. 32, দ্রষ্টব্য

ন্যায়-বৈশেষিকের আন্তঃসীমাবদ্ধতা

ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদের আলোচনায় সামান্য হলেও এর সীমাবদ্ধতার কথা না বললে চলে না। এই সীমাবদ্ধতা বা অবক্ষয়ের কারণ বিশ্লেষণ দু-দিক থেকেই করা দরকার ঃ আন্তঃ ও বহিঃ। আমরা অষ্টম অধ্যায়ে বহিঃ সীমাবদ্ধতার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি বিজ্ঞান ও ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতি উপশিরোনামে। তা ছাড়া আর্থ-সামাজিক দিকের আলোচনাও করেছি। তাই এখানে কেবল এই মতাদর্শের, বিশেষত পরমাণুবাদের আন্তঃসীমাবদ্ধতা নিয়ে স্বল্প কথায় কিছু বলা যাক।

ন্যায়-বৈশেষিকের তথা পরমাণুবাদের সীমাবদ্ধতা প্রধানত তিনটি ঃ 'ধর্ম', 'অদৃষ্ট' ও সমসাময়িক গাণিতিকরণ থেকে এর দুর্লঙ্ঘ দূরত্ব।* আমরা ধর্ম নিয়ে মোটামুটি আলোচনা অষ্টম অধ্যায়ে করেছি। তবুও এখানে সামান্য উল্লেখ স্বরূপ বলা যায় যে, ধর্ম কেবল ভারতীয় মন, চিত্ত শুদ্ধির ব্যাপারই ছিল না, তার সামাজিক জীবনে পর্যন্ত এর গভীর অনুপ্রবেশ ছিল। শ্রুতি-স্মৃতির অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনে ছিল ভারতীয় জীবনধারা বাঁধা। ফলে, স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক ভাবনা ক্রমশ লোপ পেতে থাকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশের ফলে। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বড় কথা নয়, শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানতে সবাই বাধ্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম 'পাপপুণ্যের কুফল—সুফল—কর্ম-গতি'-র কথা বলতে গিয়ে নাস্তিক তথা বেদবিরোধীদের শাস্তির বর্ণনা করে বলেছেন,—"আত্মজ্ঞানশূন্য নাস্তিকদিগকে হস্তবন্ধনী রজ্জু দ্বারা বন্ধ ও নগর হইতে নির্বাসিত হইয়া ব্যাল (বিষধর ক্রুদ্ধ সাপ), কুঞ্জর, সর্প ও তস্কর-পরিপূর্ণ অরণ্য মধ্যে অবস্থান করিতে হয়।"** আবার, বস্তুবাদী চার্বাকদের তো নরমেধ যজ্ঞে বলি দেওয়া হতো, এমন তথ্যও পাওয়া যায়।*** এ হেন পরিস্থিতিতে ভারতীয় ধর্মের জীবন ও কর্মে অনুপ্রবেশ। বৈশেষিকরা যে এর ব্যতিক্রম হবেন, এটা দুরাশা মাত্র।

বৈশেষিক সূত্রে প্রথম সৃজন শক্তি হিসাবে অদৃষ্টের উল্লেখ আছে। এই

অদৃষ্ট প্রথমত ছিল এমন শক্তি যা অদৃশ্য অর্থাৎ দেখা যায় না, এবং তৎকালীন জ্ঞানে যার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় নি। কিন্তু পরে অদৃষ্ট হয়ে উঠল ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি যার ফলে মানুষের ইহজীবন ও পরজীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম, অদৃষ্ট, কর্মফল, জন্মান্তর, ঈশ্বর ইত্যাদি বৈশেষিক ও ন্যায়ে আধিপত্য করতে থাকায় এর বিপ্লবাত্মক পরমাণুবাদ তার স্বরূপ ও চরিত্র হারিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের অস্ত্রে পরিণত হলো। প্রশস্তপাদ তো মহেশ্বরের ঈক্ষণকেই প্রথম সৃজন শক্তি অদৃষ্ট বলে প্রচার করতে থাকলেন।

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান-গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্র যে ধর্ম ও দর্শনের চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও শক্তিশালী ছিল প্রাচীন যুগে তাতে সন্দেহ করার নেই। কিন্তু দর্শন এ-দেশে জ্ঞানচর্চার বিষয়ের চেয়ে মোক্ষলাভের বিষয়। দর্শনের হ্লাদিনীশক্তি ধর্ম হওয়ায় তা কখনো সমসাময়িক গাণিতিক বিকাশের সহিত একাত্ম হতে পারল না; দর্শন পরিমাণাত্মক না হয়ে কেবল গুণাত্মক হয়েই রইল; শক্তিশালী গাণিতিক অস্ত্র ধারণ না করে কেবল ঊর্ধমূলীয় কল্পনায় বিশ্ববীক্ষা করতে তৎপর হলো। কলেরায় মা শীতলার 'চান জল' খেলে যা হয়, তা-ই পরমাণুবাদের অবস্থা হলো। বস্তুত ভারতীয় পরমাণুবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফসিল, যদি ও তার ঐতিহাসিকমূল্য ছাড়া আর কিছু নেই।

২. জৈন পরমাণুবাদ

জৈন পরমাণুবাদ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অনেকটা যেন বিকশিত আকারে দেখা যায়। এ-সম্পর্কে কুন্দকুন্দাচার্যের 'পঞ্চাস্তিকায়সার' গ্রন্থ ও 'ভগবতী সূত্র'-এর নাম করা যেতে পারে। কুন্দকুন্দাচার্যের সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। তবে তাঁদের সবার কথার সার ধরলে বলা যায় তিনি প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় বর্তমান ছিলেন। 'পঞ্চাস্তিকায়সার'-এ পরমাণু সম্পর্কীয় ধারণা বিস্তারিত না হলেও পরমাণুর প্রকৃতি ও সংজ্ঞা খুবই স্পষ্ট। 'ভগবতী সূত্রে' পরমাণু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু হলে কি হবে, তা অতিকথন ও শিথিল বিন্যাসদুষ্ট। যেমন, পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রশ্নোত্তর এরকম:

প্রশ্ন: 113. ভন্তে! তরবারি বা ক্ষুরের তীক্ষ্ন ধারে কি বস্তুর পরমাণু বিদ্যমান থাকা সম্ভব?

উত্তর : 113. হ্যাঁ, সম্ভব।

প্রশ্ন : 114. ভন্তে! ওইখানে বিদ্যমান থাকার সময় তারা কি ছিন্ন বা ছেদিত হয়?

উত্তর : 114. গৌতম! তারা তা হয় না। বস্তুর পরমাণুর ওপর অস্ত্রের কোন ক্রিয়া নেই।[১১]...

এই সামান্য উল্লেখ থেকে ভগবতীসূত্রের অতিকথন বোঝা যায় না, কিন্তু আমরা এর বেশী উদাহরণ দিলাম না কেবল বইটির কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায়। যাই হোক, জৈন মতে পরমাণু সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা যাক। ভগবতীসূত্রের আলোচনা থেকে জানা যায়, পরমাণু অভেদ্য, অবিভাজ্য, অদাহ্য ও অধরা অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ; পরমাণু অনর্ধ, অমধ্য ও অপ্রদেশ ('having no points or only one point')। পরমাণু একক দ্রব্য হতে পারে অথবা দ্রব্যের অংশ হতেও পারে। পরমাণু এমনই সূক্ষ্ম যে, বায়ু একে স্পর্শ করে, কিন্তু পরমাণু বায়ুকে স্পর্শ করে না। পরমাণু অসংখ্য ও একটি পরমাণু-পুঞ্জ বা-সমবায় (aggregate) অসংখ্য। দ্রব্যের দিক থেকে বিচার করলে পরমাণু নিত্য, অবিনাশী; কিন্তু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের দিক থেকে বিচার করলে পরমাণু অনিত্য, বিনাশশীল।

একটি দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পরমাণুকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: 'দ্রব্য-পরমাণু' (an atom of substance), 'ক্ষেত্র-পরমাণু' (an atom of point of space), 'কাল-পরমাণু' (an atom of time), এবং 'ভাব-পরমাণু' (an atom of state, e.g., colour etc.)।

জৈন মতে, পদার্থ হলো নিত্য দ্রব্য, কিন্তু এর কণিকার হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। পদার্থ যে-কোন আকার পরিগ্রহ করতে পারে, এবং যে-কোন গুণ উৎপন্ন করতে পারে। ভৌত দ্রব্যসমূহ একটি দ্রব্যে পরিণত হতে পারে, এবং একটি দ্রব্য বহু অংশে বা অবয়বে বিভক্ত হতে পারে।

জৈন পরিভাষায় 'পুদ্‌গল্' শব্দে সাধারণভাবে পদার্থ (matter) বোঝায়। কিন্তু কখনো কখনো 'পুদ্‌গল্' অর্থে পরমাণুও বোঝায়। দুটি ধাতুর সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত: পুর্+গল্>পুদ্‌গল। 'পুর্' মানে পূরণ করা বা পূর্ণ করা (to fill up), এবং 'গল্' মানে দ্রবীভূত হওয়া (to dissolve)। 'পুদ্‌গল্' শব্দের অর্থ দাঁড়াল যা পূর্ণ করতে পারে বা দ্রবীভূত হতে পারে অর্থাৎ যা ভাঙা-গড়া পরিবর্তনের অধীন। কিন্তু এই

সংজ্ঞা কিভাবে অখণ্ডনীয় ও অবিভাজ্য পরমাণুর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে? এই সম্পর্কে জৈন পরমাণুবাদীদের মত এই যে, গুণগতভাবে পরমাণুরও পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ পরমাণুতে বিদ্যমানগুণের সামান্যতম হলেও কিছু পরিমাণে বা মাত্রায় হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়, বিশেষত 'বৃহৎ-অণু' সৃষ্টিতে। উমাস্বাতীর 'তত্ত্বার্থসূত্র'-এ বলা হয়েছে—'রূপিণঃ পুদ্গলাঃ' অর্থাৎ যাদের রূপ আছে তারাই পুদ্গল। 'রূপ' অর্থে বর্ণ বা রঙ বোঝালেও এখানে আকার বলে ধরা যেতে পারে। পুদ্গল অর্থে আবার 'স্কন্ধ' বোঝায় যা সূক্ষ্ম বা স্থূল দু-রকম হতে পারে। 'পঞ্চাস্তিকায়সার'-এ বলা হয়েছে—'সর্বেষাং স্কন্ধানাং যোহন্ত্যস্তং বিজানীহি পরমাণুম্'—অর্থাৎ পরমাণু বলতে স্কন্ধের অন্তিম অংশ।

স্কন্ধ ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বর্তমান থাকতে পারে এবং ত্রিলোক তা দিয়েই গঠিত। পৃথিবী, জল, ছায়া, দৃষ্টি ব্যতীত অন্য চারটি ইন্দ্রিয়, কর্ম-পদার্থ, এবং সেই সমুদায় বা পুঞ্জ (aggregate) যা কর্ম-পদার্থ হতে পারে না। ছয় রকম স্কন্ধের বর্ণনা ও শ্রেণীবিভাগ আবার এরকম ঃ

(১) **বাদর বাদর** ঃ কঠিন পদার্থ। যেমন, কাঠ, পাথর যা একবার কাটলে বা ভাঙলে আর জোড়া দেওয়া যায় না।

(২) **বাদর** ঃ তরল পদার্থ। এর অংশে আলোড়নের ফলেও তা আবার যুক্ত হয়ে পূর্ব-রূপ ফিরে পায়।

(৩) **সূক্ষ্ম-বাদর** ঃ আপাত কঠিন। একে ভাঙা যায় না, অংশে বিভক্ত করা যায় না বা ধরাও যায় না। ছায়া বা অন্ধকার এর উদাহরণ।

(৪) **বাদর-সূক্ষ্ম** ঃ সূক্ষ্ম কণিকা, কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়।

(৫) **সূক্ষ্ম** ঃ ক্ষুদ্র কণিকা, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ। যেমন, কর্ম-পদার্থ।

(৬) **সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম** ঃ অতিক্ষুদ্র কণিকা। যেমন, স্কন্ধ যা দুটিমাত্র পরমাণু দ্বারা গঠিত।

দ্রব্যের দিক থেকে পরমাণুগুলি নিত্য—অবিনাশী হলেও প্রত্যেক পরমাণুর এক প্রকার করে রূপ-রস-গন্ধ আর দু-রকমের স্বাদ আছে। বিভিন্ন পরমাণুতে এই গুণ কিন্তু স্থায়ী ও নির্দিষ্ট নয়, তাদের পরিবর্তন হতে পারে এবং তাদের মধ্যে উৎপন্ন হতেও পারে। পরমাণুগুলি বিন্যাস বা পারস্পরিক আপেক্ষিক অবস্থান দ্বারা নানা পুঞ্জাকার পরিগ্রহ করতে পারে। পরমাণু নিজস্ব গতি সঞ্চারিত বা উৎপন্ন করতে পারে, এবং এরূপ

গতি সঞ্চারিত করতে পারে যাতে মুহূর্তে মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে।[১২]

'কর্ম' সম্পর্কে জৈনদের অভিমত এবং তার সঙ্গে পরমাণুবাদের সম্বন্ধের উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়। জৈন মতে, কর্ম হচ্ছে 'পুদগলিকা'—এর প্রকৃতি বা স্বভাব বস্তুগত। পরিদৃশ্যমান জগতের সহিত সংযোগ দ্বারা আত্মার অতিসূক্ষ্ম ধরনের কণাসমূহের ভেদন ঘটে। তখন তারাই কর্মে পরিণত হয়, এবং 'কর্ম-শরীর'—বিশেষ শরীর গঠন করে, এবং আত্মার মুক্তি অবধি অবস্থান করে। সুতরাং যে পরমাণুগুলি দ্বারা কর্ম-দ্রব্য গঠিত, সেই পরমাণুগুলির ওপর এমন অদ্ভুত ও বিশেষ কার্যক্ষমতা ন্যস্ত হয় যা কিনা ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য উৎপন্ন করে। জৈন-বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, 'কর্ম' হলো পরমাণুর ধর্ম, নিজেদের মধ্যে গতি উৎপন্ন করে শরীর উৎপন্ন করে।[১৩]

ন্যায়-বৈশেষিকদের সহিত জৈনদের পরমাণু-ধারণায় সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো জৈনরা পরমাণুর পার্থক্য স্বীকার করেনা। তাঁদের মতে, মাটির পরমাণু, জলের পরমাণু ইত্যাদি সব এক। আমরা বলেছি, প্রত্যেক পরমাণুর একপ্রকার করে রূপ-রস-গন্ধ ও দু-ধরনের স্পর্শ-গুণ আছে যা কিনা অস্থায়ী। প্রকৃতপক্ষে, এই অস্থায়ী গুণের জন্যই নতুন বস্তুর উদ্ভব হয়। এইজন্য পরমাণুদের নৈকট্যই যথেষ্ট নয়, পরস্পর বিপরীত গুণসম্পন্ন পরমাণুর সংযোগ হওয়া চাই। সাধারণত, দুটি স্বধর্মী পরমাণুর সংযোগ ঘটতে দেখা যায় না ; সংযোগ ঘটতে হলে একটি পরমাণু ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক হওয়া চাই। বিপরীত ধর্মী দুটি পরমাণু সংযুক্ত হলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণের মত কিছুটা ঘটে। এইভাবে "All changes in the qualities of Compounds are explained by the nature of their mutual attraction."[১৪]

৩. বৌদ্ধ পরমাণুবাদ

বৌদ্ধদের মধ্যে সব গোষ্ঠীই পরমাণুবাদে আস্থা স্থাপন করেননি ; মাধ্যমিক ও যোগাচারীরা পরিদৃশ্যমান জগতকে সত্য বলে স্বীকারই করেননি। এমন কি তাঁরা টেবিল, চেয়ার ইত্যাদিকে 'দ্রব্য' (substance) বলেও মানতে চাননি। এ-বিষয়ে তাঁদের মত সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, দ্রব্যের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যাতে 'গুণ' (quality) আশ্রিত

থাকে। বস্তুত, আমাদের 'গুণ-বুদ্ধি', আর 'গুণী-বুদ্ধি' এক নয়। সুতরাং 'বাদামী টেবিল' বললে 'টেবিল' ও 'বাদামী রঙ' যথাক্রমে দ্রব্য ও গুণ-রূপে আমাদের প্রত্যক্ষ হয় এবং তারা পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু বৌদ্ধরা—মাধ্যমিক, যোগাচারীরা এটি মানতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, চোখ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা জানি, তা হলো রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদি। এগুলিকে গুণ বললেও দ্রব্যকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানতেই পারিনা। চোখ দিয়ে রঙ দেখছি, বিশেষ আকৃতিকে দেখছি, আর ত্বক দিয়ে স্পর্শও পাচ্ছি, কিন্তু এই গুণগুলি ছাড়া কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই দ্রব্যকে, যেমন, টেবিলকে পাচ্ছিনা। টেবিল অর্থাৎ দ্রব্যটিকে যখন কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই পাচ্ছিনা, তখন আর টেবিল বা দ্রব্যকে গুণের আশ্রয় বলে মানব কেন? গুণগুলি শূন্যে ঝুলতে পারেনা বা ভাসতে পারেনা বলেই কি দ্রব্য স্বীকার করতে হবে? রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদিকে গুণ বলি বলেই এরা গুণ, আর দ্রব্য বলে একটা-কিছু স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়, অন্য রকম। বৌদ্ধরা বলেন, রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় বা 'ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলি' *(Sense data)* কোন দ্রব্যের ওপর নির্ভর না করেই থাকে, আর বস্তু হচ্ছে ওই ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলির সমষ্টি।[১৫] তাঁরা লজিকের মারপ্যাঁচ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি বস্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সংঘাত মাত্র।

কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে অন্তত দুটি গোষ্ঠী—সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকরা পরমাণুবাদে কিছু অবদান রেখে গেছেন, যদিও ন্যায়-বৈশেষিকদের সংগে তাঁদের পার্থক্য কম নয়। তা হলেও উভয় সম্প্রদায়ই জাগতিক ভৌত সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন, সবই শূন্য বলে উড়িয়ে দেননি। কিন্তু সৌত্রান্তিকরা এই বাস্তবতা অনুমানসাপেক্ষ বলে মনে করতেন, আর বৈভাষিকরা তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বস্তু বলে ধারণা করতেন। সৌত্রান্তিক মতাদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন এইজন্য যে, তাঁদের লিখিত কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। অবশ্য কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে আহরণ করা যায়। যেমন,—বসুবন্ধুর 'অভিধর্ম কোষ', মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' অথবা হরিভদ্র সূরির 'ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ে'-এর ভাষ্যকার গুণরত্ন প্রমুখের লেখা থেকে তাঁদের কিছু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে জানা যায়। কিন্তু বৈভাষিকদের সম্পর্কে একথা বলা যায় না; তাঁদের প্রামাণিক গ্রন্থ 'অভিধর্মকোষ' তো আছেই; তা ছাড়া এর ভাষ্যও

আছে, আর সপ্তম শতাব্দীর শুভগুপ্তের 'বাহ্যার্থসিদ্ধিকারিকা' একেবারে মৌলিক গ্রন্থ।

'অভিধর্মকোষ'-এর সাক্ষ্য অনুসারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে মত-পার্থক্য থাকলেও পরমাণুবাদ নিয়ে তেমন কোন পার্থক্য ছিলনা বলে মনে হয়। সেইজন্যই সম্ভবত অদ্বৈত বেদান্তের প্রবলতম প্রবক্তা শঙ্করাচার্য তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র'-এ এই দুই সম্প্রদায়ের কথা বলতে গিয়ে এককথায় তাঁদের 'সর্বাস্তিবাদিন' বলেছেন, এবং তাঁদের পরমাণুবাদ সম্পর্কে ধারণার সার কথাটি বলেছেন। ইয়াকোবি অনুসরণে তাঁদের মত সম্পর্কে বলা যায়ঃ মাটি, জল, আগুন ও বাতাস এই চার রকমের পদার্থ তাঁরা স্বীকার করেন; তাঁদের ধর্ম বা গুণও উৎপাদশীল পদার্থ, এমন কি ইন্দ্রিয়াঙ্গেও তাঁদের অস্বীকৃতি নেই। তাঁদের মতে, এই চারটি পদার্থ পারমাণবিক। মাটি-পরমাণুর গুণ কৃষ্টতা, জলের স্নেহতা, আগুনের তাপ ও বাতাসের গতি। তাঁদের মতে, এ-সবের সমবায়ে পার্থিব বস্তু বা পদার্থ গঠিত।[১৬]

শঙ্কর সার কথা বললেও 'অভিধর্মকোষ' এবং তার 'ভাষ্য' থেকে বেশ কিছু সংযোজন করা যায়[১৭]ঃ এই বৌদ্ধদের মতে, প্রথমত পদার্থ, বৌদ্ধদের ভাষায় 'ধর্ম', প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্তঃ 'সংস্কৃত' ও 'অসংস্কৃত'। সংস্কৃত শ্রেণীর বস্তু বা পদার্থ কারণ-জন্য, আর অসংস্কৃত শ্রেণীর পদার্থ কারণ-অজন্য।' 'সংস্কৃত-শ্রেণী' আবার পাঁচ প্রকার। এদের 'স্কন্ধ' বলা হয়ঃ 'বেদনা-স্কন্ধ', 'সংজ্ঞা-স্কন্ধ', 'সংস্কার-স্কন্ধ', 'বিজ্ঞান-স্কন্ধ' ও 'রূপ-স্কন্ধ'। এই পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে কেবল রূপ-স্কন্ধের সঙ্গেই আমাদের আলোচনার সম্বন্ধ। কারণ, এর ভেতরেই আমরা পদার্থ ও নানা রূপ-বৈচিত্র্যের ভাবনা তথা ধারণা দেখতে পাই। তা ছাড়া দেখতে পাই পঞ্চেন্দ্রিয়াঙ্গ, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং চারটি ভৌতবস্তু বা পদার্থ—মাটি জল, আগুন ও বাতাস। পঞ্চেন্দ্রিয়াঙ্গ কেবল বস্তুগতই ('ভূতবিকার বিশেষ') নয়, তারা পারমাণবিকও। 'অভিধর্মকোষ'-এ এদের অদ্ভুত গঠনের কথা বলা হয়েছে। যেমন,—বলা হয়েছে নাকের ছিদ্রের মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়-পরমাণুগুলি লোহার শলাকার আকারে বিন্যস্ত রয়েছে; শ্রবণেন্দ্রিয়-পরমাণুগুলি কানের মধ্যে ভূর্জপত্রের আকারে সজ্জিত বা বিন্যস্ত রয়েছে ইত্যাদি।

আবার, রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদির প্রকৃতি পরমাণু-পুঞ্জ। কিন্তু এদের সবার পুঞ্জে পরমাণু-সংখ্যা সমান নয়,—অসদৃশ। এখানে ন্যায়-বৈশেষিক-

দের সহিত বৈভাষিকদের মত-পার্থক্য দেখা যায়। বৈভাষিকরা রূপ-রস ইত্যাদিকে আলাদা পদার্থ বলে স্বীকার করেননা। বলেন, প্রত্যেকেই বিশেষ ধরনের পরমাণু-পুঞ্জ। সুতরাং কিছুটা যেন দ্রব্য—অবয়বীর মত। কোন একটিমাত্র ইন্দ্রিয়-পরমাণু বা রূপ অথবা রস ইত্যাদির পরমাণু কোন 'বিজ্ঞপ্তি' (awarness) উৎপন্ন করতে পারেনা। কারণ, সব রকম বিজ্ঞপ্তিই পরমাণু-পুঞ্জের সহিত অন্বিত। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা ইন্দ্রিয়, গন্ধেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় যখন কোন বস্তুকে প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করে, তখন ইন্দ্রিয়ের পরমাণু-সংখ্যা ও বস্তুর পরমাণু-সংখ্যা সমান হয়। অবশ্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

মাটি, জল, বা আগুন ও বাতাস—এই চারটি পদার্থও পারমাণবিক। এদের দু-রকম করে ধর্ম: 'স্বভাব' (natural) ও 'উপাদায়' (derived)। স্বভাব-ধর্মের অন্তর্গত কাঠিন্য, স্নেহতা, উষ্ণতা ও গতিময়তা। এইসব ধর্মের জন্য তাদের কার্যাবলীতে বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। যেমন, মাটি কাঠিন্য বা খরতার জন্য কিছু ধরে রাখতে পারে; কলসী জল ধরে রাখে। ময়দা জলের স্নেহতার জন্য পিন্ডে পরিণত হয়; উষ্ণতার জন্য আগুন রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়; শ্যামবর্ণ ঘট আগুনে পোড়ালে লাল হয়। বৌদ্ধ মতে, রূপ, রস ইত্যাদিও ভূতবস্তুর উপাদায় ধর্ম। কারণ, বিশেষ 'বর্ণ' ও 'সংস্থান' (structure) তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা যায় না, এবং তারা পরিবর্তনশীল। সুতরাং এই চারটি ভূতবস্তু বিভিন্ন লক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচিত। এদের স্বভাব ও উপাদায় ধর্ম আছে বলে এদের 'ধাতু' বলা হয়। এদের 'ভূত' বলা হয়, কারণ ধৃতি কর্মের উদ্ভব তাদের কারণেই হয় বলে। এদের আবার 'মহাভূত' বলা হয়, কারণ, তারা অনুপাতে বিশাল হতে পারে।

চার ভূতবস্তুর পৃথক পৃথক ধর্ম থাকলেও কিন্তু তা সরল বা অমিশ্র অবস্থায় নেই। একটি পদার্থ বিশেষ ভূতবস্তুর ধর্ম প্রধানভাবে প্রকাশ করলে তার নাম সেই অনুসারে হতে পারে, কিন্তু তা বলে তা অমিশ্র নয়, অন্যান্য ভূতবস্তু বর্তমান বলে অনুমান করা যেতে পারে। যেমন,—একখন্ড পাথর মাটি থেকে উৎপন্ন। এতে যে মাটি-পরমাণু থাকবে তা তো জলের মত সহজ। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, মাটি-পরমাণুগুলো একেবারে গঁদের মত কিছু দিয়ে সেঁটে আছে। তা হলে, পাথর খন্ডটাকে জল-পরমাণুর মিশ্রণ বলতে হবে; কারণ, জলের স্নেহতা ধর্মের জন্য সংসক্তি আছে।

তাছাড়া কাঠিন্যের জন্য তাপ-এর কথা ভাবতে হবে। এহো বাহ্য। ওই পাথরের মধ্যে বায়ু-পরমাণুও আছে। তা না হলে তা বৃদ্ধি পায় কি করে? ভাষ্যকার যশোমিত্রের বুদ্ধির ও যুক্তির তারিফ না করে পারা যায় না।

রূপ-স্কন্ধের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বসুবন্ধু বৌদ্ধ পরমাণুবাদীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অবশ্য আমাদের আলোচনায় এ-সম্পর্কে কিছুটা প্রকাশ পেলেও আরো স্পষ্ট করা যাক। তিনি বলেন, পরমাণুগুলি সর্বদাই পুঞ্জীভূত অবস্থায় থাকে, কখনো মুক্ত বা একক অবস্থায় থাকেনা। কেউ কেউ বলেন, রূপ-স্কন্ধ বাধা প্রদান করতে পারে বা রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু বসুবন্ধু এই অভিযোগ খন্ডন করে বলেন, এই দুটি সংজ্ঞার কোনটাই পরমাণুর সংজ্ঞা হতে পারেনা। কারণ, পরমাণু নিরংশ—অংশহীন। তাঁর মতে, বাস্তবে একটি পরমাণু দেখা যায় না, কেবল পুঞ্জের অবয়ব ব্যতিরেকে। আর এটাই কিনা পরমাণুর প্রকৃতি যে তারা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। পুঞ্জের রূপান্তর হতে পারে বা তা বাধা দিতেও পারে, এবং পুঞ্জের সদস্য হিসাবে একক পরমাণু রূপ-স্কন্ধের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের অংশ-গ্রহণকারী হতে পারে;—এরূপ বলা যেতে পারে।

পদার্থের একক একটি পরমাণু, কিন্তু তার একক অবস্থিতি নেই। তা হলে পুঞ্জে-এর (aggregate) ক্ষুদ্রতমটি কি? এ-বিষয়ে ইয়াকোবি হিউয়েনসাং ও পৌরাণিক পরিমাণের উল্লেখ করে বলেছেন, সৌত্রান্তিকরা সাতটি পরমাণুর পুঞ্জকেই ক্ষুদ্রতম যৌগ (compound) অর্থাৎ 'অণু' বলে মনে করতেন। তাঁদের অভিমত এই যে, বর্তুলাকার বা পরিমন্ডলাকার পরমাণুরা পরস্পরকে স্পর্শ করেনা, তাদের মধ্যে 'অবকাশ' (interval) আছে। কেউ কেউ অবশ্য ভিন্ন ধারণাও পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই স্বীকার করতেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য, যদিও আবার কেউ কেউ মনে করতেন যে, পরমাণুর অংশ আছে, যেমন, আটটি দিকদেশ। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক উভয় সম্প্রদায়ই ঘোষণা করেছিলেন যে, পরমাণু ফাঁপা (hollow) নয়, এবং পরস্পরকে ভেদ করে না :[১৮]

এবার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে[১৯] পরমাণু সম্পর্কে যে-ধারণা দিয়েছেন, সেটি বলা যাক। কারণ, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রখ্যাত বিদ্বানকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তিনি বলেন, পরমাণু অভেদ্য বা অগ্রহণীয় বা অনুৎক্ষিপ্ত; পরমাণু অবিভাজ্য, অবিশ্লেষ্য, অদৃশ্য, অশ্রাব্য

অনাস্বাদিত ও অস্পৃশ্য, কিন্তু স্থায়ী—ক্ষণিক ঝলক বা প্রবাহের মত। এইরকম সাতটি পরমাণু সমবায়ে অণু গঠিত হয়, এবং এই সমবেত আকারেই তাদের প্রত্যক্ষ করা যায়। এই 'সমবায়' বা সংযোগ ঘটে পুঞ্জের আকারে যার কেন্দ্রে থাকে একটি পরমাণু এবং অন্যগুলি তার চারদিকে।

'অভিধর্মকোষ'-এ আটটির কম পরমাণু দিয়ে পুঞ্জ গঠনের কথা জানা যায় না, আর তাদের আপেক্ষিক অবস্থান সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। এমন উল্লেখ রয়েছে যেখানে নয়টি থেকে এগারোটি পর্যন্ত পরমাণু দিয়ে ক্ষুদ্র পুঞ্জ গঠনের কথাও আছে। এই ধরনের পুঞ্জকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 'অশব্দ' ও 'সশব্দ'। প্রত্যেক ভাগে আবার তিনটি করে বৈচিত্র্য দেখা যায়ঃ

১. (ক) **অশব্দ-অনিন্দ্রিয়ঃ** ভূতবস্তুর পরমাণু=৪ } =৮
উপাদায় পরমাণু=৪ }

(খ) **অশব্দ-সেনিন্দ্রিয়ঃ** (ক) এর ৮+স্পর্শেন্দ্রিয়-১=৯

(গ) **অশব্দ-সেনিন্দ্রিয়ঃ** (খ)-এর ৯+দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ,রসনা ইন্দ্রিয়ের যে-কোন একটি পরমাণু=১০

২. (ক) **সশব্দ-অনিন্দ্রিয়ঃ** ১. (ক)-এর ৮+শব্দ পরমাণু ১টি=৯

(খ) **সশব্দ-সেনিন্দ্রিয়ঃ** ১. (খ)-এর ৯+শব্দ পরমাণু ১টি=১০

(গ) **সশব্দ-সেনিন্দ্রিয়ঃ** ১. (গ)-এর ১০+শব্দ পরমাণু ১টি=১১

সপ্তম শতাব্দীর 'বাহ্যার্থসিদ্ধিঃ' রচয়িতা শুভগুপ্ত 'রূপান্তর' সম্পর্কে যে কথাটি বলেছেন, তার উল্লেখ না করে পারা যায় না। তিনি বলেন, পরমাণুগুলি পুঞ্জীভূত হলে গোলকের আকার ধারণ করে, আর তারা পরস্পরের সান্নিধ্যজনিত বিশেষ ক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়। সে-কারণে হীরার পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।* মন্ত্রের প্রভাবে যেমন পিশাচ,

* কেলাস গঠনে তিন ধরনের ল্যাটিস *(lattice)* খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়; দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস, তলকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিস ও ঘনসন্নিবিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি ল্যাটিস। দেহকেন্দ্রিক ঘনকাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে ল্যাটিস গঠনকারী প্রত্যেকটি পরামাণুর নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা 'আট', আর অপর দুটি ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা 'বারো'। কিন্তু হীরকের কেলাসে ল্যাটিস গঠনের বৈশিষ্ট্য এই যে, হীরকের প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর নিকটতম প্রতিবেশীর সংখ্যা 'চার'। একই পরমাণু—কার্বন দিয়ে গ্রাফাইট কেলাসের ল্যাটিস গঠিত হলেও কাঠিন্যের দিক থেকেহীরক ও গ্রাফাইটে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এর কারণ নিহিত রয়েছে তার ল্যাটিসের গঠন-বৈশিষ্ট্যে। গ্রাফাইটের মধ্যে কতকগুলি পরমাণু-স্তর দেখতে পাওয়া যায় যে-স্তরগুলির কোন একটির ভেতরকার

সর্প বশীভূত হয়, তেমনি পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির জন্য তারা পুঞ্জীভূত হয়। এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে বৌদ্ধ পরিভাষায় 'দ্রব্য-শক্তি' বলা হয়। যাই হোক, এইভাবেই বিশ্বজগৎ গঠিত হয়েছে। অবশ্য মনে রাখার দরকার যে, সব পরমাণুরই এই দ্রব্য-শক্তি নেই অথবা যথেষ্ট মাত্রায় নেই। সেজন্য নিম্নতম দ্রব্য-শক্তির জন্য পরমাণু মাত্রেই পুঞ্জীভূত হয় না; কোন কোন পরমাণু পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে।

শুভগুপ্তের ধারণার মধ্যে বেশ চমৎকার বিজ্ঞান মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি কুসংস্কার মুক্ত নন—অথর্ববেদীয় ঝাড়ফুঁক, মন্ত্র, বশীকরণ ইত্যাদি একেবারে গ্রাম্য টোটকায় খুব সম্ভব এই বৌদ্ধ বিদ্বানের বিশ্বাস ছিল। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, এই বিদ্বান ও তার্কিক সপ্তম শতাব্দীর অবক্ষয়িত ভারতীয় সমাজবন্ধনের শিকার হয়েছেন, তার থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস পাননি। এই প্রসঙ্গে মার্কসের কথাটি স্মরণ না করে পারা যায় না: "ধর্ম শুধু অলীক সূর্য যা মানুষকে কেন্দ্র করে ঘোরে যতক্ষণ না সে ঘোরে নিজেকে কেন্দ্র করে।"[২০]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *A History of Indian Philosophy*, Vol-I, P. 280; আগের অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য।

২. পরিশিষ্টে আমরা তাঁর পরমাণু সম্পর্কিত সূত্রগুলি সঙ্কলিত করেছি। এগুলি পড়লে এবং তার মানে দেখলে সহজেই সূত্রগুলির জটিলতা বোঝা যায়।

৩. "Jayanta and Vācaspati Miśra wrote on Nyāya, While Śridhara wrote on Vaiśeṣika, but the credit of combining for the first time the two allied systems into a joint form is, according to tradition, due to Udayana."

পরমাণু সেই স্তরের অন্য পরমাণুর সঙ্গে যত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, তার তুলনায় অন্যস্তরে পরমাণুর সঙ্গে তার বন্ধন অনেক দুর্বল। পরমাণু-স্তরগুলি দুর্বলভাবে আবদ্ধ থাকার জন্য গ্রাফাইট কেলাস সহজেই স্তর বরাবর ভেঙে যেতে পারে। হীরকের ক্ষেত্রে এর উল্টো বলেই হীরক শক্ত ও কঠিন।

দ্রষ্টব্য: লানদাউ ও কিতাইগোরোদস্কি—'কেলাসের গঠন', পৃ—৪৯-৫০, মীর প্রকাশন।

—Gopinath Kaviraj, *Gleanings from the History and Bibliography of the Nyaya-Vaisesika*, P. 20

৪. ষোলোটি পদার্থ হলো ঃ "প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতন্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও বিগ্রহস্থান"— ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, করুণা ভট্টাচার্য, পৃ-১

৫. Needham, J—*Science and Civilisation in China*, Vol-2, P. 190

এই ধাঁধার ব্যাখ্যা করে নীডহাম বলেন,— This seems to be one of those not infrequent places where the Chinese thinkers paused at the door of atomism, without going ever in. The Small Unit which has nothing within itself might well be thought of as an atom. Moreover, the idea of indivisibility is not far off..." P. 194

৬. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ—ন্যায়পরিচয়, পৃ-৬৯

৭. শ্লোকটির ইংরেজী অনুবাদ উদ্ধৃত হলো ঃ '[When the atoms are accumulated] they undergo transformation due to specific form of efficiency produced by their mutual (i. e., collective) presence. That is why the atoms of things like diamond etc. are not separated from one another'—*Indian Atomism*, P. 103

৮. বিস্তারিত আলোচনা *The positive Sciences of the Ancient Hindus* এবং *A History of Indian Philosophy*, Vol-I

৯. এ-বিষয়ে 'ন্যায় দর্শন' দেখা যেতে পারে।

১০. *Indian Atomism*, P 39

১১. Lalwani, K. C.—*Bhagavatī-Sūtra*, Vol-II, P. 195

১২. Jacobi—*Atomic theory in Indian thought* in *Studies in the History of Science in India*, Vol-I, P. 24

১৩. Ibid, P. 25

১৪. Stcherbatsky, Th.—*Scientific Achievements of Ancient India*, in *Studies of History of Science in India*, P. 11

১৫. ভট্টাচার্য, করুণা—ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, পৃ-২০-২১

১৬. *Atomic theory in Indian thought*, in SHSI, Vol-I, P. 30

১৭. *Indian Atomism*, PP. 11-12

১৮. *Atomic theory in Indian thought*, in SHSI, Vol-1, 31

১৯. *A History of Indian Philosophy*, Vol-I, P. 121f

২০. মার্কস-এঙ্গেলস—ধর্মপ্রসঙ্গে, পৃঃ ৮০

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রীক পরমাণুবাদ

ভারতীয় পরমাণুবাদ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করার পর গ্রীক পরমাণুবাদ সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা প্রয়োজন। কেননা, এখনো আমাদের দেশের অনেক অনেক শিক্ষিত মানুষ মনে করেন যে, যা পাশ্চাত্য-ভাবনায় ভরপুর, তা-ই পড়ার মত একটা বিষয় বটে ; আর যা কিনা এদেশীয়,—বিশেষত প্রাচীন কালের, তা পাঠের অযোগ্য। গ্রীক পরমাণুবাদ নিয়ে আলোচনা করলে পাশ্চাত্যমুখী পাঠককে যে একটু থমকে দাঁড়াতে হবে, তাতে মনে হয় খুব বেশী সন্দেহ থাকে না। খ্রীস্টধর্মের উত্থানের পর থেকে ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ নিয়ে কিরূপ আলোচনা হয়েছিল তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় বটে, এবং তাতে উৎসাহিত হবারও যে কারণ নেই তা বোধ করি শিক্ষিত মানুষের জানা। কিন্তু প্রশস্তপাদের পর থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় 63 জন ন্যায়-বৈশেষিক টীকা—ভাষ্যকারদের পরিচয় জানা যায়।[১] এই সংখ্যাটি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এদেশে পরমাণুবাদ সম্বন্ধীয় দার্শনিক ধারণা কীরূপ গভীর, ব্যাপক ও জনপ্রিয় ছিল। যাই হোক, গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের এ-বিষয়ে ধারণা বা অনুমান সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

গ্রীক বিজ্ঞানের আদিপুরুষ থ্যালেসের মতে, জাগতিক পদার্থের উৎপত্তির মূল হচ্ছে 'জল'। আপাত দৃষ্টিতে বিষয়টি অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে বা পরীক্ষা করলে এটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। জল এমন একটি উপাদান যা কিনা বিনা আয়াসেই তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে : কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। এই তিন অবস্থার ব্যাপারটিও মানুষের সহজে বোধগম্য ; এর জন্য বুদ্ধির বিশেষ মারপ্যাঁচের দরকার নেই। জল ফোটালে বাষ্প হয়, পাত্রের মধ্যে জল কমতে থাকে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, জল ও বাষ্প একই বস্তু। আবার পাহাড়ের তুষার বা বরফ উষ্ণতর স্থানে নিয়ে গেলে জলে পরিণত হয়। এসব মানুষের বাস্তব-জীবনের অভিজ্ঞতা। এ থেকে জলের তিনটি অবস্থা বিষয়ে মানুষের জ্ঞানার্জন যেন জলের মত সহজ হয়। "মেঘ, কুয়াশা,

শিশির, বৃষ্টি, শিলাকে সমুদ্র এবং নদীর পানির সঙ্গে যুক্ত করা কিছু কঠিন নয়। পানি মনে হয় সর্বত্রই রয়েছে এক অবস্থায় বা অন্য অবস্থায়। এ রকম কল্পনা কি অতি সাহসের ব্যাপার হবে যে পানি হয়তো অলক্ষ্যে লুকানো আকারেও বর্তমান রয়েছে ?"[২] তা ছাড়া জল ব্যতীত জীবন সম্ভব নয়—জলই জীবন।

গ্রীষ্মকালে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে জলের অপরিহার্যতা কিরূপ, তা বোধ করি বাঙালী পাঠকের উপলব্ধির বাইরে। সেখানে বৃষ্টি যেন পরম আশীর্বাদ প্রকৃতির পুনর্জীবনের জন্য। তা ছাড়া হোমারের মত থ্যালেসও ভেবেছিলেন যে, পৃথিবী সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর প্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সামুদ্রিক পুরাকাহিনী বা মিশরীয় বিশ্বতত্ত্বের[৩] কোন বিরোধ ছিলনা। খুব সম্ভব যে, তিনি প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী যুক্তিসংগতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এবং এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেবার হেতু নেই যে, থ্যালেস ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্যাবিলনীয়রা মনে করত যে, জলই প্রথম স্বয়ংসম্ভূত তত্ত্ব[৪]। এইসব তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ করে থ্যালেস মনে করলেন যে, যদি কোন মূল পদার্থ থাকে, তা হলে সর্বব্যাপী এবং জীবনদাতৃ জলই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ অনুমান। এবং পৃথিবী ও অন্য সব-কিছু প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জল থেকে উৎপন্ন।*

বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যায় এগিয়ে এলেন আর এক দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার। তাঁর ধারণা অনুযায়ী বিশ্ব একটি আবর্তিত গতির ওপরে অবস্থিত রীতি-ধারা; তার মধ্যে ভারী বস্তু হচ্ছে পাহাড় ও পৃথিবী। তাই এরা পতিত হয় নিম্নতম স্থানে। আর জলের মত হাল্কা বস্তু থাকে কিছুটা ওপরে; ধোঁয়া ও বাষ্প থাকে আরো ওপরে। এই যে ঘূর্ণ্যমান গতি তা শাশ্বত এবং বিশ্বজনীন শক্তি, সৃষ্টি ও ধ্বংসের উৎস। আদি উপাদান 'অ্যাপেরন' থাকে অনির্ণীত। কারণ, মূলত সব-কিছুই তাতে নিহিত। অ্যানাক্সিম্যান্ডার মনে হয় 'নির্ধারণ' ও 'অনির্ধারণ'-এর মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। কিন্তু কি পার্থক্য ? সেটি বলা সম্ভব নয়। এইটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জর্জ সার্টন তাঁর বিজ্ঞানের ইতিহাসে বলেছেন, "আমরা শীতল এবং উষ্ণের, শুষ্ক এবং আর্দ্রের মধ্যে পার্থক্যকে জানি—কিন্তু তার সীমা কোথায় ? কখন একটি পদার্থ শীতল বা শুষ্ক হতে থেমে যায়, এবং উষ্ণ অথবা আর্দ্র হয় ?

* **Farrington, B–Greek Science, p. 37**

…কোনো বস্তুর শেষ সীমান্তে কেউ কখনো পেঁছাতে সক্ষম হয় না, কারণ তার কোন শেষ নেই, কারণ সে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে—একটি ঘন বক্ররেখার মতো।"[৫] অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার কল্পনা করলেন পদার্থের অনিবার্য ঐক্যের নীতিতে। এতে অনন্ত দ্রব্য ও গুণগতভাবে অনির্ণেয় নিত্য দ্রব্যের গতি একীকৃত বলে তিনি মনে করলেন। বস্তুতপক্ষে, অ্যানাক্সিম্যান্ডারের আদি উপাদান সম্বন্ধে ধারণা যে অধিবিদ্যক (Metaphysical) তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অ্যানাক্সিমেনেস কিন্তু অ্যানাক্সিম্যান্ডারের অধিতাত্ত্বিক ধারণা মেনে নেননি। তিনি প্রকৃতিতাত্ত্বিক নীতি পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। জল এমন একটি ধারণা যা খুব সহজে বোধগম্য এবং সুনির্দিষ্টও। সুতরাং এটা নিয়ে কোন উচ্চ ভাবনা চলেনা। কিন্তু বায়ু? বাতাস বা বায়ু (pneuma) যথেষ্ট অনুভবনীয়, অথচ এতে অননুভবের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। বাতাসের বা বায়ুর মধ্যে জৈবিক উপাদানও কম নেই। কেননা, মানুষ, জীবজন্তু কেউই শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারেনা। শুধু কি তাই? বায়ু সংকুচিত হতে পারে বা অনির্দিষ্ট-রূপে প্রসারিতও হতে পারে। বায়ু বা বাতাসে যেমন বস্তুগত উপাদান রয়েছে, তেমনি এটা আবার কম অবস্তুগত ও আধ্যাত্মিক নয়।

বাতাস হলো আদি উপাদান, কিন্তু এই বাতাস জমে বা ঘন হয়ে, কিংবা বিস্তৃত বা তরল হয়ে সব রকম আকার পরিগ্রহ করতে পারে। অ্যানাক্সিমেনেস বলেন যে, উষ্ণতার পরিবর্তনের সঙ্গে এ-সব গুণাত্মক পরিবর্তন হয়। তিনি আরো বলেন, বাতাসের তরলীকরণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করে এবং ঘনীভূত অবস্থা সেটা হ্রাস করে। বস্তুতপক্ষে, অ্যানাক্সিমেনেসের ধারণার মূল বস্তু ছিল প্রকৃতির বস্তুগত অখণ্ডতার পুনঃবর্ণনা। এবং তা করতে গিয়ে তিনি বাতাসকে নির্বাচন করেন আদি উপাদান হিসাবে। আর প্রকৃতির সব ঘটনার ব্যাখ্যা করেছেন বাতাসের তরল* হওয়া ও ঘনীভূত হওয়ার অবস্থা দ্বারা। তাঁর মতে বিশ্বের মহাস্পন্দন কিছুটা আমাদের জীবনের স্পন্দনের মত।

থ্যালেস থেকে শুরু করে সব আয়োনীয় দার্শনিকদের যে-বিশ্বাস বাহ্য দৃশ্য সত্ত্বেও বিশ্বে কোন এক-উপাদানের ঐক্য রয়েছে, হেরাক্লিটাসও এই

* অনুবাদক মহিউদ্দীন Rarefaction-কে তরলীভবন বলেছেন; বস্তুত এটা 'তনুভবন' হওয়া উচিত।

ধারা অনুসরণ করে বললেন অগ্নিই হচ্ছে সেই এক-উপাদান। কিন্তু অগ্নি কেন? তাঁর ধারণা সম্ভবত এরকম ছিল যে, প্রত্যেক বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে,—ওপরে অথবা নীচে। আগুন ওপরের দিকে ওঠে জ্বলজ্বল করে, আবার নিভে যায়; প্রতি মুহূর্তে আগুনের রূপ বদলায়। এটাকে অন্তহীন পরিবর্তনের এক চমৎকার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। সার্টন বলছেন, "তাঁর তৃতীয় তত্ত্ব ছিল এই যে, বিশ্বের দৃশ্যমান ঐক্যহীনতা লুকিয়ে রেখেছে গভীর ঐক্যকে—কারণ প্রত্যেকটি পরিবর্তন ঘটে একটি বিশ্বজনীন নিয়ম—অনুক্রমে।"[৬] লক্ষ করার বিষয়, প্রতিটি গুণ প্রকাশ করে তার বিপরীতকে, প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব প্রকাশ করে অন্য কোথাও তার অনস্তিত্বকে। এইসব বৈপরীত্য সম্মিলিত হয় প্রকৃতির সাধারণ কাঠামোর মধ্যে। হেরাক্লিটাসের ধারণায় জগৎ যুগপৎ 'এক' ও 'বহু'—পরিবর্তন-শীলতাই একমাত্র বাস্তব সত্য।

গ্রীক দর্শনে জেনোফেনিসকে ইলিয়াটীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যুক্ত করা হলেও গ্রীসে চরম অদ্বৈতবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন পারমেনাইডিস। তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থে পরমার্থ ও অবভাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরমার্থ প্রসঙ্গে তাঁর আলোচ্য হলো "বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ দার্শনিক তত্ত্ব। তাঁর মতে এই তত্ত্ব এক বা অদ্বিতীয় 'সৎ'-মাত্র। এই সৎ সনাতন বা অপরিণামী। তার কোন বিকার নেই।...তাহলে আমাদের সাধারণ অভি-জ্ঞতায় যে-নানাত্ব আর পরিবর্তনের বোধ হয়... তা আসলে কল্পনামাত্র—মায়া বা মিথ্যা বা ভ্রম। এই ভ্রমের মূল অবশ্যই মরলোকের অজ্ঞান বা অবিদ্যা।"[৭] পূর্ববর্তী হেরাক্লিটাস নিয়ত পরিবর্তনশীলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু পারমেনাইডিসের 'সৎ' ধ্রুব, শাশ্বত এবং সনাতন। আর জন্ম-মৃত্যু, পরিণাম বা পরিবর্তন,—এ-সবই অবভাস-মাত্র। এ-বিষয়ে তাঁর শিষ্য জেনোর গতির অলীকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে 'আকিলিস কখনো কচ্ছপকে ধরতে পারবেনা' এবং 'প্রক্ষিপ্ত বা ধাবমান শরের গতি অসম্ভব' ইত্যাদি কূটাভাস (paradox) স্মরণ করা যেতে পারে।[৮] যাই হোক, পারমেনাইডিস উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম-এর মত 'এক'-এর অনুপ্রবেশ ঘটালেন।

এম্পিডোকলস চারটি উপাদান বা মূল ও দুটি শক্তিকে স্বীকার করেছেন। চারটি উপাদান বা মূল *(rhizomata)* হলো মাটি (পৃথিবী), জল, আগুন ও বায়ু এবং দুটি সচল শক্তি হলো কেন্দ্রমুখী ভালবাসা *(phi-*

lotes) এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি,—দ্বন্দ্ব *(neicos)*। তাবৎ সবকিছু এইসব উপাদানে সৃষ্ট। উপাদানগুলি নিজেরা অপরিবর্তিত ও শাশ্বত, কিন্তু তারা একত্রিত ও পুনঃএকত্রিত হয় ভালবাসার দ্বারা ; আর বিচ্ছিন্ন ও বিয়োজিত হয় দ্বন্দ্বের দ্বারা। পন্ডিতদের ধারণা এম্পিডোকলসের এই চার উপাদানের অনুমান আয়োনীয় একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদ এবং বহুত্ববাদ বা নানাত্ববাদের মধ্যে এক অদ্ভুত আপোষ। কিন্তু ফ্যারিংটন তাঁর *Greek Science*-এর 57-58 পৃষ্ঠায় বলেছেন, "The mixing of colours for painting, bread-making and the sling, he mentions as sources of his ideas."

অ্যানাক্সাগোরাসের বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে সামান্য ধারণা করতে গেলে আমাদের গোড়া থেকে আলোচনার বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। জল, অব্যক্ত অবস্থা বা বায়ু যে যাই বলুন না কেন সবার বিচারেই দৃশ্যমান জগৎ বা প্রকৃতি তার পরিণামমাত্র। অতএব ওইসব আদি পদার্থের স্বভাবই হচ্ছে নিয়ত—পরিবর্তন। কিন্তু পরবর্তী দার্শনিকরা এ ধরনের ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা পরিণাম বা পরিবর্তনের আরো সঙ্গত কারণ খুঁজতে থাকলেন। ফলে, তাঁরা পদার্থতত্ত্ব ও পরিণামতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য করলেন। "অর্থাৎ, তাঁদের মতে, পদার্থ-স্বরূপটির মধ্যেই তার নিয়ত পরিণামের রহস্য নিহিত নয় ; বা পদার্থকে পরিণাম-স্বভাবী মনে করলে পরিণাম বা পরিবর্তনের মূল সমস্যাকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা ঘটে।"[৯] ফলে, পদার্থকে স্বয়ং পরিবর্তনশীল বিবেচনা না করে পদার্থ-বহির্ভূত কোন তত্ত্বের অনুসন্ধান করা হয়।

অ্যানাক্সাগোরাসের সময়ে বা তাঁর ঠিক কিছু আগে গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে দুটি প্রবণতাই দেখা দেয়। একটির প্রবক্তা এম্পিডোকলস, আর অপরটির লিউসিপাস-ডিমোক্রিটাস। প্রথম জলের মতবাদের পরিচয় আমরা দিয়েছি ; তাই দ্বিতীয়ের বিষয়ে সামান্য উল্লেখ করা যাক এখানে। পরমাণুবাদীদের মতে, পরিবর্তনের মূলে রয়েছে এক ধ্রুব ও অনিবার্য শক্তি,—অন্ধনিয়তি। পরমাণুতে সংযোগ ও বিভাগ ঘটে চলেছে এই শক্তির প্রভাবে। আর জাগতিক পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যই হচ্ছে এই সংযোগ-বিভাগের ফল।

অ্যানাক্সাগোরাসের দর্শনে পরিণাম-তত্ত্ব অর্থাৎ পরিবর্তন-তত্ত্বকে পরমার্থ-তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া পরিবর্তন-রহস্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে তিনিই

প্রথম চেতন-পদার্থের স্বীকৃতি দিলেন।* আমরা জানিনা, তিনি পরমাণু-বাদ খণ্ডন করার জন্য তা করেছিলেন কিনা। তবে পরমাণুবাদীদের অন্ধ নিয়তির মত কোন অনিবার্য শক্তির কল্পনা যে জগৎ-বৈচিত্র্যের কারণ হতে পারেনা, তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় যথেষ্ট বাস্তবমুখী ও বিজ্ঞানচেতনাসম্পন্ন বলা যেতে পারে। তাঁর মতে, জগৎ-বৈচিত্র্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য বলতে 'রচনা' অর্থাৎ বৈচিত্র্যেভরা বিশ্বের সব পরিবর্তনের মূলে যে আশ্চর্য রচনা-কৌশল তার ব্যাখ্যার জন্য চেতনাশক্তি বা বুদ্ধি বা বিচার-প্রবণতা স্বীকার করতেই হবে। সার্টনের ভাষায় বলতে গেলে "মন (mind বা nus) হচ্ছে শক্তি—সে ক্রমে বিশৃংখলকে সুশৃংখলিত ব্রহ্মাণ্ডে রূপান্তরিত করে। দ্বিতীয়তঃ একটি শাশ্বত প্রারম্ভের ধারণা এবং আবর্ত দ্বারা বস্তুর সংস্থা সংঘটিত হয়।"[১০]

[ইংরেজী প্রতিশব্দ লেখকের প্রদত্ত]

পরিণতি : লিউসিপাস-ডিমোক্রিটাস

একটি ভাব বা ধারণার জন্ম ও তার পরিণতিতে যে কত শত বছরের ব্যবধান তা ভাবলে অবাক হতে হয়। গ্রীক পরমাণুবাদের আলোচনায় আমরা থ্যালেস থেকে শুরু করেছি ; তারপর নানা গ্রীক দ্বীপ ঘুরে শেষে লিউসিপাস-ডিমোক্রিটাসের কাছে এসে পৌঁছেছি। ইতিপূর্বে দৃশ্যমান এই জগতের যে বিপুল বৈচিত্র্য তার ব্যাখ্যা প্রাচীনকালের বিদ্বানরা কিভাবে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন, তার অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করেছি। তাঁদের সবার জিজ্ঞাসা কি ছিল ? এই বিশ্বজগৎ কি করে গঠিত হয়েছে ? এর উত্তর আমরা দু-ভাবে পেয়েছি : বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে একবস্তু থেকে বা বহুবস্তুর সমন্বয়ে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমরা আয়োনীয় দার্শনিকদের কাছে পেয়েছি ; তবে তাঁদের একত্ববাদ নির্ভেজাল নয়। সে-কারণে অ্যানাক্সিমেনেসকে সার্টন 'ছদ্মবেশী বহুত্ববাদী' বলেছেন। একত্ববাদ তথা অদ্বৈতবাদের অচল অবস্থা

---

* কিন্তু সার্টনের এই বিশ্লেষণ ফ্যারিংটন গ্রহণ করেননি। বস্তুত, অ্যানাক্সাগোরাস তাঁর বিশ্বতত্ত্ব গঠনে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন। এ-সম্পর্কে ফ্যারিংটন বলেন, "There can be no question but that he regarded sense–evidence as indespensable for the investigation of nature, but, like Empedocles, he was concerned to show that there were physical processes too subtle for our senses to perceive directly." *Greek Science*, p. 61-62

পরিত্যাগ করেন এম্পিডোকলস ও অ্যানাক্সাগোরাস। অ্যানাক্সাগোরাস একটি নিয়ন্ত্রণকারী বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে দ্বৈতবাদ প্রবর্তন করলেন; এম্পিডোকলস তাঁর চারটি উপাদান ও শক্তি-যুগ্মের দ্বারা এক ধরনের বহুত্ব-বাদ গড়ে তুললেন। পরের পদক্ষেপ পরমাণুবাদীদের। তাঁরা গ্রহণ করেন শূন্য পরিসরব্যাপী বিস্তৃত ভিন্ন সব অসংখ্য কণিকার অস্তিত্ব।

অ্যারিস্টটল, থিওফ্রেসটার প্রমুখের মতানুযায়ী পারমাণবিক মতবাদ উদ্ভাবন করেন লিউসিপাস; আর ডিমোক্রিটাস প্রায় তিরিশ বছর পর এই মতবাদের উন্নতিসাধন করেন। লিউসিপাসের রচনার কিছু অবশিষ্ট নেই, সবই বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু একটিমাত্র বাক্য তাঁর কৃতিত্ব ঘোষণা করেছে এখনো ঃ "বৃথা কিছুই ঘটেনা (কারণ ব্যতিরেকে), প্রত্যেকটি ঘটনার কারণ রয়েছে এবং সেটা প্রয়োজনের ফল।"[১১]

পণ্ডিতরা বলেন, পূর্বসূরী দার্শনিকদের বিভিন্ন ধারণার সংশ্লেষ ঘটালেন লিউসিপাস ও ডিমোক্রিটাস। ডিমোক্রিটাস দুটি মৌলিক সত্তা— পরমাণু ও শূন্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে, পরমাণু অবিভাজ্য কণিকা। পরমাণু অবিনশ্বর ও নিত্য। সব বস্তুই পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর রূপ, শব্দ, স্বাদ ইত্যাদি নেই অর্থাৎ পরমাণু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পরমাণু-গুলির পার্থক্য কেবল আকার, আকৃতি ও অবস্থানে। পরমাণুগুলির নিয়ত গতীয় অবস্থা; আর এই গতিশীল পরমাণুগুলির সংঘর্ষের ফলে ঘূর্ণ্য-গতির সৃষ্টি হয়। ডিমোক্রিটাস ভারী পরমাণুর হাল্কা পরমাণুর ওপর পতন এবং পরমাণুর ঘূর্ণ্যগতির সাহায্যে পৃথিবী ও অন্যান্য মহাকালীয় বস্তুর সৃষ্টি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়মে অসংখ্য বিশ্ব নিয়ত সৃষ্ট হচ্ছে; এবং ধ্বংস হচ্ছে। এখানে ঈশ্বরের কোন হাত সেই, ইচ্ছা নেই। ডিমোক্রিটাস বিনাশ ও বিনাশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু দুর্ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, দুর্ঘটনা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করা গেলেও, সে-জ্ঞান সংশয়রহিত নয়—'অনুজ্জ্বল'। যুক্তির সাহায্যে উজ্জ্বল জ্ঞান অর্জন করা যায়, আর তার দ্বারা বিশ্বের অন্তর্নিহিত রূপও জানা যায়।[১২]

ডিমোক্রিটাসের মতবাদের আর একটু দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা দরকার এইজন্যে যে এই বিষয়টি মানব ভাব-ভাবনার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। হেরাক্লিটাস ও পারমেনাইডিসের ভাবনার সঙ্গে পার্থক্য করলে ডিমোক্রিটাসের ভাবনাকে এভাবে উপস্থাপিত করা যায় ঃ হেরাক্লিটাসের

বিশ্বজনীন প্রবাহের বিরুদ্ধে ডিমোক্রিটাস স্বতঃসিদ্ধরূপে ধারণা করেন সত্তার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব, এবং পারমেনাইডিসের নিশ্চল ঐক্যের বিরুদ্ধে গতির বাস্তবতা। বিশ্ব দুটি অংশে গঠিত : 'পরিপূর্ণ' *(pteres, steron)* এবং 'শূন্য' বা 'খালি' *(cenon, manon)*। বিশ্বের সম্পূর্ণতা ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত। এরাই হলো পরমাণু *(atomon)*। পরমাণুরাশি সংখ্যায় অনন্ত, অসীম, আর সম্পূর্ণ সরল। গুণের দিক থেকে তারা সবাই এক, কিন্তু আকারে, নিয়মে ও অবস্থায় ভিন্ন। পরমাণুবাদীরা বলেন, পার্থক্য তিন ধরনের : **আকার** *(schema)*, **নিয়ম** *(taxis)* ও **অবস্থা** *(thesis)*। এঁদের মতে, বাস্তব কেবল স্পন্দন দ্বারা *(rhythmos)*, অন্তর্নিহিত সংযোগ *(diatege)* এবং আবর্তন দ্বারা পৃথক হয়। এ-সব থেকেই স্পন্দন হয় আকার, অন্তর্নিহিত সংযোগ হয় নিয়ম এবং আবর্তন হয় অবস্থা। কারণ, N থেকে A পৃথক হয় আকারে, NA থেকে AN পৃথক হয় নিয়মে, এবং H থেকে H পৃথক হয় অবস্থায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গতির বিষয়টি পরমাণুবাদীরা আলোচনা করেননি।

পরমাণুর আকার, নিয়ম ও অবস্থা কুহেলিকাময় হলেও অন্য-কিছু বিষয় সম্পর্কে আরো কিছুটা আলোচনা দরকার গ্রীক পরমাণুবাদ সম্পর্কে সামান্য ধারণা করার জন্য। পরমাণুবাদীদের মতে, প্রতিটি উপাদান, প্রত্যেকটি একক বস্তু যে-সব পরমাণু দিয়ে গঠিত তাদের সম্ভাব্য যোগ অনন্ত আর অনন্ত উপায়ে তা ঘটে। বস্তুর অস্তিত্ব বা স্থিতি ঠিক ততটুকু সময় যতক্ষণ পর্যন্ত তার গঠনকারী পরমাণুগুলি একত্রে সংবদ্ধ থাকে। পরমাণুদের অবিরাম সংযোগ ও বিভাগের জন্যই বাস্তবে অন্তহীন পরিবর্তন ঘটে চলে।

ডিমোক্রিটাস আত্মাকে বস্তু থেকে পৃথক করে ভাবেননি। তিনি মনে করতেন কতকগুলি পরমাণু-শ্রেণী অন্যদের চেয়ে সূক্ষ্মতর। এ-রকম পরমাণু-শ্রেণীর সবচেয়ে ভারী ও অধিক পার্থিব থেকে সর্বাপেক্ষা লঘু ও অধিক স্বর্গীয় সমস্ত সমষ্টিগ্রামকে তিনি উপলব্ধি করেন। আত্মা (মূল বস্তু, *psyche*) শরীরি, কিন্তু সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং অধিক চলনশীল। সে-সব লঘুতম পরমাণুগুলি—আত্মাগুলি সব-কিছুতে অংশগ্রহণ করে। ডিমোক্রিটাসের মতে, সব জায়গায় এক ধরনের *psyche* রয়েছে অর্থাৎ বিশ্বজগৎ আত্মা দ্বারা সঞ্জীবিত, কিন্তু কোন দেবতা নেই। অ্যানাক্সাগোরাসের *nus*-ও নেই, আর সক্রেটিসের *Providence* অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা করুণাস্বরূপ ঈশ্বরও নেই।

বস্তুতপক্ষে, ভারতীয় পরমাণুবাদ—বিশেষত বৈশেষিক মতবাদের সঙ্গে গ্রীক পরমাণুবাদের সাদৃশ্য বেশী নেই ; উভয় মতাদর্শে পরমাণু সংক্রান্ত ভাবনা ও ব্যাখ্যাও ভিন্ন প্রকৃতির। গ্রীক পরমাণু ও শূন্য উভয়েই বাস্তব সত্তাময়, পরমাণুদের বিভিন্ন আকার, আকৃতি ও অবস্থান স্বীকৃত। তা ছাড়া তারা নিত্য গতিশীল। এই ধারণা বৈশেষিকে দেখা যায় না। গ্রীক পরমাণুর সংখ্যাগত পার্থক্য আছে, কিন্তু বৈশেষিকে গুণগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ডিমোক্রিটাস মুক্ত, স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট পরমাণুতে বিশ্বাসী ; কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে সৃষ্টির আদিতে—প্রারম্ভে ছাড়া মুক্ত পরমাণু ও তার গতির কথা বলা হয়নি। ডিমোক্রিটাস পরমাণু দ্বারা জীবনচক্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন ; স্বপ্নে ঘটিত ব্যাপার, অলীক দৃশ্য, ভবিষ্যৎ-ভাষণ এবং অন্যান্য রহস্যের ব্যাখ্যা সবই পরমাণুবাদের সাহায্যে করার চেষ্টা করেছেন, এমন কি অতি অবাস্তব পর্যন্ত বাদ যেতনা। ডিমোক্রিটাসের 'আত্মা' (psyche) শরীরি, সবচেয়ে সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং গোলাকার—অধিক চঞ্চলশীল। কিন্তু বৈশেষিকরা মুক্ত আত্মাকে অদ্রব্য বলে মনে করেন। সে-কারণ, আত্মা পরমাণু দ্বারা গঠিত নয়। গ্রীকদের বিশ্ব সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা দেখা যায়, ন্যায়-বৈশেষিকে এর কোন উল্লেখ নেই। তা ছাড়া ন্যায়-বৈশেষিকের 'অদৃষ্ট', 'আকাশ', 'পরিমণ্ডল', 'দ্ব্যণুক ত্র্যণুক' 'ইত্যাদির সমার্থক কোন প্রতিশব্দ গ্রীক পরমাণুবাদে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ডিমোক্রিটাসের মতবাদ সার্বিকভাবে গ্রীক মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করেনি, যদিও খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও রোমান কবি লুক্রেটিয়াস এ-নিয়ে অপূর্ব কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতাটির নাম 'দ্রব্যের রূপ সম্পর্কে'। এখানে তিনি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বিশ্বজগৎ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসের মতামত ব্যক্ত করেন। মতামতগুলি কি ? সেগুলি অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য কণিকা সম্পর্কে বর্ণনা যা দিয়ে আমাদের এই সমগ্র জগৎটা গড়ে উঠেছে। জলের উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। উপযুক্ত মাত্রায় উত্তপ্ত করলে জল বাষ্পীভূত হয়ে অদৃশ্য হয়। এই ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ? একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, জলের ওই বাষ্পীভূত হওয়ার ধর্ম তার অভ্যন্তরীণ গঠনের ওপর নির্ভর করে। এই গঠনের কথা বিবেচনা করতেই পরমাণুর ধারণা এসে পড়ে। কিন্তু গ্রীক-ও খ্রীস্টীয়-মন বহু শত বছর ডিমোক্রিটাসের ধারণার আনুকূল্য করেনি, বিপরীতভাবে অ্যারিস্টটলের মতাদর্শ গ্রহণ করেছে।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, এম্পিডোকলস গ্রীসে চতুর্ভূতের প্রবক্তা ঃ মাটি, জল, বাতাস ও আগুন। থ্যালেস থেকে এম্পিডোকলস পর্যন্ত সব অনুমানে সংশোধন আনলেন অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে, সব বস্তুই একটিমাত্র উপাদানে গঠিত, কিন্তু এই উপাদান বিভিন্ন গুণ অর্জন করতে পারে। এ-ধরনের অবস্তু মৌলের সংখ্যা চার ঃ 'শীতল,' 'উষ্ণ,' 'আর্দ্র' 'শুষ্ক'। যুগল অবস্থায় কোন বস্তুতে আরোপিত হলে এই মৌলগুলিই এম্পিডোকলসের মৌলগুলি উৎপন্ন করতে পারে। যেমন, শুষ্ক ও শীতল বস্তু থেকে 'মাটি' : শুষ্ক ও উষ্ণ থেকে 'আগুন ; আর্দ্র ও শীতল থেকে 'জল' এবং পরিবেশে আর্দ্র ও উষ্ণ বস্তু থেকে 'বাতাস'। কিন্তু তবুও সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলোনা। সুতরাং এই চার মৌলের সঙ্গে যোগ হলো "স্বর্গীয় অতিসত্ত্বা"। এই 'অতিসত্ত্বা'-ই সর্বশক্তিমান. সর্বকার্যনিপুণ, সর্বপাচক ঈশ্বর হয়ে উঠলেন। রাষ্ট্র ও গীর্জা এই মতাদর্শের সমর্থন জানাল। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সন্দেহ করার মত ব্যক্তিত্ব আর দেখা গেল না। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যাসেন্দী (১৫৯২-১৬৫৫) অবিভাজ্য কণিকা পরমাণুর কথা তুললেন। অনেকে পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি দেখালেও জন ডাল্টনই পরমাণুকে বিজ্ঞান পবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। তবুও গত শতাব্দী শেষ হওয়ার সময়েও কোন বিজ্ঞানী লিখেছিলেন, কয়েক দশক পরে পরমাণুকে লাইব্রেরীর ধুলো ঝাড়া ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। রসিকজন বুঝুন, আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

গ্রীক পরমাণুবাদের উৎপত্তি ঃ সামান্য আলোচনা

গ্রীক পরমাণুবাদের উৎপত্তি নিয়ে ঘোরতর বিতর্ক পণ্ডিত-বিদ্বানদের মধ্যে। একদল পণ্ডিত মনে করেন গ্রীসেই এই মতবাদের—ভাবনার উদ্ভব ; আর একদল পণ্ডিত মনে করেন হয়তো বিদেশ—বিশেষত ভারত থেকে পরমাণুবাদের ধারণা গ্রীস পেয়ে থাকবে। কিন্তু কোন পক্ষের হাতেই যথেষ্ট প্রবল তথ্যাদি নেই যে-সবের সাহায্যে তাঁদের অনুমান প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সুতরাং দুঃখের বা পরিতাপের যাই হোক না কেন, আমরাও সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বাধ্য। ছেদ টেনে দিলে সব গোল মিটে যেত, কিন্তু তা হবার নয়। অতএব, কিঞ্চিৎ আলোচনা না করলে চলে না। শুরু করা যাক ডিমোক্রিটাসকে দিয়ে, তাঁর শিক্ষা, ভ্রমণ ইত্যাদি দিয়ে।

কারণ, এ-সব থেকে কিছু প্রমাণিত না হলেও অনুমান করার সুযোগ সামান্য হলেও থেকে যায় বলে আমাদের এটুু ধারণা। গ্রীক পরমাণুবাদের প্রধান ও প্রবল প্রবক্তা ডিমোক্রিটাস বাল্যকালে পারস্যে শিক্ষালাভ করেন। তা ছাড়া তিনি বহুবার বিপুল অর্থব্যয়ে নানাদেশ পর্যটন করেন দীর্ঘকালব্যাপী। যেখানে গেছেন সেখানেই খুঁজে বের করেছেন জ্ঞানী ও বিদ্বানদের, এবং তাঁদের কাছে গবেষণা করেছেন। সার্টনদের সাক্ষ্য অনুসারে তিনিই প্রথম গ্রীক দার্শনিক যিনি ব্যাবিলনে যান, সেখান থেকে পারস্যে ও তাঁর অনুমান ভারতবর্ষে পরে। এই যদি তথ্য হয়, তা হলে ভারতীয় পরমাণুবাদের সাথে তাঁর পরিচয় হতে পারে সাক্ষাৎভাবে। আর তিনি যদি ভারতে না এসেও থাকেন, তা হলেও পারস্যের শিক্ষকদের মাধ্যমে ভারতীয় পরমাণুবাদের সহিত তাঁর পরিচয় হতে পারে। বস্তুত, জ্ঞানপিপাসু ডিমোক্রিটাসের পক্ষে এমনটা হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু কীথ (Keith) সাহেব তাঁর *Indian Logic and Atomism* গ্রন্থে বৈশেষিক মতবাদ খ্রীষ্ট জন্মের পর বলে নির্দেশ করে বাদ সেধেছেন। অবশ্য প্রখ্যাত পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও কুপ্পস্বামী কীথ সাহেবের মত মানেননি। পণ্ডিতদের এই পরস্পরবিরোধী নানা উক্তির মধ্যে কার্ল মার্কস কিন্তু মনে করেন ভারতের দিগম্বর জৈনদের সঙ্গে ডিমো-ক্রিটাসের পরিচয় ছিল।[১৩] এইসব পাণ্ডিতি লড়াই-এ আমাদের ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা!

আলোচনার শেষে আসার আগে এম্পিডোকলসের ধারণার কথা একবার ভাবা যাক। উপনিষদ সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন সেখানে ক্রমে ক্রমে বস্তুগঠনে আগুন, জল, বায়ু ও মাটির কথা বলা হয়েছে। আবার চার্বাক মতেও ভূতবস্তু ওই চার ধরনের উপাদানে গঠিত। বৈশেষিক দর্শনে পাঁচটি ভৌত দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের বৈশিষ্ট্য নিত্য ও অনিত্য বলে স্বীকৃত। সুতরাং এমন অনুমান করা যায় যে, এম্পিডোকলসের মধ্যে কিছু-না-কিছু প্রাচ্য প্রভাব ছিল। সার্টনও অনুমান করেছেন যে, ভারত থেকেও এম্পিডোকলস পরোক্ষভাবে কিছু ধারণা পেয়ে থাকতে পারেন।[১৪] তা ছাড়া পারমেনাইডিসের অদ্বৈতবাদের ধারণার সঙ্গে উপনিষদের 'ব্রহ্ম' ধারণার সাদৃশ্য তো আছেই।

এইসব তথ্য, যদিও তা কিঞ্চিৎমাত্র, তবুও এ থেকে এরূপ অনুমান করলে উচ্ছ্বাস দেখানো হয়না মনে হয় যে, ভারতীয় পরমাণুবাদ গ্রীক-মনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তারপর তা গ্রীক জল ও

আবহাওয়ার গুণে রূপান্তরিত হয় এবং গ্রীক পরমাণুবাদে পরিণত হয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের গবেষণা খুবই হতাশা-ব্যঞ্জক। তাঁদের গবেষণায় এখনো সমাজের অগ্রগতিতে ভিত্তি-কাঠামো ও ওপরি-কাঠামোর মিথস্ক্রিয়াজনিত ভূমিকা বিবেচিত হয় না ; এখনো তাঁরা ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন, সযত্নে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এড়িয়ে চলেন। যেমন, INSA কর্তৃক প্রকাশিত *A Concise History of Science in India* গ্রন্থের 466 পৃষ্ঠায় ভারতীয় পরমাণুবাদ ও গ্রীক পরমাণুবাদের উদ্ভব সম্পর্কে তথ্যাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা না করেই বলা হয়েছে "প্রাপ্ত প্রমাণাদির ভিত্তিতে যতটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় তা এই যে, পরমাণুর ধারণা বা প্রত্যয় হলো স্বাধীন অনুসন্ধানের উৎসাহ ও প্রাতিভানিক মনের চিত্রাঙ্কনের ফল। ভারতীয় ও গ্রীক চিন্তাবিদরা ছিলেন প্রাতিভানিক ও স্বাধীনভাবেই এ ধারণার উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়।" বস্তুতপক্ষে, এই উপসংহার তথা সিদ্ধান্ত মধ্যপন্থা অবলম্বনের ফল। এতে মনস্বিতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতা প্রকাশিত হয়নি। এবং আমাদের ধারণা আলোচ্য অংশের লেখক অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, যেমন জর্জ সার্টনের দ্বারা।* আমাদের ধারণার উৎস হিসাবে সার্টনের মন্তব্য উদ্ধৃত হলো ঃ "পারমাণবিক ধারণা-কার্য এমন একটি জিনিস যে, যে সব জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতির অবিরাম পরিবর্তনের সঙ্গে তার ঐক্য এবং আপেক্ষিক স্থায়িত্বের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন তাঁদেরকে এই মতবাদ একদিন গ্রহণ করতেই হবে।...আর এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে গ্রীক-মনে এবং হিন্দু-মনে সে ধারণাটি স্বতন্ত্রভাবে উদিত হয়েছিল। গ্রীকগণ সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের আপন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে এবং হিন্দুগণ তাঁদের নিজেদের।"[১৫] এই মন্তব্য আর যাই হোক, বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যে নয়,—এতে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ছোঁয়া নেই, তা বোধ করি, পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। অবশ্য, মার্কসীয় দর্শনে আস্থাহীন[১৬] সার্টনের কাছে তা আশা করাও যায় না।

* একটা বিষয় লক্ষ করার মত যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা তাঁদের গ্রন্থে কোথাও ভারতীয় পরমাণুবাদের ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। টুটকো মত দু-একবার উল্লেখ করেই গভীর নীরবতা। সার্টন, ফ্যারিংটন প্রমুখেও তাই। আমাদের বিদেশীমুখীনতার কথা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনেক জায়গায় বলেছেন। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় INSA পর্যন্ত তেমন গভীর ও ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ না করে গতানুগতিক বিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চায় উৎসাহিত করেছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা কি এখনো আর্থ-সামাজিক দিক উপেক্ষা করে সফল হবেন ?

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Kaviraj, G—*Gleanings from History and Bibliography of the Nyaya-Vaisesika*, 1961

২. সার্টন, জর্জ—'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃ-২৬৩

৩. মিশরীয় বিশ্বতত্ত্বে সব-কিছুর আরম্ভ বুদ্ধ 'নান' থেকে অর্থাৎ জল থেকে।

৪. ব্যাবিলনীয়দের মতঃ জগতের উৎপত্তি জননী 'তিয়ামৎ' থেকে অর্থাৎ জল থেকে। সার্টন বলেছেন, জলের স্বরূপ বুঝতে ব্যাবিলনীয়রা যে-শব্দ ব্যবহার করত সেটা মূলত কণ্ঠধ্বনি—উচ্চকণ্ঠস্বর। এটা লগোস-এর *(logos)* সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

৫. সার্টন, জর্জ—'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস,' প্রথম খণ্ড, পৃ-২৭০ বস্তুত থ্যালেসের মতবাদের প্রতিবাদ করলেন অ্যানাক্সিম্যান্ডার ; *Greck Science*, p. 3১

৬. তদেব, পৃ-৩৭৬ ; ঋগ্বেদে অগ্নির সূক্তের আধিক্য স্মরণযোগ্য।

৭. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—'বিশ্বকোষ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ-২২৪

৮. মাইতি, নন্দলাল—'গ্রীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত,' পৃ—৪৩-৪৫

৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—'বিশ্বকোষ', ২য় খণ্ড, পৃ-৪৪

১০. সার্টন, জর্জ—'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৭৮

১১. তদেব, পৃ—৩৯১

১২. 'বিশ্বকোষ', ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ—197

১৩. Collected Works, Vol-I, P, 41-80, fn 19

১৪. সার্টন, জর্জ—'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড পৃ-৩৯০

১৫. তদেব—পৃ-৩৯৮

১৬. তদেব, ভূমিকা, পৃ-১১-তে সার্টন বলেছেন, "ডাইয়ালেকটিকাল মেটেরিয়েলিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রভাবে একটি বিশ্বাস বিস্তৃতি লাভ করেছে যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে না হলেও প্রধানতঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অর্থে ব্যাখ্যা করা উচিত। এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলে মনে হয়।"

সপ্তম অধ্যায়

ভারতীয় পরামাণুবাদে বিজ্ঞানের আভাস-ইঙ্গিত

প্রাচীন ও পরবর্তী অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনায় সব সময় একটি কথা স্মরণ রাখতে হয় যে, প্রাচীন বিজ্ঞান-ভাবনা ছিল প্রাতিভানিক (intuitive), অনুমানভিত্তিক ও স্থূল ; এই ভাবনা কেবল পর্যবেক্ষণ ও লজিকের প্রথাগত নিগড়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। এতে হয়তো বাস্তবভিত্তি একটা ছিল, কিঞ্চিৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায়ও থাকতে পারে, কিন্তু তা কখনো সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রথাপদ্ধতি ভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাণবস্তু হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করে কল্পনা ও অনুমানের বাস্তব ও সম্ভাব্য যৌক্তিকতার সাহায্যে প্রাকৃতিক ঘটনার জটিলতার ব্যাখ্যা দেওয়াই আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষণ। আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুমুখী, বিষয়মুখী নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বাদি অনড়-অটল নয় ; নতুন নতুন আবিষ্কার, তথ্যসংগ্রহের আলোকে তা পরিবর্তনশীল। প্রাচীন বিজ্ঞান ও দর্শনে এই গতিময়তা, 'হয়ে ওঠা'-র ভাবটি এতই কম যে, তা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতে পরমাণু ভাবনা যে সম্পূর্ণ দার্শনিক ভাবনা-চিন্তার ফল, তাতে সন্দেহ নেই। আর এই প্রাচীনকালের দার্শনিকদের কাছে বিজ্ঞানের প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্ব আশা করা যে যায় না, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা ভেবে-চিন্তে দেখা খুবই দরকার বলে মনে হয়। একথা সত্য, বিজ্ঞানের জ্ঞানের ক্ষেত্রটির কথা বিবেচনা করলে ভারতের পরামাণুবাদের প্রবক্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়, এটি সব দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য— কি চীন, কি গ্রীস। যাই হোক, এই সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেও এই কথাটি বারবার মনের কোণে উঁকি মারে, যে, ভারতীয় পারমাণবিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের কোন আভাস-ইঙ্গিত, অস্পষ্ট হলেও ছিল কিনা। যদি এরকম কিছু থেকে থাকে, তা হলে তার বৈজ্ঞানিক মূল্য থাক বা না থাক, অন্তত ঐতিহাসিক মূল্যটি যে গভীর, তা অস্বীকার করা যায় না। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা একান্তই আবশ্যক যে, প্রাচীন

ভারতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ একটা স্তর পর্যন্ত বেশ স্বচ্ছন্দে এসে পৌঁছেছিল। এ-যুগে বিজ্ঞান যে গভীরভাবে দর্শনকে প্রভাবিত করেছে, একথাটি না বললেও চলে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ ইত্যাদি তার অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত। প্রাচীনকালেও কোন কোন বিজ্ঞান-ভাবনা বা চিন্তা যে দর্শনের আঙিনায় প্রবেশ করেনি, একথা জোর করে বা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায় না। যেমন, চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় ন্যায়-বৈশেষিকের ধারণা পাওয়া যায়। 'ন্যায়সূত্র'-এর উৎস 'চরক সংহিতা'-য় পাওয়া যায়,—একথা আমরা আগেই বলেছি। এসব কি, বিজ্ঞানের তথ্য দিয়ে দার্শনিক প্রতিপাদনও আমাদের দেশে অলভ্য নয়।[১] সুতরাং এই সামান্য তথ্য অবলম্বন করে এই অনুমান করা চলে যে, প্রাচীন ভারতীয় পরামাণুবাদে দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার প্রাবল্য ও ভরা কোটাল থাকলেও, বিজ্ঞান-ভাবনা একেবারে অলভ্য নাও হতে পারে।

ভারতীয় পরামাণুবাদ ও ডাল্টন

ভারতীয় পরমাণুবাদের সহিত ডাল্টনের পরমাণুবাদের তুলনা অর্থাৎ এতে ভারতীয় পরমাণুবাদের কোন আভাস-ইঙ্গিত আছে কিনা আলোচনা করতে গেলে অতিকথন বা অতিশয়োক্তি ঘটতে পারে। বিজ্ঞানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন গ্রীক পরমাণুবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা আমাদের এই প্রয়াস প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য বলে আমরা একটু বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "গ্রীক পরামাণুবাদের বিচার করার সময় দুটি অতিশয়োক্তির কথা সম্বন্ধে আমাদের অবগত থাকতে হবে। তার একটি এই যে এটাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ডাল্টন আবিষ্কৃত আধুনিক মতবাদের সমান পর্যায়ে দেখা যায়—এবং অন্য দিকে অস্পষ্টতার জন্য এটাকে বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। অবশ্য গ্রীক ধারণা এবং ডাল্টনের ধারণার বিপুল পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য অবস্থিত রয়েছে একটি দার্শনিক উপলব্ধি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের মাঝখানের পার্থক্য। আর বৈজ্ঞানিক প্রকল্পটির উপর ধারাবাহিক পরীক্ষামূলক নির্ণয়ের কাজ চলে আসছে। অন্যদিকে একথা নিঃসন্দেহ যে ডেমোক্রিটাসের মত এপিকিউরাস কর্তৃক পুনর্জীবিত এবং লিউক্রেটিয়াস কর্তৃক প্রচারিত হয়ে বহু শতাব্দী ধরে একটি বুদ্ধিগত উদ্দীপনারূপে বিরাজমান রয়েছে।"[২]

ভারতীয় পরামাণুবাদ, বিশেষত ন্যায়-বৈশেষিক মত সম্পর্কে এই কথা একইভাবে প্রযোজ্য।

অনেকের জানা যে, ডাল্টনের পরমাণুবাদ প্রকল্পটি ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে রচিত। রাসায়নিক বিক্রিয়ার স্বরূপ অনুধাবনে এই মতবাদের গুরুত্ব বহু আলোচিত। বস্তুত, তাঁর মতবাদ রসায়নকে প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তুলতে প্রভূত সাহয্য করেছে। এই মতবাদ কেবল ভরের নিত্যতা সূত্র, রাসায়নিক সংযোগসূত্র ব্যাখ্যা করতেই সাহায্য করেনি, মৌলের (Element) তুলনামূলক পারমাণবিক গুরুত্ব নির্ণয়েও সাহায্য করেছে; রাসায়নিক সমীকরণ ও গণনা প্রণালী নির্ণয়েও তার অবদান অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া, অতি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাভোগাড্রোর প্রকল্প উদ্ভাবনেও এর ভূমিকাটি বিজ্ঞানের ছাত্রদের সুবিদিত। তবুও রসায়নের অগ্রগতিতে এর বিশিষ্ট ভূমিকার কথা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, এই মতবাদ ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এই মতবাদের সবচেয়ে বড় অবদান এই যে, সঙ্কীর্ণ অর্থে হলেও এতে 'দ্বান্দ্বিকতা'-র (dialectical) বীজ নিহিত ছিল, এবং সেইজন্যই 'খণ্ডনের খণ্ডন'-এর[৩] (negation of negation) সূত্র ধরে বিকাশিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদেও, যেমন, সর্বাস্তিবাদে, এই বীজ নিহিত ছিল—বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্ব বর্তমান ছিল, বৈশেষিকের আত্মা—মুক্ত আত্মা তো একেবারে মাটির ঢেলার মতন যা কিনা শংকরাচার্য ও তাঁর মতাদর্শ পক্ষীয়দের একেবারে বিপরীত। কিন্তু প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ক্রমোন্নতির পর অবশেষে অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের অতীন্দ্রিয়তা ও কল্পলোকের ধারণার বৃত্তে বন্দী হওয়ায় এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মহীরূহে পরিণত হতে পারলনা, —বিশেষত ন্যায় ভাষ্যকার উদ্দোতকার, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন প্রমুখ পরমাণুকে অবলম্বন করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণেই যেন নিযুক্ত রইলেন। কিন্তু "ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া অগ্রাভিমুখী—উন্নত পর্যায়ের দিকে" বলে "গুণের পুরাতন পর্যায় থেকে নতুন উন্নততর পর্যায়ের বিকাশ" হয় বলে ভারতীয় পরমাণুবাদের কিছু ধারণার সঙ্গে আধুনিক ধারণার অস্পষ্ট আভাস—প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে তা যে কখনোই আধুনিক, বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থে নয়,—একথা কোন সময় ভুলে গেলে চলবেনা। মনে রাখা দরকার, ন্যায়-বৈশেষিক পরমাণুবাদ আধুনিক পরমাণু গবেষণায় কোন প্রেরণা ও উৎসাহ যোগায়নি।

ডাল্টনের পরমাণুর সঙ্গে কণাদ তথা ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধদের পরমাণুর বেশ মিল দেখা যায়। ডাল্টনের মতে, প্রতিটি মৌলিক পদার্থ অতি সূক্ষ্ম অবিভাজ্য নিরেট কণার সমবায়ে গঠিত। আর ওই কণাগুলিই হলো পরমাণু। রাসায়নিক পরিবর্তনে এরা অপরিবর্তিত থাকে; এদের সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই অর্থাৎ নিত্য। এর সঙ্গে কুন্দকুন্দাচার্যের পঞ্চাস্তি-কায়সারে বর্ণিত পরমাণুর সংজ্ঞা হলো—'সর্বেষাং স্কন্ধানাং যোঽন্ত্যস্তং বিজানীহি পরমাণুম্'—স্কন্ধের অন্তিম অবস্থাকে পরমাণু বলে জানবে। পরমাণু যে নিরেট, অবিভাজ্য—এই নিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও বৌদ্ধরা দীর্ঘ আলোচনা করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডাল্টনের পরমাণুরা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে; কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হয়ে স্থূল থেকে স্থূল দ্রব্য উৎপন্ন করে না। কিন্তু ব্যতিক্রম কেবল 'দ্ব্যণুক' উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে, এখানে দুটি পরমাণু সংযোগে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, অথচ 'ত্র্যণুক' ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরমাণু সাক্ষাৎভাবে সংযুক্ত হয় না। আর পরমাণুর সৃষ্টি নেই, ধ্বংস নেই অর্থাৎ নিত্য, এটা ন্যায়-বৈশে-ষিকেরও সিদ্ধান্ত। তাঁরা বলেন, প্রলয়কালেও (খণ্ড প্রলয়ে) পরমাণুর বিনাশ নেই। ডাল্টনের মতে, বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর ভর ও ধর্ম বিভিন্ন; কণাদের মতেও তাই। মাটি-পরমাণু, জল-পরমাণু ইত্যাদি হাইড্রোজেন, অক্সিজেন পরমাণু ইত্যাদির মত বিভিন্ন। দ্রব্যের গুরুত্ব, ঘনত্ব নিরূপিত হয় পরমাণু সংখ্যার অল্পত্ব ব্য বহুত্ব দ্বারা। জৈনরা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, সব পরমাণুই এক জাতীয় (homo-geneous)। ন্যায়-বৈশেষিক ও জৈনদের মধ্যে আর একটি পার্থক্য বিশেষ-ভাবে লক্ষ করার মত যে, প্রথম সম্প্রদায়ের মতে মাটি-পরমাণু, জল-পরমাণু কেবল জল-পরমাণু ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত হতে পারে, মাটি-পরমাণু জল-পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হতে পারে না। জৈনরা কিন্তু মনে করেন, মাটি-পরমাণু জল-পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হতে পারে, এবং সমজাতীয় পরমাণুরাও পারে যদি তাদের স্নিগ্ধতা ও রুক্ষতার মাত্রাভেদ হয়, অন্তত দু-মাত্রার,—'দ্ব্যধিকাদিগুণানাং তু।'

ডাল্টনের মৌলের পরমাণুরা রাসায়নিক সংযোগকালে সুনির্দিষ্ট এবং সরল অনুপাতে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়ে যৌগ (compound) গঠন করে; বৈশেষিকের 'দ্ব্যণুক', 'ত্র্যণুক', 'চতুরণুক' ইত্যাদি গঠনের ক্ষেত্রে এরকম ধারণা দেখা যায়। অবশ্য একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, দ্ব্যণুক কেবল

ত্র্যণুক উৎপন্ন করে ; ত্র্যণুক কেবল চতুরণুক উৎপন্ন করে ইত্যাদি ক্রমটি ভাঙলে চলবে না। আবার, ডাল্টনের পরমাণুবাদ থেকে তো বটেই, এমন কি ন্যায়-বৈশেষিক মতাদর্শ থেকেও পৃথক ও ভিন্ন প্রকৃতির হলেও বৈভাষিকদের মধ্যে পূর্ণসংখ্যার অনুপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তা স্থূল হলেও এবং কেবল অনুমান-নির্ভর হলেও যৌগ গঠনে পরমাণুরা যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় যুক্ত হয়,—এই ধারণা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া, 'দ্ব্যণুক'-এর মধ্যে অ্যাভোগাড্রোর 'অণু'-র ক্ষীণ আভাস আছে বলে মনে হয়, অন্তত এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রত্বের দিক থেকে, আর কিছু দ্বি-পারমাণবিকতার দিক থেকে। আবার, রঘুনাথের মতবাদ অনুসারে ত্র্যণুক থেকে উৎপত্তি আরম্ভ বলে একে আণবিক মতবাদ বলা চলে।

কিন্তু একথা না বললেও চলে যে, ডাল্টনের পারমাণবিক মতবাদের প্রত্যয়-প্রতীতি বা রূপ প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক পরমাণুবাদে পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয় পরমাণুবাদ মূলত দর্শন ও ধর্মাশ্রিত, যদিও এর স্বরূপে বস্তুবাদের আভাস পাওয়া যায়, এবং হয়তো আদিতে আরো অধিক পরিমাণে ছিল।[৪] উপনিষদের বহু অংশে ইতস্তত বস্তুবাদের ছাপ পাওয়া যায়, এবং বৈশেষিক দর্শনেরও কোন কোন ধারণায় বস্তুবাদ একান্ত অলভ্য নয়। বস্তুত, এই দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হলেও এতে "পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদ পাওয়া যায় না"।[৫] আবার, উপনিষদের মধ্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু ভাববাদের নির্লজ্জ আক্রমণে ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রবণতা চার্বাক ছাড়া আর কোন দর্শনে প্রবল হয়ে উঠতে পারেনি, সম্ভবত যাজ্ঞবল্ক্যের 'পরোক্ষ-প্রিয়াঃ ইব হি দেবাঃ, প্রত্যক্ষদ্বিষঃ'[৬]—দেবতারা পরোক্ষপ্রিয়, তাঁরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে দ্বেষ করেন,—ঘোষণার পর থেকে। বিজ্ঞানের বিখ্যাত ঐতিহাসিক বার্নাল বলেছেন, ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্ভাবনা মুঘল যুগে ছিল। কিন্তু আমাদের তা মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, বস্তুবাদের উদ্বোধন ঘটতে পারত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের পর থেকে, এবং তা যদি আনুকূল্য পেত, তা হলে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে ভারতে বিজ্ঞানের শুভ সূচনা হতে পারত যাকে সীমিত অর্থে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস বলতে পারি। অবশ্য এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে, এবং সুধীজন বিচার-বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখলে ভাল হয়।*

---

* অষ্টম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিয়েছি।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা খুবই উল্লেখের দাবী রাখে বলে মনে হয়। ইউরোপে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ফলেই বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব হয়েছে, একথা যেমন সত্য নয়, তেমনি ভারতেও যে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথা বিজ্ঞান-ভাবনার উপলব্ধি ও চর্চার ফলেই উন্নতি হতো, একথা বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক উন্নতি সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির ওপর এমনভাবে নির্ভরশীল যে, বিচ্ছিন্নভাবে কোন-কিছুর উন্নতি সম্ভব নয়। তবে অতীত জিজ্ঞাসা, অতীত চর্চা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে হলে প্রগতির পথ সুগম হয়, আর স্পষ্টও হয়। প্রাচীন বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে কিভাবে ইউরোপ নবজাগৃতির প্রেরণা পেল, তার আলোচনা করে বার্নাল বলেছেন, এতে সবচেয়ে কঠিন ও বড় কাজ হলো 'to prevent themselves from being stifled by it'[৭]. কিন্তু ভারতীয় চিন্তাবিদরা শত শত বছর ধরে শ্রেণীচেতনা ও সুবিধাবাদ বজায় রাখার জন্য কুতর্কের জালে আবদ্ধ হয়ে চর্বিতচর্বণ ছাড়া আর বিশেষ কিছু করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাই বিদ্রূপ ও কৌতুক মিশ্রিত করে বলেছেন, 'পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র' ; আবার সাংখ্যরা তো 'মাটি থেকে তেল, তেল থেকে ঘট উৎপত্তি' তর্কে এসে হাজির হয়েছিলেন বৈশেষিকদের 'অসৎকার্যবাদ' নস্যাৎ করার জন্য।* ন্যায়-বৈশেষিকের ইত্যাদির টীকার পর টীকা, ভাষ্যের পর ভাষ্য, রচিত হয়েছে, যেন স্কুল-কলেজের অর্থপুস্তক রচিত হয়েছে, দর্শন ও ধর্মকে গুহা থেকে বের করার জন্য অর্থাৎ আত্মা, কর্মফল, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠার জন্য। এভাবেই ভারতীয় বিজ্ঞান মোক্ষ লাভ করল কখন কেউ টের পেল না।

সার্টনের কথা মনে রেখেই আমরা ডাল্টনের পরমাণুবাদের সঙ্গে ভারতীয় মতাদর্শের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করলাম। আবারো তাঁর কথা মনে রেখে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের কিছু ধারণার সঙ্গে ভারতীয় মতাদর্শের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা-অনাত্মীয়তা দেখাবার প্রয়াস পাব। অনেকেই জানেন, মৌল কণিকা (Fundamental particles) আজ আর তিনটিতে সীমাবদ্ধ নেই—শতাধিকে দাঁড়িয়েছে। এমন কি, গোটা নয়, ভাঙা কণিকার (কোয়ার্ক) অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ গণিতের কেরামতিতে স্বীকৃত হচ্ছে। বস্তুত, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা এক বিস্ময়কর অগ্রগতিতে পৌঁছেছে। আর পরমাণু রাজ্যের বাসিন্দাদের নিয়ম-

* এ-বিষয়ে আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

কানুনও সব অদ্ভুত রকমের। এই রূপকথা রাজ্যের গল্প এমন ধরনের যে, সেখানে 'গল্পের গরু গাছে ওঠে'-টাও সত্যি। যাই হোক, ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে আসল কথায় ফেরা যাক।

আধুনিক পারমাণবিক গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হাইজেন-বার্গ গ্রীক পরমাণুবাদের ধারণা একেবারে মিশমার করে দেননি, সামান্য হলেও কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। হেরাক্লিটাসের 'অগ্নি'-র (Fire) সঙ্গে 'শক্তি' (Energy), আর ডিমোক্রিটাসের পরমাণু যা কিনা নিগুর্ণ 'দেশ' (space) জুড়ে থাকে এবং সতত গতিশীল, তার সঙ্গে আধুনিক নিউট্রন ধারণার মিল খুঁজে পেয়েছেন তিনি। অবশ্য তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে আধুনিক শক্তি-ও নিউট্রন-ধারণার সঙ্গে প্রাচীন ধারণার হুবহু মিল আছে মনে করলে ভুল হবে। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক পারমাণবিক গবেষণা যেমন জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক, ততোধিক জটিল গাণিতিক সম্পর্কে অন্বিত। দু-আড়াই হাজার বছর আগেকার প্রাতিভানিক ভাবনা-চিন্তায় এ-সব আশা করা স্রোতের বিপরীত গতির স্বাভাবিকত্বের মত বা বন্ধ্যাপুত্রের বিবাহের মত।

ভারতীয় দর্শনে চতুর্ভূত বা পঞ্চভূতের বর্ণনা সুবিদিত। 'ভূত' অর্থে কখনো জড়, কখনো বা জীব। তবে চার্বাক মতে ভূত মানে জড়, আর ন্যায়-বৈশেষিকের নিত্য-অনিত্য চার ভূতও জড় বা অচেতন পদার্থ। পরমাণু বিজ্ঞানী রাজা রামান্নার মতে, 'পৃথিবী' (মাটি), 'অপঃ' (জল), 'বায়ু' (বাতাস) ও 'তেজস'-কে (আগুন) যথাক্রমে কঠিন, তরল, গ্যাস ও বিকিরণ হিসাবে মনে করা যেতে পারে।[৮] তা ছাড়া, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্নংভট্টের তর্ক-বিদ্যার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'দ্রব্য', 'গুণ' ও 'কর্ম'-কে যথাক্রমে পদার্থ (matter), ধর্ম (property) ও গতি (dynamics) বলে ধরা যেতে পারে। হাইজেনবার্গের মত তিনিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, অন্নংভট্ট এ-সব না জানতেও পারেন, কিন্তু এরকম সংজ্ঞা দিলে বা এভাবে ভাবলে আমরা আধুনিক ধারণা পাই। ন্যায়-বৈশেষিকের 'উৎক্ষেপণ'* ও 'অবক্ষেপণ'-কে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত গতি (directed motion) অর্থাৎ ভেকটর হিসাবে ধরলে

---

* ন্যায়-বৈশেষিকে 'কর্ম' (Movement) পাঁচ প্রকার: উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

উৎক্ষেপণ: যে ক্রিয়ার দ্বারা ওই ক্রিয়ার আশ্রয় যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের উধর্বদেশের সহিত সংযোগ হয়, সেই ক্রিয়া বা কর্মকে উৎক্ষেপণ বলে।

গতিতত্ত্বের (kinetic theory) ধারণা পাওয়া যায়। রামান্নার মতে, বিজ্ঞানদের কেবল দার্শনিকভিত্তির ওপর পরিভাষাগুলি ব্যবহার না করে এই দিকে নজর দেওয়া উচিত।

আবার, সাংখ্য মতে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ এই পাঁচটি 'তন্মাত্র' সূক্ষ্মভূত এবং আকাশ-বায়ু-জল-অগ্নি-পৃথিবী 'মহাভূত'। সূক্ষ্মভূত' ও মহাভূত যথাক্রমে গুণাত্মক শক্তি এবং জড় পরমাণুর সমাবেশ। সূক্ষ্মভূত থেকে মহাভূতের উৎপত্তির অর্থ জড়ের থেকে শক্তির প্রকাশ। ভারতীয় মতে অগ্নি ও জড় পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যায় "তন্মাত্ররূপে শক্তি হিসাবে এবং মহাভূতরূপে পুনরায় পদার্থ হিসাবে এদের কল্পনা করা হয়েছে।"[১০] তা ছাড়া, আকাশ তন্মাত্র-র সঙ্গে ডিরাক বর্ণিত প্রতি জড়ের (Anti-matter) সাদৃশ্যও কল্পিত হতে পারে। এ-বিষয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্রিয়দারঞ্জনের বক্তব্য তুলে ধরা যাক : "বিজ্ঞানী ডিরাক অঙ্কশাস্ত্রের জটিল সমীকরণের সমাধান থেকে ধারণা করেছেন যে, মহাশূন্য বা আকাশ শূন্য নয়, তা হচ্ছে একপ্রকার বিপরীত জড়ধর্মী সত্তার (anti-matter) পরিপূর্ণ ভান্ডার। এই অদ্ভুত সত্তার ধর্ম হচ্ছে জড়ের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। বায়ুশূন্য স্থানে কোন জড় পদার্থ (যথা, লোষ্ট্র) হস্তচ্যুত হলে তা যায় মাটিতে পড়ে ; কিন্তু এ অবস্থায় কোন অ্যান্টিম্যাটার যাবে উর্ধ্বদিকে ছুটে।...আকাশে বা মহাশূন্যে সর্বত্র এই অ্যান্টিম্যাটার থেকে ম্যাটার (matter) বা জড় বস্তুর অহরহ সৃষ্টি হচ্ছে।...ডিরাকের এই অদ্ভুত কল্পনা ভারতীয় দর্শনের আকাশ তন্মাত্রা কল্পনার অনুরূপ বলা চলে।"[১১]

ইলেকট্রনের এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে বা শক্তি-স্তরে রবীন্দ্র কথিত উচ্চিংড়ের লম্ফ প্রদানের ফলে আলোক রশ্মির বিকিরণ বা অবশোষণ ঘটে। রেডিও তরঙ্গ, গামা রশ্মি ইত্যাদির বেগও প্রায় আলোর বেগের সমান। জৈন মতে,—কুন্দকুন্দাচার্যের মতে পরমাণুদের এমন বেগ হতে পারে যা মুহূর্তে ব্রাহ্মান্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। পঞ্চাস্তিকায়সারে বলা হয়েছে,—'স্কন্ধানামপি চ কর্তা প্রবিভক্তা কালসংখ্যায়াঃ'— [পরমাণুরা] স্কন্ধ উৎপন্ন করে, এবং কাল ও সংখ্যা নিরূপণ করে।[১২] এই ধারণায় 'ফোটন' বা অদৃশ্য রশ্মিকণার গুণগত

অবক্ষেপণ ঃ যে ক্রিয়া দ্বারা ওই ক্রিয়ার আশ্রয় দ্রব্যটি অধোদেশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাকে বলে অবক্ষেপণ।

বিস্তারিত বিবরণ 'ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন পৃ-৯৩-৯৬ দ্রষ্টব্য।

সাদৃশ্য কল্পিত হয়েছে বলে মনে হয়। প্রিয়দারঞ্জন বেদান্তের 'মায়া' ও সাংখ্যের 'প্রকৃতি'-র সঙ্গে তড়িচ্চুম্বক ক্ষেত্রের (electro-magnetic field) ধারণা অন্বিত করতে আগ্রহী। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে ঐকমত্য স্থাপন করা দুরূহ প্রধানত এইজন্য যে, শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত বেদান্ত এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাসী নয়। এই মাটি, এই গাছপালা, ঘরবাড়ী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সব মায়া, বেবাক মিথ্যে। কি রকম মিথ্যে? না, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত। কিন্তু এই মায়াবাদীদের ভাল ঘরবাড়ী চাই, স্ত্রী-পুত্র চাই, সর্বোপরি উত্তম উত্তম খাদ্য চাই। আর তা যোগায় কিনা অজ্ঞানের ঘোরে যারা দিনরাত খেটে মরে। আশ্চর্য! সুতরাং ঘোরতর ভাববাদী দর্শনে নিছক বাস্তবধর্মী বিজ্ঞানের ধারণা খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল —পন্ডশ্রম। সাংখ্যের বেলায় তার বক্তব্য গ্রহণ করা যায় না প্রধানত এই কারণে যে, ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্যে একেবারে বিপরীত মেরু পার্থক্য। সাংখ্য সৎকার্যবাদে বিশ্বাসী, ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্যবাদে বিশ্বাসী; তা ছাড়া সাংখ্যকার কপিল তো পরমাণুকে জগৎকারণ বলতেই অস্বীকার করেছেন। আদি সাংখ্যের কোন রূপে বস্তুবাদের ছোঁয়া থাকলেও বর্তমানে প্রাপ্ত সাংখ্য একশ' শতাংশ ভাববাদীদের দলে। বাস্তবিকপক্ষে, সাংখ্য ভারতীয় প্রকৃতি বিজ্ঞানে প্রভূত ক্ষতি না করলেও অদ্বৈত বেদান্ত, বিশেষত শঙ্করাচার্য অ্যান্ড কোং মায়াবাদীরা প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের আত্মহননে বাধ্য করেছেন।

ন্যায়-বৈশেষিকের 'ত্রাণুক', 'চতুরণুক,' জৈনদের 'পুদ্গল', 'স্কন্ধ', 'অনন্তাণুক' ইত্যাদির সঙ্গে অতিকায় অণুর (High Polymer) কল্পনা একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; বৌদ্ধদের যৌগিক অণুর 'সপ্ততলক', 'অষ্টতলক', 'নবতলক গঠন-রূপের সঙ্গে কেলাস গঠনের ব্যাখ্যা জড়িত করলে কি অপব্যাখ্যা হবে? শুভগুপ্ত তাঁর 'বাহ্যার্থসিদ্ধি'-তে অন্তত হীরার কাঠিন্যের উদাহরণ দিয়ে কেলাস গঠনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন বলে মনে হয়। আর. স্টুবে (R. Stube) আরহেনিয়াসের (L. Arrhenius) আয়নবাদের সহিত কণাদের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন; এ. বার্থও (A. Barth) পশ্চিমী পদার্থ-বিদ্যার সহিত বৈশেষিকের ঐকমত্য স্থাপনে আগ্রহী।[১৩]

সম্প্রতি উচ্চশক্তির পদার্থবিদ্যায় বিশ্বের গঠন সম্পর্কে একটি 'মডেল' খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি 'বুটস্ট্র্যাপ মডেল' (Bootstrap Model)

নামে পরিচিত। এই মডেলে প্রতিটি মৌলিক কণিকা অন্যান্য মৌল কণিকা সমবায়ে গঠিত,—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়, এবং বিশ্বকে অসীমসংখ্যক জটিল সদৃশ কণিকার পরস্পরের সহিত বুনন হিসাবে গণ্য করা হয়। এই 'বুটস্ট্র্যাপ' ধারণা আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার আবিষ্কার। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই ধারণা বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায় যা কিনা শত শত বছর আগে প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদের বিকাশে সহায়তা করেছিল।[১৪]

ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে হয়তো ভারতীয় পরমাণুবাদের মধ্যে অনেক আধুনিক ধারণার সাদৃশ্য দেখানো সম্ভবপর। কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে, অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তন-কাঠামো বাস্তবভিত্তিক তথা বস্তুভিত্তিক ছিল না। এ-বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম অবশ্য চার্বাক সম্প্রদায়, কিন্তু তাঁদের দর্শনের পরিপূর্ণ রূপটি আমাদের অজ্ঞাত। একথা সত্য, প্রাচীন ধ্যান-ধারণার মধ্যে আধুনিক, এমন কি অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসন্ধান করলে ভ্রান্তি সৃষ্ট হতে পারে—পদে পদে বিচ্যুতির সম্ভাবনাও প্রবল থাকে। বর্তমানে কিছু 'মহর্ষি', 'বাবা', 'মহাপুরুষ' ও তাঁদের চেয়েও অধিক ধর্মপ্রাণ পল্লবগ্রাহী শিষ্যরা যে রকম অপবিজ্ঞান ও অপব্যাখ্যা প্রচার করছেন, তাতে শঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা এখানে সে-রকম এক অপবিজ্ঞান ও অপব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

অনেকে মহেশ যোগীর নাম শুনে থাকবেন। সম্প্রতি এই যোগী 'বৈদিক বিশ্ববিদ্যালয়' (Vedic University) নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, এবং এর প্রশাসনিক কাজ-কর্ম সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্থান থেকে পরিচালনা করা হয়। দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় এই প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক ভৌত ও জীব বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে ঋগ্বেদের জ্ঞান অন্বিত করার জন্য গবেষণা শুরু করেছে। এবং তাঁরা নাকি পদার্থ-বিজ্ঞানের 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব'-এর (Unified Field theory) জ্ঞান ঋগ্বেদে পেয়েছেন, এবং তা সমাধান করেছেন যা কিনা আজ পর্যন্ত কোন পদার্থ-বিজ্ঞানী বা গণিতজ্ঞ পারেননি।[১৫] অর্থাৎ এই যোগী ও তাঁর শিষ্যরা প্রচার করছেন ঋগ্বেদই জ্ঞানের আকর —বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান সেখানে নিহিত।

সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের সুবিধার জন্য 'একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। বিশ্বে মোট চার ধরনের বল (Force) বর্তমান—মহাকর্ষ বল, তড়িচ্চুম্বক বল, প্রবল নিউক্লীয় বল ও দুর্বল নিউক্লীয় বল। আইনস্টাইন প্রথম দুটি বলকে একীভূত করার

প্রয়াসে প্রায় তিরিশ বছর চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে ব্যর্থ হন। কিন্তু আবদুস সালাম, ভাইনবার্গ ও গ্লাসো তড়িচ্চুম্বক ও দুর্বল নিউক্লীয় বলকে একীভূত করতে সমর্থ হন, এবং 'তড়িৎ-দুর্বল তত্ত্ব' (electro-weak theory) প্রচার করে সবাই নোবেল পুরস্কার পান। এই তত্ত্ব কেবল অঙ্কের মারম্যাঁচ নয়, সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, যদিও আরো কিছুটা বাকী এর অনুসিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায়। সালাম প্রমুখের তত্ত্বের সঙ্গে প্রবল নিউক্লীয় বল অন্বিত করে 'মহাএকীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব' (Grand Unified theories) প্রস্তাবিত হয়েছে, কিন্তু এর পরীক্ষা-নিরীক্ষাভিত্তিক সত্যতা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা অবশ্য চারটি মূল বলকে একীভূত করার চেষ্টা করছেন সুপারসিমেট্রি* (Supersymmetry) ও স্ট্রিং* (string) ধারণার সম্মিলন ঘটিয়ে। কিন্তু তা এখনো ভ্রূণাবস্থায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত 64 টি সমীকরণের বেশকিছু বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সমাধান করেছিলেন। এই কলমের আঁচড়ে মাত্র টানা এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় বিশ্বের তাবৎ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কাছে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব একটি চ্যালেঞ্জ। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি সাধুবাবারা বলেন, সবই 'ব্যাদে আছে' আর আমরা তা জানি, তা হলে সূর্যে বসবাস করাও সম্ভব। বিজ্ঞান বস্তু-মুখী, বিষয়মুখী নয়—ব্যক্তির রুচি-অরুচির ওপর, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তবে খুবই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়, দেশ-বিদেশের বহু বিজ্ঞানী অধিবিদ্যার আকর্ষণে, তা বেশীর ভাগ বাণপ্রস্থে যাবার বয়স, ভ্রান্ত মন্তব্য করে থাকেন। এ-বিষয়ে শেষ অধ্যায়ে আমরা কিছু বিশ্লেষণ ও আলোচনা করব। যাই হোক, এ-সব সত্ত্বেও বোধ হয় আমাদের ভাববার ও আত্মজিজ্ঞাসার অবকাশ থেকে যাচ্ছে যে, "প্রাচীনকালের চিন্তার মধ্যেও যেখানে যতটুকু বিজ্ঞান-চেতনার প্রতিশ্রুতি ছিল সেটুকুকেও সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।"[১৬]

পরমাণু সম্বন্ধে পরিমাণগত ধারণা

কণাদ ও গোতমের সূত্রাদি থেকে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত পরমাণু সম্বন্ধীয় ধারণা পাওয়া গেলেও এবং সময়ের প্রেক্ষিতে সে-সবের গুরুত্ব

সুপারসিমেট্রি : ফারমিয়ন ও বোসনের মধ্যে প্রতিসাম্যকে বলে।
স্ট্রিং : মূল বস্তু দড়ি বা সুতোর ন্যায়—'The basic objects are string like'.

অস্বীকার করা ঐতিহাসিকভাবে সম্ভব না হলেও পরমাণুর কোন 'পরমাণু-গত' ধারণা ছিল কিনা তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। পরমাণু-বাদীরা দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকের নাম করেছেন সত্য, কিন্তু তা থেকে পরমাণুর পরিমাণগত দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। সুতরাং আধুনিক মনে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, প্রাচীন ভারতে এই সম্বন্ধে কোন ধারণা এবং তা স্থূল হলেও ছিল কি না। অনেকেই জানেন, প্রাচীন ভারত গণিতে বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছে। এ-দেশে দশগুণোত্তর পদ্ধতি ও শূন্য আবিষ্কৃত হয়েছে বলে বিশ্বের বিদ্বানসমাজে সাধারণভাবে একটা স্বীকৃতি আছে, যদিও নীডহামের *Science and Civilization in China* প্রকাশের পর থেকে চীনের দাবী ক্রমশ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। যাই হোক, প্রাচীন ভারতীয় কোন গ্রন্থে পরমাণুর পরিমাণগত ধারণা পাওয়া যায় কিনা অনুসন্ধান করা যাক।

এ-বিষয়ে আমরা কেবল একটি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের নাম করতে পারি যাতে পরমাণুর পরিমাণগত দিকটি অনেকাংশে স্পষ্ট। এই গ্রন্থের নাম 'ললিতবিস্তার'। প্রখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে গ্রন্থটি ৪৫০—৩০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত।* কিন্তু বর্তমানে গ্রন্থটি প্রথম শতাব্দীতে রচিত বলে অনুমান করা হয়। যাই হোক, গ্রন্থটি প্রথম শতাব্দীর কিছু পরে বা আগে রচিত হলেও এতে প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুর পরিমাণগত দিকটির যে আলোচনা রয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোধিসত্ত্ব গণনের নীতি প্রয়োগ করে এক যোজন পরিমিত দীর্ঘ স্থানে কত সংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান তারই একটি হিসাব প্রকাশ করেছেন। প্রথমে আমরা মূল সংস্কৃত অংশটির উল্লেখ করে পরমাণুর পরিমাণগত দিকটি পাঠকের গোচরে আনছি ;

"সপ্তপরমাণু রজাংসিরেণু। সপ্তত্রুটিরেকং বাতায়নরজঃ। সপ্ত-বাতায়ন-রজাস্যেকং শশরজঃ। সপ্তশশরজাস্যেকং মেডকরজঃ। সপ্তমেডক রজাংস্যকং গোরজঃ। সপ্তগোরজাংস্যেকং লিক্ষারজঃ। সপ্তলিক্ষারজঃ সর্ষপঃ। সপ্তসর্ষ-পাযব ঃ। সপ্তযবা অঙ্গুলোপর্ব্ব। দ্বাদশাঙ্গুলো পর্ব্বাণি বিতস্তি।

* "The argument places the work between 300 to 450 B. C. and a greater certainty is at present unapproachable" *Lalitavistāra*, introduction by R. L Mitra, p. 56

শ্বোবতস্তো হস্ত। চত্বারহস্তা ধনুঃ। ধনুসহস্রং মাগধক্রোশঃ। চত্বারঃ ক্রোশ যোজনং। তত্রকো যুষ্মাকং যোজনা পিন্ডং প্রজানাতি।"*

এই সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে 'পরমাণু' থেকে শুরু করে যে-সব একক-এর কথা বলা হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া যাক :

7 পরমাণু রজ	=	1 রেণু
7 রেণু	=	1 ত্রুটি
7 ত্রুটি	=	1 বাতায়ন রজ
7 বাতায়ন রজ	=	1 শশ রজ
7 শশ রজ	=	1 এড়ক রজ
7 এড়ক রজ	=	1 গো রজ
7 গো রজ	=	1 লিক্ষা রজ
7 লিক্ষা রজ	=	1 সর্ষপ
7 সর্ষপ	=	1 যব [যবের প্রস্থ]
7 যব	=	1 অঙ্গুলি পর্ব
12 অঙ্গুলিপর্ব	=	1 বিতস্তি
2 বিতস্তি	=	1 হস্ত
4 হস্ত	=	1 ধনু
1000 ধনু	=	1 ক্রোশ
4 ক্রোশ	=	1 যোজন

বোধিসত্ত্ব এক যোজন দৈর্ঘ্যে পরমাণুরজের গণনা করেছেন, এবং সংখ্যাটি পনেরোটি অঙ্কবিশিষ্ট। কিন্তু সংখ্যার বিশালত্ব বিবেচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, আমরা পরমাণুর পরিমাণগত দিক অর্থাৎ এর সাংখ্যিক দিকটি জানতে এই বিষয়ে মূল দর্শন ও ভাষ্য গ্রন্থগুলি আমাদের বিশেষ সহায়তা করে না। আমরা প্রধানত আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের *The Positive Sciences of the Ancient Hindus* গ্রন্থের ৮২-৮৪ পৃষ্ঠার সাহায্য নিয়েছি। যাই হোক, 'ললিতবিস্তার'-এ প্রাপ্ত তালিকা থেকে একটি পরমাণুর ব্যাস পাওয়া যায় :

$$1{\cdot}32\times7^{-10} \text{ ইঞ্চি}$$

অবশ্য বর্তমানে এই ব্যাস এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে প্রকাশ করার রীতি

* Lalitvistāra edited by R L Mitra p. 162

প্রচলিত নয় ; এখন সি. জি. এস. পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে পরমাণুর ব্যাস ধরা হয়।

2×10^{-8} সেমি.

প্রাচীনকালের নিরিখে ভারতীয় তত্ত্ববিদদের, গণিতজ্ঞ ও দার্শনিকদের পরমাণুর পরিমাণগত দিকের ধারণাটি একেবারে তুচ্ছ করার মত নয় বলে ধরা যেতে পারে।

ন্যায়-বৈশেষিকের ত্র্যসরেণুর আয়তন

কি প্রাচীন ধারণায়, আর কি বর্তমান ধারণায়, পরমাণু সর্বকালেই অতিক্ষুদ্র, অদৃশ্য। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বহু গ্রন্থে এটি একটি মূল একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থেও এই একক দেখা যায়, আবার শিল্পশাস্ত্রেও দেখা যায়। আমরা এখানে বরাহমিহিরের **'বৃহৎসংহিতা'** থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি :

"পরমাণুরজোবালাগ্রলিক্ষযূকং যবোঽঙ্গুলং চেতি অষ্টগুণানি যথোত্তরম্ অঙ্গুলমেকং ভবতি সংখ্যা।" [Chap LVII SL 2]। উদ্ধৃতাংশ থেকে নিম্নলিখিত তালিকা পাওয়া যায় :

8 পরমাণু	=	1 রজ = রথরেণু
8 রজ	=	1 বালাগ্র = 1 ইঞ্চির $3\cdot2^{-14}$ অংশ
8 বালাগ্র	=	1 লিক্ষা
8 লিক্ষা	=	1 যূকা
8 যূকা	=	1 যব
8 যব	=	1 অঙ্গুলি
24 অঙ্গুলি	=	1 হস্ত

এই তালিকা থেকে ত্র্যসরেণু যা কিনা গবাক্ষপথের আলোর ধূলিকণায় দৃশ্যমান হয় তার বেধ নির্ণয় করা হয়েছে :

$3\cdot2^{-20}$ ইঞ্চি

অথবা

1 ইঞ্চির $\frac{1}{349525}$ অংশ

গোলীয় ত্র্যসরেণুর আয়তন

$$=1 \text{ ঘন ইঞ্চির } \frac{4}{3}\cdot \pi.3^{3}.2^{-64} \text{ অংশ}$$

ন্যায়-বৈশেষিকে পরমাণুর পরিমাণকে 'পারিমাণ্ডল্য' বলা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে পরমাণুর আকার গোলীয় (spherical)। ন্যায়-বৈশেষিকে পরমাণু অতিক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় যা যে-কোন অতিক্ষুদ্র রাশির চেয়েও ক্ষুদ্র অর্থাৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তা হলে গোলীয় পরমাণুর ব্যাস এক ইঞ্চির 3.2^{-20} অংশের চেয়ে ছোট বলে অনুমান করা যেতে পারে।* দ্বিতীয় ভাস্করাচার্যের সূত্রের সাহায্যে বলা যায় যে, পরমাণুর আয়তন এক ঘন ইঞ্চির [$\pi.\ 3^{2}.\ 2^{-61}$] অংশের চেয়েও কম (এখানে $\pi=\frac{3927}{1250}$)। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আচার্য শীলের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : That these were conventional measures arbitrarily assumed goes without question, for of course the Hindus had no physical data for a mathematical calculation of these minute quantities**

তথ্যসূত্র ও টীকা

১। যেমন, বেদবাদীরা বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আয়ুর্বেদের সাহায্য নিয়েছেন, অপৌরুষেয় বেদের প্রমাণ প্রতিষ্ঠায় আয়ুর্বেদের সাহায্য গ্রহণ বিস্ময়কর হলেও এবং দার্শনিক দিক থেকে তা সফল না হলেও যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের তথ্য অবলম্বণে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা,—এটাই আমাদের লক্ষনীয়। চার্বাকরা বেদের নিন্দা করে বলেন,—ধূর্ত ব্রাহ্মণরা অল্প শিক্ষিত যজমানদের পুত্র না হলে 'পুত্রীয়েষ্টি' যজ্ঞ করতে বলেন। কিন্তু দেখা যায়, এই যজ্ঞ করেও পুত্রলাভ হয় না। এতে বেদের প্রামাণ্য লঙ্ঘিত হয় অর্থাৎ বেদ প্রমাণ বলে আর গৃহীত হতে পারে না। কিন্তু ধূর্ত ব্রাহ্মণরা বলেন,—পুত্র না হওয়ায় বেদের কোন ত্রুটি নেই। এই ত্রুটি নরের দোষে, নয় নারীর দোষে অথবা

নর-নারীর বিপরীত সঙ্গমের জন্য। এই যুক্তি থেকে দেখা যাচ্ছে, বেদের প্রামাণ্য আয়ুর্বেদের আলোকে করা হয়েছে, বেদের নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায়।

২। সার্টন, জর্জ—'প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড, পৃ-৩৯৯; Farrington, *Greek Science*, P. 62

৩। দ্বান্দ্বিকতার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ হলো এতে বিরোধী-সমাগম ঘটে, পরিমাণ থেকে গুণ ও গুণ থেকে পরিমাণে উত্তরণ ঘটে, আর এতে নিয়ম ভাঙার নিয়ম বিদ্যমান থাকে। আমরা শেষের লক্ষণটিকেই 'খণ্ডনের খণ্ডন' বলছি। গণিত থেকে একটা উদাহরণ দিই : আমরা জানি, "দুটি সংখ্যার যোগফল তাদের যে-কোন একটির থেকে বৃহত্তর কিন্তু সংখ্যা দুটির একটি শূন্য বা ঋণাত্মক হলে স্পষ্টতই ঐ নিয়ম খাটে না। সাধারণ নিয়মগুলি পরিবর্তিত করার পর তবেই নতুন সংখ্যা সংযোজন করা গিয়েছিল। অনিবার্যভাবেই সংখ্যার ধারণার আরও সম্প্রসারণ ঘটেছে, যেমন, ঋণাত্মক ১-এর বর্গমূলের সহিত জড়িত জটিল রাশি, দিকবিশিষ্ট ভেক্টর, কোয়াটারনিয়ম, গ্যালয় (galois) রাশি এবং আরো বহু।"—হলডেন,—'বিজ্ঞান ও মার্ক্সীয় দর্শন, পৃ-৩৩; Engles, F—*Anti-Dühring*, p 159-174; এই সূত্রটি সম্পর্কে এঙ্গেলসের উদ্ধৃতি না দিলে গুরুত্বটি উপলব্ধি করতে বিলম্ব হতে পারে। সে-কারণে অল্প একটু বলা যাক : "...What is the negation of negation? An extremely general—and for this reason extremely far reaching and important—law of development of nature history and thought; a law which ...holds good in the animal and plant kingdoms, in geology, in mathematics, in history and in philosophy..." Ibid p 172

৪। "...the philosophy of antiquity was primitive, natural materialism"—*Anti-Dühring*, p 69

৫। চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র,—'ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন', পৃ-১২৪; কণাদ নাকি 'নাড়ি-বিজ্ঞান' লিখেছিলেন, SHSI p. 115

৬। 'বৃহদারণ্যক', ৪।২।২; ঐতরেয়', ৩/১৪

৭। Bernal, J. D.—*Science in History*, p 266

৮। Ramanna, R—*Sanskrit and Science*, p 25 table-1

৯। Ibid p 10

১০। রায়, প্রিয়দারঞ্জন—'বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম', পৃ-৩-৪

১১। তদেব, পৃ-৫-৬

১২। বিস্তারিত বিবরণ Indian Atomism, p. 59-60 দ্রষ্টব্য

১৩। Winterniz, M—*History of Indian Literature*, Vol-III, part-II 531, translation by Subhadra Jha

১৪। "It is interesting that the bootstrap idea which is usually taken to be one of the most witty and unexpected inventions of modern Theoretical physics, was conceived already by ancient scholars. It is referred to for instance, in Buddhist texts written several centuries before our era"—*Einstein and the philosophical problems of 20th-Century Physics*, P. 324 fn. 10

১৫। Chattopadhyaya, D—*History of Science and Technology in Ancient India*, p. 398-402

১৬। চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে', পৃ-১৩৯

অষ্টম অধ্যায়

অবক্ষয় ও অপমৃত্যুর কারণ

বিজ্ঞানের উন্নতি-অবনতির সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থা, সামাজিক চাহিদা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক কাঠামো বলতে আমরা এর মূল কাঠামো অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থা এবং ওপর কাঠামো অর্থাৎ ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি মনন-প্রকৃতির সঙ্গে এর ঘাত-প্রতিঘাতের জটিল প্রক্রিয়া বুঝি। বস্তুত, কোন দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি-অবনতি বা আবিষ্কার ইত্যাদির কথা জানতে হলে ওইসব বিষয়েরও জটিল বিশ্লেষণ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে পথ-নির্দেশ করা গেলেও বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে সুস্পষ্ট বা সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয় বা সে-রকম করা গেলেও সর্বাদিসম্মত হবে কিনা, এ-বিষয়ে ঘোরতর সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। যেমন, ভারতীয় বিজ্ঞানের উজ্জ্বল-অনুজ্জ্বল দিকের আলোচনায় এরকম সুস্পষ্ট প্রয়াস চোখে পড়ে না। আজ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানের যে যে শাখায়—চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বই লেখা হয়েছে, তাতে তালিকা প্রস্তুতি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। অবশ্য স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হয় যে, অভিযোগ করা সহজ বা সঙ্গত হলেও উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া কঠিন। তার অন্যতম প্রধান বাধা সম্ভবত প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস—উৎপাদন শক্তির সহিত চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতির নিবিড় সংযোগের উৎস ও সূত্রের একান্ত অভাব। প্রচলিত ইতিহাস যতটা না তথ্যসমন্বিত, তার চেয়ে বহুগুণে মিথ ও কল্পাশ্রিত। বস্তুতপক্ষে, আমাদের দেশে বস্তুবাদী চিন্তাধারার এখনো কোন ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়নি। তবুও সার্বিক না হলেও প্রাথমিক প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে, পর্যাপ্ত না হলেও 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'।[১]

বিজ্ঞান যেহেতু অনায়াসে ভূগোলের সীমা অতিক্রম করে, তাই তুলনা-মূলক আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবক্ষয় ও অপমৃত্যুর কারণ অন্বেষণ করলে কিছুটা ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়,

আমাদের এই ছোট বই-এ তার আভাস ও ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। আমরা প্রধানত তিনটি বিষয় অবলম্বনে ভারতীয় বিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনার অপমৃত্যুর কারণ অন্বেষণ করবঃ 'বিজ্ঞান ও ধর্ম', 'বিজ্ঞান ও দর্শন' ও 'বিজ্ঞান ও রাজনীতি'। এই তিনটি বিষয়ের ভেতরেই সমাজ ও অর্থনীতি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলে এগুলি আর পৃথকভাবে আলোকিত হলো না।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

একটি কথা বোধ হয় অনেকে স্বীকার করবেন যে, ভাববাদ তথা অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ বর্তমান। বস্তুত, ওদের মূলেই বিরোধ। এই কথাটি মনে করলে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্কটি অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ভাববাদীদের কেউ কেউ প্রচার করে আসছেন যে, বিজ্ঞানে ও ধর্মে অহিনকুল সম্পর্ক নেই। বর্তমানে দেশের নানা প্রান্তে প্রবলপ্রতাপ সাধু, বাবা, স্বামীজী ইত্যাদি অনেকে এই পথ ধরেছেন, এবং সভা-সমিতিতে বিজ্ঞান-ধর্মে 'হরিহর আত্মা' প্রচার করে চলেছেন। তাঁরা ভেতরের জগৎ আর বাইরের জগৎ এই দুটি ভাগ করে নিয়ে দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানের কারবার বাইরের জগৎ,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নিয়ে; তার মূল লক্ষ্য সত্যান্বেষণ। ভেতরের জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত; তার লক্ষ্যও সত্যান্বেষণ। কিন্তু বাইরের জগতের সত্যান্বেষণের মূল্যের চেয়ে ভেতরের জগতের সত্যান্বেষণের মূল্য বেশী—অনেক অনেক বেশী। এইসব প্রচারে তাঁরা প্রায়শ বেদ-উপনিষদ থেকে শ্লোকাংশ উদ্ধৃতি দিয়ে ভাববাদের পরাকাষ্ঠা দেখান। আবার, বস্তুবাদের সামাজিক মর্যাদা এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় গবেষণারত প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরাও একই পথ অবলম্বন করে চলেছেন। বস্তুত, আমাদের দেশের বহু বিজ্ঞানী কুসংস্কার ও ভাববাদে এমন সমাচ্ছন্ন যে, বস্তুতান্ত্রিক-ভাবে তাঁদের চিন্তাধারা বেশীদূর অগ্রসর না হওয়ায় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন না। অবশ্য নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়, তবে অন্যতম প্রধান কারণ বলে অনুমান করা যায়। এখানে আমরা ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদের মানসিকতা বিশ্লেষণ করব যাঁর বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধার অভাব নেই; তিনি হলেন ডি. এস. কোঠারী।

সাহা স্মরণে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু 'পরমাণু ও আত্মা' (*Atom and Self)*। খুবই বিস্ময়ের কথা, আগাগোড়া সমগ্র আলোচনায় তিনি ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে নানা অসম্ভব, অবৈজ্ঞানিকোচিত উক্তি করে গেছেন। যেমন, তাঁর কাছে মূল সমস্যা বা প্রশ্ন হলো দেহ ও মনের মিথষ্ক্রিয়াজনিত সমস্যা '[problem of mind-body interaction' p. 8]। পরমাণু ও আত্মার মিথষ্ক্রিয়ার সমস্যার চেয়ে তাঁর কাছে আর কোন গভীর, মৌল, বিমূঢ়, আশ্চর্যজনক সমস্যা নেই। এই পরমাণু ও আত্মারই অপর নাম মন-মস্তিষ্ক বা দেহ-আত্মা সমস্যা। তাঁর দেহ-আত্মার সমস্যার উৎসের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার ভিত্তিতে পদার্থবিদদের নব নব আগ্রহ ও শেরিংটন, শ্রোয়েডিংগার, উইগার, একক্লেস, পপার প্রমুখের লেখায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তারপর শ্রোয়েডিংগারের 'আমরা কে?' *(Who are we?)* থেকে শুরু করে কঠোপনিষদের নচিকেতার আমি কে তথা সত্যের আশ্রয় কি-তে এসে ভাববাদী আলোকে সত্যান্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। 'ইলেকট্রন কি' আর 'আমি কে'—এই দুটি প্রশ্নকে বহির্জগত ও অন্তর্জগতে ভাগ করে পরমাণু অস্ত্রের বিভীষিকা থেকে মানবজাতিকে ত্রাণ করার উপায় হিসাবে আত্মা বোঝা বা উপলব্ধির প্রতি গভীর স্থাপন করেছেন যুক্তি-তর্ক-বিচার বিশ্লেষণ বিসর্জন দিয়ে, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি সব-কিছু অগ্রাহ্য করে। বস্তুত, তাঁর এই ভাষণের প্রতি পাতায় ভাববাদের মাহাত্ম্য ঘোষণা; এমন কি, বহু আপত্তিকর উক্তিও চোখে পড়ে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তার বিকাশ-সমৃদ্ধির কথা ভাবলে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের স্বরূপ, প্রকৃতি বিবেচনা করলে যে, উভয়ের সংশ্লেষ, সংযোগ সম্ভব নয়, একথাও অধ্যাপক কোঠারী বেবাক বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থপঞ্জীতে ভাববাদী বই ছাড়া বস্তুবাদী বই-এর কোন উল্লেখ নেই। মনে হয়, তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সযত্নে ও সচেতনভাবে এড়িয়ে গিয়ে একদর্শী আলোচনা করে গতানুগতিকতা বজায় রেখে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চেয়েছেন। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রখ্যাত এই বিজ্ঞানী যিনি বিশ্রুত অধ্যাপক সাহার স্নেহ-ভাজন ছাত্র ছিলেন তাঁর ওয়ালেশ-ক্রকস প্রমুখের মত এক ধরনের প্রেতচর্চা বিস্ময়কর। বস্তুত, তিনি গুরুদেব অধ্যাপক সাহাকে চিনতে পারেননি। অধ্যাপক সাহা তাঁকে দর্শন পড়তে বলে ভুল করেননি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক কোঠারী সে-কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেননি।[২]

কেবল অধ্যাপক কোঠারীই নন, আমাদের দেশের অনেক প্রখ্যাত মানুষ এখনো ভাববাদের শিকার। হায়দ্রাবাদের সেণ্টার ফর সেলুলার অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজির অধিকর্তা ডঃ পুষ্প ভার্গব 'কেন, কেন, কেন—এই সব ???' প্রবন্ধে তার একটি তালিকা দিয়েছেন,—"What else would one expect when Ministers and other senior politicians, senior scientists such as a past Scientific Adviser to the Ministry of Defence, Secretaries to the Government of India and to the state Governments (and other senior civil servants), educationists occupying senior positions such as many Vice-Chancellors and Chairman of the University Grants Commission and prominent citizens, believe in one godman on another, specially in their miraculous and magical powers ?"[৩] ওর কারণস্বরূপ তিনি লিখেছেন—"the bread and butter of the privileged is the exploitation of the unprivileged in our country.[৪]

বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে অহিনকুল সম্পর্ক, একেবারে পারস্পরিক বিপরীত মেরু সম্পর্ক সে-সম্পর্কে দেশের কোন কোন বিজ্ঞানী সচেতন সন্দেহ নেই। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডঃ এইচ. নরসিমাইয়ার নাম করতে পারি। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার রায়চৌধুরী 'ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চোখে ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে তাঁদের সারসংক্ষেপ যা লিখেছেন, আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম : "বিজ্ঞান বলে, 'সংস্কার ছাড়ো' ; ধর্ম বলে, 'সংস্কারই ধর্ম'। বিজ্ঞান বলে, ওষধ খাও, 'রোগ সারবে' ; ধর্ম বলে, 'চন্নমেত্য খাও, ওতেই কাজ দেবে'। বিজ্ঞান বলে, 'বারবার চেষ্টা করো, একদিন সাফল্য লাভ করবেই' ; ধর্ম বলে, 'কপালে যা আছে, তাই হবেই, চেষ্টা করে কোন লাভ নেই'। বিজ্ঞান বলে, 'যাওনা দেখি, কি অঘটন ঘটে', ধর্ম বলে, 'ও বাব্বা, পাঁজি বলছে, যাত্রা নাস্তি'। বিজ্ঞান বলে, 'আমি যুক্তিবাদী,' ধর্ম বলে, 'আমি বিশ্বাসবাদী'। বিজ্ঞান বলে, 'শব্দদূষণ ক্ষতিকারক' ; ধর্ম বলে, 'শব্দ ব্রহ্ম, ঢাক-ঢোল-কাঁসি-ঘন্টা জোরসে বাজাও'। বিজ্ঞান বলে, 'নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো' ; ধর্ম বলে, 'ভগবানে বিশ্বাস রাখো'।"[৫] যাই হোক, এদেশের কোন কোন বিজ্ঞানী এই সমস্যা তুলছেন বটে, কিন্তু অনেকেই তেমন সোচ্চার নন। সেদিক থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব সমস্যাটির নানাদিক বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেছেন

তাঁর সাম্প্রতিক *History of Science and Technology in Ancient India* গ্রন্থে।

বিজ্ঞান ও ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি আরো কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাই এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ধর্মের মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস, নিছক বিশ্বাস এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অতিপ্রকৃত শক্তির অঙ্গুলি হেলনে চালিত হয়, আর এই 'গভীর গম্ভীর গহণ' শক্তির কাছে প্রার্থনা বা বলিদান করে তাকে সন্তুষ্ট করা যায়। কিন্তু সেই শক্তির আমাদের ওপর কেন এত কঠিন রাগ, তা 'নিহিতং গুহায়াম্'। এই শক্তিকে জানার একমাত্র উপায় হলো চোখ বুজে সব ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ করে একেবারে অচেতন করে দিয়ে বিশ্বাস করা। জ্ঞানের দ্বারা কিসসু হবেনা—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'। সুতরাং ধর্ম এমন এক প্রক্রিয়া যার মূলে বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নেই—একেবারে নির্ভেজাল মৌলের মত। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছে, না মানুষ ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে বা কেন করেছে, ধর্মের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করলে এর উত্তর পাওয়া সহজ ; এবং সিদ্ধান্তে আসা মোটেই কঠিন নয় যে, ঈশ্বরের ওপর আস্থা মানেই মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার প্রকাশ। ডঃ নরসিমাইয়া টমাস পাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন,—"To argue with a man who has renounced the use of authority of reason is like administering medicine to the dead."[৬]

বিজ্ঞান এমন এক প্রক্রিয়া যার মূলে আছে এই চিন্তাভাবনা যে, বিশ্ব-প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত বস্তুগত বিকাশপদ্ধতি। মানুষ এই বিকাশ-পদ্ধতি যে-পরিমাণে আয়ত্ত করতে পারবে, সেই পরিমাণে তাকে প্রভাবিত করতেও পারবে। বিজ্ঞানে নেই শেষ সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞান ক্রমবিকাশমান।[৭] বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রামাণ্য জ্ঞান ; ধর্মে কেবল অন্ধবিশ্বাস, বিচারহীন, বিশ্লে-ষণহীন। এখানে রবার্ট জি. ইংগারসোলের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করা খুবই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় : "Let reason alone. Count your beads. Ask no questions. Fall upon your knees. Shut your eyes and save your souls."[৮] ধর্ম এটা মানে না যে, "প্রকৃতি ও মানুষের বাইরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই এবং আমাদের ধর্মীয় উৎকল্পনায় যে-সব উচ্চতর সত্তা উদ্ভাবিত হয়েছে, তারা হল আমাদের নিজেদেরই সত্তার কাল্পনিক প্রতিবিম্ব মাত্র।"[৯]

বিজ্ঞান ও ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতির এই আলোচনার আলোকে এবার আমরা ভারতীয় বিজ্ঞানে ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও তার ফলশ্রুতি উপস্থাপিত করব।

আপাত বিস্ময়কর মনে হলেও প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী ধারণা ছিল; এবং চার্বাকদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করলেও ঋগ্বেদ ও উপনিষদের যুগে বস্তুবাদ একেবারে অপ্রতুল ছিল না। ঋগ্বেদের যুগের বস্তুবাদ বা বস্তুবাদ ঘেঁষা মতাদর্শের উল্লেখ আমরা প্রথম অধ্যায়েই করেছি বলে এখানে আর সে-আলোচনায় গেলাম না। কিন্তু উপনিষদের যুগেও এর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট আদর্শ লক্ষ করা যায়—বিশেষ করে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণির মধ্যে। বিখ্যাত ইয়াকোবি ও রুবেন এ-বিষয়ে যে আলোচনা করেছেন, তা সত্যই বস্তাপচা রাশি রাশি ভাববাদী লেখার মধ্যে আলোক-বর্তিকাস্বরূপ। এখানে ওয়াল্টার রুবেনের গবেষণা কর্মের সামান্য বিবরণ দেওয়া যাক।

তাঁর মতে, ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণি প্রথম ভারতীয় দার্শনিক ও আদি বস্তুবাদী (*hylozoist*—primitive materialist)। প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু আরুণি ও যাজ্ঞবল্ক্যকে কেন্দ্র করে। এই সময় গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়েকটি ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। তখন শ্রেণী সংগ্রামের সূচনা দেখা যায়, আর ভাববাদ বা আদর্শবাদের মধ্যে নানা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় যা কিনা বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও অনুষ্ঠান এবং এসবের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে স্পষ্ট হয়। এই সময় বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্রের প্রতি সংশয়-বিরুদ্ধতা, ব্রহ্মহত্যা-পরাধীদের সমালোচনা করা হয়। এমন কি, বৈদিক দেবতাদের দৈত্যদের বিরুদ্ধে কাব্যিক-পৌরাণিক যুদ্ধের প্রতিও তীব্র সমালোচনা করা হয়। সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রাধান্যের, ক্ষমতার দ্বন্দ্বও এই যুগে পরিলক্ষিত হয়। এই সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের মত বিজ্ঞান ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকে, আর প্রকৃতিবিদরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে। এই যুগেই জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, আইন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির সূচনা হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আলোচনা: সচেতনভাবে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেয় সর্বক্ষেত্রে। যদিও এই যুগে বিজ্ঞান—বিজ্ঞান-চেতনা বা মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায় না, তবুও সামাজিক ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে, ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু

হয়। উদ্দালক আরুণি তাঁর নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার উন্মেষ তাঁর দর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন, এবং তাঁর মতবাদ বিচার ও সাদৃশ্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, উদ্দালক আরুণি ভারতে বস্তুবাদ ও বিশ্লেষণের রীতি—'অনুমান', 'দৃষ্টান্ত' প্রভৃতির পথিকৃৎ বলে গণ্য হতে পারেন।

বিশ্ব মনস্বিতার জগতে কোন ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। বস্তুত, দু-এক শতাব্দীর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হলেও বিশ্ব-মনীষার জগতে এক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সমান্তরাল চিন্তাধারার প্রবাহ দেখা যায়। অবশ্য 'অদ্ভুত' ও 'বিস্মষকর' বলে আপাত প্রতিভাত হলেও বস্তুবাদের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করলে তা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। তাই উদ্দালকের মানসিকতা, চিন্তাভাবনার সহিত তাঁর কিছু পরবর্তী গ্রীক দার্শনিক থ্যালেসের অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখা যায়, আবার একই ধরনের বস্তুবাদের প্রারম্ভ চীনা দর্শনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাববাদের সহিত তুলনা করা যেতে পারে ইলিয়াটীয় পারমেনাইডিসের, এবং প্রাচীনতম চীনা ভাববাদের।[১০]

বস্তুতপক্ষে, এই উদ্দালকীয় ধারণার ওপর প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হওয়ায় তার বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্ভবপর হয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের অগ্রগতি এমন প্রতিশ্রুতিময় হয়েছিল যে, পরবর্তী সময়ে এর অবক্ষয় ও অধঃপতনের কারণ খুঁজতে অনেকে দিশেহারা হয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ, চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ধরা যেতে পারে। 'চরক সংহিতা'-য় যুক্তি-ব্যপাশ্রয় ভেষজ'-এর আয়োজন ও পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। এই সংহিতায় ঔষধ হিসাবে সেবনের দীর্ঘ তালিকায় বিশেষ রোগ "নিরাময়ের উদ্দেশ্যে গোমাংস জাতীয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যের ওপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।"[১১] শ্রুতি-স্মৃতির খোজা-নজরদারী এড়িয়ে এমন দুঃসাহসী তথ্য বিজ্ঞানের স্বার্থে বলার মত বুকের পাটা কেবল প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন বস্তুবাদীদের ছাড়া আর কারুর হবে বলে মনে হয় না। তবে এ-সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে।

গত তিরিশ বছরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এমন কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত না করা গেলেও আলোচ্য

বিষয়ে কিছু আলোকপাত করে। কুরুক্ষেত্র জেলার ভগবানপুরা ও লুধিয়ানা জেলার দাধেরিকে আমাদের আলোচনায় গ্রহণ করা যেতে পারে। ভগবানপুরায় আবিষ্কৃত নিদর্শনের কাল খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০-এর মধ্যে পড়ে যা কিনা আশ্চর্যজনকভাবে ঋগ্বেদের যুগের অন্তর্গত।[১২] ভাগলপুরা সরস্বতী নদীর কূলে, আর দধেরিও সপ্ত সিন্ধুর মধ্যে পড়ে। এই দুটি স্থানেই উৎখননের ফলে পশুর হাড় বেশ-কিছু পরিমাণ পাওয়া গেছে। এখানে গোবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগলের এমন কিছু হাড় পাওয়া গেছে যা থেকে বলা যায় তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। গোবাদি পশু, ভেড়া ও ছাগল কেবল দুধের জন্যই পালিত হতোনা, তা খাদ্য হিসাবেও গ্রহণ করা হতো। ঋগ্বেদের যুগের মানুষ যে প্রধানত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকায় ও পশুপালক হওয়ায় পরস্পর লড়াই করত গোবাদি পশুর জন্য, তা তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ, যেমন, 'গোবিষ্টি, 'গবেষণা', 'গোষু', 'গব্যৎ' ইত্যাদি থেকে জানা যায়।[১৩] তা ছাড়া পরবর্তী বৈদিক যুগেও যে গোমাংস খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হতো, অত্রাঞ্জিখেরায় উৎখনন চালিয়েও তা প্রমাণিত হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত গোবাদি পশু ও অন্যান্য পশুর হাড়ে কাটা-চিহ্ন থেকে তা স্পষ্ট হয়। হস্তিনাপুর থেকেও বাছুর ও পশুশাবকের হাড়ও প্রমাণ করে তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হতো। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে গো ও অন্যান্য পশু 'বলি' হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হতো, এবং বৈদিক আর্যদের জীবনে পশুখাদ্য অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল।[১৪] ক্রমে কৃষির গুরুত্ব বৃদ্ধি ও বৌদ্ধধর্মের, জৈনধর্মের প্রভাবে নির্বিচারে পশুহত্যা, বিশেষত গো-হত্যা নিষিদ্ধ হতে থাকে। এ-বিষয়ে 'ব্রাহ্মণধম্মিকা সুত্ত'-এ নিষেধাজ্ঞা দেখা যায়। এই সম্পর্কে বলা যায় যে, লাঙলে লোহার ফলার ব্যবহারের ফলে কৃষির গুরুত্ব ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় 'আবেস্তা'তেও অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়।[১৫] তাই বলা যায়, চরকের সময় কৃষির প্রয়োজনে ব্যাপক গোহত্যা নিষিদ্ধ হলেও খাদ্য হিসাবে, অন্তত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে গোমাংস ভক্ষণ চলতে পারত। আর তা আর্য খাদ্যাভ্যাসের পরিপন্থীও ছিল না। চরক নিঃসন্দেহে বস্তুবাদী-ঘেঁষা বিজ্ঞানী, কিন্তু গোমাংস প্রেসক্রিপশনে তাঁর দুঃসাহসী হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যায় না, যদি না মনুর পরে তিনি বর্তমান থাকেন।

আয়ুর্বেদের আকর গ্রন্থ চরক-সুশ্রুত সংহিতাও ভূতচৈতন্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এছু বাহ্য, শবব্যবচ্ছেদ ছাড়া যে শল্যচিকিৎসার জ্ঞান সম্পূর্ণ

হয় না, তা সুশ্রুত সংহিতায় স্বীকৃত। সুশ্রুতের মতে, শবব্যবচ্ছেদ না করে প্রকৃত ভিষক অর্থাৎ চিকিৎসক হওয়া যায় না। এই সম্পর্কে তাঁর অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে : "ত্বক্ পর্যন্ত সমস্ত দেহের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উক্ত হইয়াছে, শল্যজ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার কোন অঙ্গ বর্ণন করিতে পারা যায় না। অতএব শল্যাপহর্তা যদি নিঃসংশয় (সন্দেহরহিত) জ্ঞান লাভের ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে একটি মৃতদেহকে শোধন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকল সম্যক্‌রূপ দর্শন করা তাঁহার কর্তব্য। যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় এবং যাহা শাস্ত্রে দেখা যায় তদুভয়ই উভয় বিষয়ে সহজে অধিকতর জ্ঞান বর্ধন করিয়া থাকে।" কোন ধরনের মৃতদেহ নিয়ে কিভাবে, শবব্যবচ্ছেদ করতে হবে, তার বিবরণ সুশ্রুত সংহিতায় সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা শারীর স্থান, পঞ্চম অধ্যায় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুবাদ অনুসরণ করছি : "শবটির যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, তাহা যেন বিষোপহত না হয়, দীর্ঘকাল ব্যাধিপীড়িত না হইয়া থাকে, শতবৎসর বয়স্কের দেহ না হয়। এইরূপ শবের অতঃপুরীষ নিষ্কাষিত করিয়া কোন নির্জন প্রদেশে তাহা একটি স্রোতহীন জলাশয়ে পচাইবে। মৎস্যাদিতে ভক্ষণ করিতে না-পারে এবং অন্য কোথাও সরিয়া না যায়, এইজন্য সেই জলাশয়ের জলের মধ্যে একটি মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঐ শবকে রাখিতে হইবে, এবং মুঞ্জ বল্কল কুশ ও শণাদি রজ্জুর কোন রজ্জুদ্বারা তাহার সর্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে হইবে। সাতদিনের মধ্যেই উহা সম্যক পচিবে, তখন উহাকে তুলিয়া বেণারমূল, চুল, বাঁশের চেয়াড়ী বা কুঁচী দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া ত্বগাদি সমস্তই অর্থাৎ যথোক্ত বাহ্যাভ্যন্তর অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে।" কিন্তু যজুর্বেদের যুগ থেকেই শাস্ত্রকাররা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নানা ধরনের রকেট হানতে লাগলেন। যজুর্বেদে ঘোষিত হলো : 'অপূতৌ বা ইমৌ'—দেবতাদ্বয় অপবিত্র। কিন্তু অপবিত্র কেন? 'মনুষ্যচরৌ ভিষজৌ ইতি'—চিকিৎসক দেবতাদ্বয় ইতরজনের সঙ্গে বড় বেশী মাখামাখি করে। অথচ অথর্ববেদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেমন অনেক কথা আছে, তেমনি ঋগ্বেদেও 'ওষধি' সম্পর্কে স্তুতি দেখতে পাওয়া যায় ১০।৯৭ সূক্তে। এই সূক্তের কয়েকটি ঋকের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হলো এইজন্য যে, পরবর্তী যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি ব্রাহ্মণদের যে অবৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শিত হয়েছে, তা বিশেষভাবে অনুধাবন করা যাবে।

"হে পুষ্পবতী ফলপ্রসবকারিনী ওষধিগণ! তোমরা রোগীর প্রতি

সন্তুষ্ট হও। তোমরা ঘোটকের ন্যায় জয়শীল মৃত্তিকাতে জন্মগ্রহণ কর, রোগীকে রক্ষা কর।"—১০।৯৭।৩

"হে দীপ্তিশালী ওষধিগণ! তোমরা জননী স্বরূপা। তোমাদের সমক্ষে আমি স্বীকার করছি যে আমি চিকিৎসক ব্যক্তিকে গো, অশ্ব, বস্ত্র এমন কি আপনাকে পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।"—১০।৯৭।৪

"যেমন রাজাগণ যুদ্ধে একত্র হন সেরূপ যে ব্যক্তির নিকট ওষধিগণ মিলিত হয় অর্থাৎ যে ওষধি জানে সে বুদ্ধিমান ভিষক্ ব্যক্তিকে চিকিৎসক বলে, সে রোগদের ধ্বংস করে।"—১০।৯৭।৬

কিন্তু ক্রমশ আপস্তম্ব, মনু, কল্লুক ভট্ট, মেধাতিথি প্রমুখ বস্তুবাদ তথা প্রকৃতিবিজ্ঞানের ঘন্টাধ্বনি করলেন সুবিধাবাদের চরম অবস্থায় অবস্থান করে। ফলত, ন্যায়-বৈশেষিক ভাববাদের শ্রীচরণে প্রণিপাত করতে বাধ্য হলো : দশম শতাব্দীর উদয়নের পরমাণুর হাস্যকর উৎস সন্ধানেই তার প্রমাণ। আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য মানুষের 'আত্মানং বিদ্ধি'-র চরম অন্তরায়।

বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই—আছে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ। কিন্তু ধর্মে স্বাধীন চিন্তা, মৌলিক ভাবনা—জিজ্ঞাসার গলা টিপে ধরে বলা হয় "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" অর্থাৎ সব কর্ম, সব চিন্তা, সব ভাবনা জিজ্ঞাসা ভুলে গিয়ে কেবল আমি যা বলি তাই কর, কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" "হরি হরি" "রাধাকৃষ্ণ" ইত্যাদি বললেই তরে যাবে, নিত্য বৃন্দাবনে হাজার গোপীদের সঙ্গে রসবিলাসকেলি করতে পারবে ; মুক্তি, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠ এবং আরো বিধিব লোক প্রাপ্ত হবে ; এখানে এই ধূলোয় ভরা, হাসিকান্নার পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়ের প্রায় সব দ্বার বন্ধ করে যত কৃচ্ছ্রসাধন করবে, নির্যাতিত নিপীড়িত হবে, সুবিধাভোগীদের পরমান্ন তুলে দিতে পারবে, বিষয় সম্পত্তি, টাকা-কড়ি, দেহ-আত্মা-মন, এমন কি স্ত্রীকে পর্যন্ত দিয়ে বুড়বাক হতে পারবে, তার চেয়ে অনেক বেশী—গুণোত্তর সুখ পাবে পরলোকে ; আর নিজের বাংলা পাঁচী বৌ-এর বদলে উর্বশী মেনকা-রম্ভাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু এ-সব নিয়ে—স্বর্গ-নরক, পরলোক, জন্মান্তর, বেদ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলে কার সাধ্যি! তা হলে ব্রহ্ম জানা ব্রাহ্মণরা মাথা খসিয়ে ছাড়বেন না! এই মাথা খসানোর ব্যাপার নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করা যাক। এ বিষয়ে উপনিষদ থেকে অতিসংক্ষেপে আমরা দুটি ঘটনার বিবরণ তুলে ধরছি।

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদের গার্গীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ভারতীয় বিদুষী মহিলার নাম করতে গেলেই হরবখৎ এই নামটি উচ্চারিত হয়। তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেছেন অনেক, কিন্তু এখানে তাঁর শেষ প্রশ্ন ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত ? যাজ্ঞবল্ক্য অন্তরীক্ষ-লোক, গন্ধর্বলোক, আদিত্যলোক, চন্দ্রলোক, দেবলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজা-পতিলোক বিলক্ষণ জানতেন, কিন্তু ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত জানতেন না। তাই, গার্গীর প্রশ্নে তিনি মুস্কিলে পড়লেন, আর তখমই গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,—প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছ গার্গী। ব্রহ্মালোকই শেষ সীমা। এরপর আর প্রশ্ন চলে না। অতি প্রশ্ন করোনা, গার্গী, মাথা খসে পড়বে—'তে মূর্ধা ব্যাপপ্তৎ'। সেদিন গার্গীকে চুপ করে বসে পড়তে হয়েছিল অভিশাপের ভয়ে নয়—মাথা খসে পড়ার ভয়ে নয়, প্রবল শক্তির কাছে, বিপক্ষদের দ্বারা প্রাণনাশের আশংকায়।* এই ধারণা উজ্জ্বল হয় ঋষি শাকল্যের পরিণতির কথা ভাবলে।

ওই একই অধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে কুরু-পাঞ্চালের অন্যতম ঋষি শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করে চলেছেন ; শেষে শাকল্য আত্মার প্রশ্নে এসে পৌছালে যাজ্ঞবল্ক্য তার ভাববাদী ব্যাখ্যা দিয়ে শাকল্যকে প্রশ্ন করলেন যাকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করা হয় তিনি কে না বলতে পারলে শাকল্যের মাথা খসে পড়বে। উপনিষদ থেকে জানতে পারা যায় শাকল্য 'তাঁকে' জানতেন না বলে তার সংগে সংগে মাথা খসে পড়েছিল। কিন্তু এ-রকম আজগুবি কথায় উৎ-কেন্দ্রিকতা না জন্মালে কোন বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। আমাদের মনে হয়, শাকল্যকে বেহ্মজ্ঞানী সব বামুন মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল, বা মাথা কেটে দিয়েছিল। আসলে যাজ্ঞবল্ক্যের দল কামনা-বাসনা-ক্রোধ ইত্যাদির উর্ধ্বে নন। দেখা গেছে, যখনই যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখনই তিনি মূর্ধা

* প্রাখ্যাতা বিদুষী অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য যাজ্ঞবল্ক্যের মাথা খসে পড়ার অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এই ঘটনার ব্যাখ্যা করে বলছেন,—"বলা বাহুল্য, এই সতর্কবাণীর মধ্যে একধরনের পরাজয়স্বীকার অন্তর্নিহিত আছে ; প্রকাশ্যে নারীর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে তিনি গার্গীকে প্রকারান্তরে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করা থেকে বিরত হতে বললেন।" 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য', পৃ-৪৪। কিন্তু তাঁর এই ব্যাখ্যা শাকল্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে সতর্কবাণীর ইঙ্গিত সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে অক্ষম।

খসে পড়ার ভয় দেখিয়েছেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া থেকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হলো।

এইভাবে এই বেহ্মজ্ঞানীদের কৃপায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের সব শাখায় ধরল ঘুনঃ আয়ুর্বেদ পড়ল পাতি বৈদ্যের হাতে, শল্যচিকিৎসা নাপিতের হাতে, আর ধাতুবিদ্যা কামারের কাটারি-কুড়ুল তৈরীর শালে আশ্রয় নিল; গয়ায় পিণ্ডদানের ফলে পরমাণুর 'ভূত'-এর [অর্থে পদার্থ, বস্তু *(matter)*] পরলোক প্রাপ্তি ঘটল, এবং সম্ভবত পূর্বজন্মের কুকর্মের ফলে পাশ্চাত্য দেশে জন্মগ্রহণ করল। হাতে ও মাথায় বিচ্ছেদ ঘটল।

এবার জ্যোতির্বিজ্ঞানে শাস্ত্রানুশাসন বিষয়ে একটি উদাহরণ উপস্থিত করা যাক: ব্রহ্মগুপ্তের ন্যায় প্রতিভাশালী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ এদেশে প্রাচীনকালে কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথম আর্যভট ও দ্বিতীয় ভাস্করকে বাদ দিলে আর কারুর নাম তাঁর সঙ্গে সমমর্যাদায় উচ্চারিত হবার মত নেই। কিন্তু এহেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'রাহু'-র গ্রাস এড়াতে পারেননি কেবল শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ভয়ে ও আতঙ্কে। অলবিরুণী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, হিন্দু জ্যোতির্বিদদের কাছে এটা সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল যে, পৃথিবীর ছায়া পড়ে চন্দ্রগ্রহণ হয়, এবং চন্দ্রের ছায়া পড়ে সূর্যগ্রহণ হয়। এর ওপরে ভিত্তি করেই তারা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অন্যান্য গ্রন্থে গণনা করেছেন। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়েছেন কিরূপে ব্রহ্মগুপ্ত তাঁর গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সত্ত্বেও লিখেছেন যে, কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন গ্রহণ 'মস্তক' দ্বারা সংঘটিত হয় না। এটা একেবারে মূর্খের ধারণা, কারণ 'মস্তকই' গ্রহণ ঘটায়। এর কারণ 'মস্তক' গ্রহণ সংঘটিত না করলে ব্রাহ্মণদের সব রীতি-নীতি যা তারা গ্রহণের সময় সম্পাদন করে, যেমন, তাদের গরম তেল মাখা, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকার্যাদি, সবই মায়া—ভুয়ো হয়ে যায়; আর তা হলে তারা স্বর্গীয় সুখ দ্বারা পুরস্কৃতও হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এসব ভ্রান্ত বা অলীক বলে মনে করে, তা হলে তাকে চিরকাল শাস্ত্রীয় বচনের বাইরে থাকতে হয়। এটা গ্রহণ-যোগ্য ও অনুমোদনযোগ্য নয়। অলবিরুণী বলেছেন, ব্রহ্মগুপ্ত সক্রেটিসের *calamitus fate*-এর ভয়ে রাহু তত্ত্বে বিশ্বাসী শাস্ত্র মেনে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এ-বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা আছে যা তৎকালীন আর্থ-সমাজভিত্তিক। ওই সময় এদেশে সামন্ততন্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামন্ত প্রভুদের স্বার্থরক্ষায় আইন চিরকাল কাজ করে (আজও শাসক শ্রেণীর স্বার্থেই আইন); বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশ সেই আইনের

পৃষ্ঠপোষক, প্রচারক তাদের স্বার্থের খাতিরে। ব্রহ্মগুপ্ত তার ব্যতিক্রম বললে আর যাই হোক সঠিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ হয় না। এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা আমরা রাজনীতি ও বিজ্ঞানে করব।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে বিচার করলে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় অচল, অটল থাকার একমাত্র উপায় সব জিজ্ঞাসার মূলোৎপাটন, সত্যের অপ-ব্যাখ্যা, শিক্ষার আলোক থেকে গরিষ্ঠ অংশের অপসারণ এবং শাস্ত্রই একমাত্র সত্য, প্রমাণ বলে ঘোষণা করা। তা ছাড়া 'পরা' ও 'অপরা' ভাগ করে ভাববাদের—রহস্যবাদের জয়ঘোষণা তো ছিলই। "রিলিজিয়ন শব্দটি এসেছে ***religare*** ক্রিয়া থেকে এবং তার আদি অর্থ হল বন্ধন। অতএব দুটি মানুষের মধ্যে যে কোন বন্ধনই হল ধর্ম। এ জাতীয় ব্যুৎপত্তিগত কায়দাই ভাববাদী দর্শনের শেষ সম্বল। কথাটার আসল প্রয়োগের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে কী বোঝাচ্ছে সেটা নয়, ব্যুৎপত্তির দিক থেকে শব্দটির পক্ষে কী বোঝান উচিত এটাই যেন আসল কথা।"[১৬] ধর্ম তার প্রকৃতি ও স্বরূপেই বস্তুবাদের তথা বিজ্ঞানবিরোধী। সুতরাং ভারতে প্রকৃতিবিজ্ঞান তথা পরমাণুবাদ যে ধর্মীয় শি হুয়াংতি-দের[১৭] হাতে জীবন্ত কবরস্থ হবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তাই বৈশেষিকের আরম্ভঃ 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাসামঃ'-এখন ধর্মের ব্যাখ্যা করব।

সভ্যতার আদি যুগেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ছিল। কিন্তু তা ছিল ম্যাজিক ও ইন্দ্রজালের মুখোশ পরে; ধর্মেরও এই গতি দেখা যায়। বস্তুত ধর্ম ও বিজ্ঞান ম্যাজিক-ইন্দ্রজালের কুহেলীতে ছিল সমাচ্ছন্ন। সভ্যতার অগ্রগতিতে ক্রমশ বিজ্ঞান সেই কুহেলী ভেদ করে বেরিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু ধর্ম আজও পারল না। তাই ধর্মের মধ্যে এখনো নানা ম্যাজিক-ইন্দ্রজাল, কুসংস্কার রয়ে গেছে। আর বিজ্ঞান তার আদিম রূপ ত্যাগ করে প্রাচীন ইতিহাস পর্বে দর্শনের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রাচীন ইতিহাস পর্বে দর্শন ও বিজ্ঞানেও কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল না। কেবল আমাদের দেশের প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য নয়, বিশ্বের অন্যত্র যে-সব প্রাচীন সভ্যতার কথা জানতে পারা যায়, তাদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণ হিসাবে মিশর, ব্যাবিলন, চীন প্রভৃতি দেশের অতীত বিজ্ঞানচর্চার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে, বিজ্ঞান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে বহু সময় নিয়েছে—আধুনিক যুগেই এটা সম্ভব হয়েছে। গ্রীসে থ্যালেস থেকে, চীনে 'তাওবাদ' থেকে

শুরু এই ধারা প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল—দর্শন ও বিজ্ঞান একে অপরকে প্রভাবিত করে বা কখনো সমার্থক হয়ে চলে এসেছে। অনেকের জানা যে, নিউটনের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দর্শন *(Natural Philosophy)* নামে অভিহিত হয়ে এসেছে। এ থেকে যেমন বিজ্ঞান ও দর্শনে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা অনুমান করা যায়, এবং বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়লে বোঝা যায়, তেমনি জ্ঞানকর্মের এই দুই শাখার মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিষয়েও অবহিত হবার প্রেষণা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের দর্শন তথা ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনে একটা বড় পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেশের দর্শন নিছক জ্ঞানকর্ম—সত্যান্বেষণ নয়, মোক্ষ লাভের প্রধান হাতিয়ার। যেমন, পরমাণুবাদীরা বহুলাংশে বস্তুবাদী হলেও ভাববাদের কুহেলী থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রের প্রথমেই শুরু করেছেন : **'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ'** —এখন ধর্মের ব্যাখ্যা করব। আবার, ন্যায় শাস্ত্রের প্রথম প্রবক্তা গোতম তাঁর দ্বিতীয় সূত্রে বলেছেন,—

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানা—
মুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ ।।

"অপবর্গই এই শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন এবং প্রথম সূত্রোক্ত প্রমণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে আত্মাদি প্রমেয় পদার্থের যে তত্ত্বজ্ঞান তাহাই সেইসমস্ত প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে সর্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা সেই অপবর্গের চরম কারণ। পরে ক্রমে ইহা ব্যক্ত হইবে।"* রঘুনাথ শিরোমণিও শুরু করেছেন,—**'অথ পদার্থতত্ত্বং নিরূপ্যতে'**—"অনন্তর 'পদার্থতত্ত্ব' নিরূপিত হইতেছে।"** কিন্তু রঘুনাথ ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করেছেন বস্তুর কথা বলতে গিয়ে, এবং কন্টকাকীর্ণ পরিভাষায়। বস্তুত, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ঝরঝর বারি ঝরের মত এদেশে উপনিষদের যুগ থেকেই ভাববাদের প্রবল বারি ঝরে আসছে। যদিও বেদবিরোধী নাস্তিকের অভাব এদেশে কখনো দেখা যায়নি, অন্তত মাধবের সময় পর্যন্ত, তবুও লোকায়ত বা চার্বাকদের মত পাঁড় বস্তুবাদীদের আবির্ভাব এদেশে কিভাবে সম্ভব হলো, তা ভাববার বিষয়

* তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ—'ন্যায় পরিচয়', পৃ-৩ ; উদ্ধৃতিটি শ্লোকটির অনুবাদ নয় কিন্তু গোতমের মনে এই ভাবই ছিল বলে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণের অভিমত।

** শিরোমণি, রঘুনাথ—'পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্', অনুবাদঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য, মূল, পৃ—২

বটে। আমাদের পূজ্যপাদ জ্ঞানতপস্বী কৌপীনধারী মুনি-ঋষিগণ প্রভৃত গালিগালাজ করেও, বই, পুঁথিপত্র কিছু থাকলে তা পুড়িয়েও এদের একেবারে লোপাট করতে পারেননি ;* আর আত্মা, পরলোক, ঈশ্বর, দারা-পুত্র-পরিবার ইত্যাদি ইত্যাদি সব ভুয়ো—মায়া প্রমাণ করতে পাষন্ড চার্বাকদের অভিমত খন্ডন না করেও জল খাননি। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'চার্বাকদর্শনম্' গ্রন্থের মুখবন্ধে চার্বাকদের প্রতি কটাক্ষ করার জন্য মাধবের একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন।[১৮] তাঁর বক্তব্য যে চার্বাকরা বেদাদি মানে না, তারা আবার বেদাদি থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, এটা বিস্ময়কর। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে যা বিস্ময়কর, তা আসলে নয়। বরং উপনিষদের মধ্যে, তা বৃহদারণ্যক হোক বা ছান্দোগ্য ইত্যাদি যা হোক, তাতে বস্তুবাদী ধারণার অভাব নেই। প্রকৃতপক্ষে, ওই যুগে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা দেখা যায় না। এ-বিষয়ে আমরা সামান্য আলোচনা ইতিপূর্বেই করেছি। বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্য আমরা ইয়াকোবি ও রুবেমের গবেষণা দেখতে পাঠকদের অনুরোধ করি।

চার্বাক দর্শন আর বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বড়ই গুরুত্ব। চার্বাকরা যেমন জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যা জাগতিক কারণের সাহায্যেই করতে চেয়েছিল, বিজ্ঞানেও তেমনি প্রত্যক্ষের ওপর, পর্যবেক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন, সুশ্রুত বলেন, —"হাজার হাজার যুক্তিতর্কের বিচার করেও প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট কোনো বিষয় অস্বীকার করার উপায় নেই ; যেমন, অম্বষ্ট-জাতীয় ফল থেকে চোখে দেখা যায় যে আমাশয় প্রভৃতি রোগে মলরোধ হয়—কিন্তু সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করেও এই ফলকে বিরেচক বলা অসম্ভব।** ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্দালক আরুণি ও তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু, চরক, সুশ্রুত প্রমুখ বস্তুবাদের ওপর তাঁদের মতাদর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক, আদি সাংখ্য পুরোপুরি বস্তুবাদ না হলেও বস্তুবাদমুখী বা ঘেঁষা মতবাদ ও মতাদর্শ প্রচার করেছে। যেমন, ন্যায়-বৈশেষিকের 'অনুমান' (Inference) নিছক অনুমান নয়, তা প্রত্যক্ষ নির্ভর অনুমান।*** গঙ্গেশ উপাধ্যায় অবশ্য প্রত্যক্ষনির্ভর অনুমানকে 'অনুমিতি' বলেছেন। কিন্তু

* চার্বাক বা বস্তুবাদীদের পুড়িয়ে বা পিটিয়ে মারার ঘটনা দুর্লভ নয়।

** সুশ্রুত সংহিতা, ১।৪১।২৩-২৪ ; 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' থেকে উদ্ধৃত।

*** ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অনুমান প্রমাণ সম্বন্ধে বলেন, "প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের

শেষরক্ষা করতে পারেননি আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে। এখানে এনিয়ে সামান্য আলোচনা না করলে চলেনা বলে অতি সংক্ষেপে আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করছি।

মগধে বিম্বিসারের পর থেকে প্রাচীন ভারতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা দখলের প্রবণতা দেখা দিতে শুরু করে। শুঙ্গ, নন্দবংশের পর চন্দ্রগুপ্ত খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সেই কাজটি সমাধা করেন। তবুও অশোকের আগে সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা অধিক দূর বিস্তারিত হয় নি। চন্দ্রগুপ্তের সময় শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন সূচিত হওয়ায় এবং অশোকের সময় রাজকর্মচারীদের প্রদেশ, বিষ, গ্রাম ইত্যাদির পরিদর্শনে সুব্যবস্থা থাকায়, আর সেই সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে, দেশ সমৃদ্ধ ও উন্নত হতে থাকে। রাজানুকূল্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পী, কারিগর, নিম্নশ্রেণীর শূদ্র ইত্যাদি জাতপাতের লৌহ-নিগড়ে নিষ্পিষ্ট হতে পারেনি। জাতপাত অর্থাৎ বর্ণভেদ ছিল না তা নয়, কিন্তু তা বজ্রকঠিন ছিল না। বর্ণের ভিত্তিতে পেশা তখনো পূর্বজন্মের কর্মকৃতি, কর্মফল বলে স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্রের পুরোপুরি অনুশাসনে পরিণত হয়নি। জাতকের গল্পে এর প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কিন্তু গুপ্তযুগ, হর্ষবর্ধন প্রমুখের শাসনের সময় থেকেই দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হতে শুরু করে; তলে তলে বিশাল সাম্রাজ্য, 'রাজরাজচক্রবর্তী' ইত্যাদির স্বপ্ন বিলীন হতে শুরু করে। ফলে, সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দী থেকে ভারতে এক ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা দেখা যায় যাকে **'সামন্ততন্ত্র'** বলা চলে।

কিন্তু এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই।

অনন্তরই প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সংগত"। অনুমানের স্বরূপ ও প্রকারভেদ সম্পর্কে ন্যায়সূত্রকার গোতম বলেন—

অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং—
পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ। ১।১।৫

যে-কোন রকম প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান অনুমান প্রমাণ না হলেও ফণিভূষণ বলছেন,— " 'তৎপূর্ব্বকং জ্ঞান মনুমানং' এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষপূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।" কিন্তু এ বিষয়ে আলোচনা যেমন জটিল তেমনি ব্যাপক, তাই ফণিভূষণের 'ন্যায় পরিচয়', একাদশ অধ্যায় দেখতে অনুরোধ করি। তাঁর 'ন্যায় দর্শনও' দেখলে ভাল হয়, এবং ইংরেজী অনুবাদও লভ্য।

ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব আছে কি নেই, এই নিয়ে চুলোচুলি চলছে। যাঁরা মনে করেন, ভারতে কোন কালেই সামন্ততন্ত্র ছিল না, তাঁদের বক্তব্যের সারকথা হলো ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রে যে যে লক্ষণ দেখা যায়, ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সেই সেই লক্ষণ মিলিয়ে তেমন-কিছু পাওয়া যায় না। সুতরাং ভারতে ওই সামন্ততন্ত্র ছিল না। এই দলে কেবল ঐতিহাসিকরাই নেই, অর্থনীতিবিদরাও আছেন। আবার, ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভারতীয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় সাদৃশ্য সম্পূর্ণত না হলেও অংশত থাকায়, এই কাঠামোটিকে কেউ কেউ আধা-সামন্ততন্ত্র, সামন্ততন্ত্রীয় আখ্যা দিতে চান। কেউ কেউ আবার 'আধা-সামন্ততন্ত্র'-এর সংজ্ঞা দাবী করে একে ধোঁয়াটে বলে অগ্রাহ্য করতে চান।* মুজতবা আলী সাহেব পণ্ডিত-বিদ্বানদের নানা গুণের কথা বলে কেবল একটিমাত্র দোষের কথা বলেছেন। আলী সাহেবের উল্লিখিত দোষের কথা বলার মত ভীম-বুক আমাদের নেই। আমরা পাটকাঠি সদৃশ। তাই আমাদের মতে পণ্ডিতদের একটিমাত্র দোষ হলো এঁড়ে গোঁ। যতই ওদের বোঝানো হোক, তথ্য দেওয়া হোক, যুক্তি দেওয়া হোক, একবার ভ্রান্তি ঢুকলে তাকে বের করা বড়ই কঠিন। যাক গে, ভারতীয় সামন্ততন্ত্র সম্পর্কে এহেন গোলমালে কথার সারমর্ম করে রোমিলা থাপার যা বলেছেন, তা স্বীকার করে নিতে প্রগতিশীল মনের বেশী দেরী লাগবে বলে মনে হয় না। তিনি লিখেছেন, "This is perhaps being unnecessary cautious once it has been stated that Indian feudalism, similar in the main, differed in some aspects from other types of feudalism. For instance, Indian feudalism did not emphasize the economic contract to the same degree as certain types of European feudalism, but the difference is not so significant as to preclude the use of the term feudalism for conditions prevailing in India during this period".** যাঁরা পরিভাষাটির ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাঁদের 'জিজ্ঞাসা' করতে ইচ্ছা হয় যে, রয়াল বেংগল টাইগারকে তাঁরা টাইগার বলবেন কিনা? শ্বেত ভালুককে ভালুক বলবেন কিনা।

সামন্ততন্ত্রের মূল লক্ষণ ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে বর্তমান ছিল। রাজা

* রুদ্র, অশোক,—'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন,' পৃ—১৬৩-১৬৪

** Thapar, Romila—A History of India. p. 241-242

ভূমির বিভিন্ন আনুপাতিক রাজস্ব তাঁর কর্মচারীদের বা নির্বাচিত হোল্ডারদের দান করতেন। এঁরা ছিলেন ভ্যাসালের (Vassals) তুল্য। সপ্তম শতাব্দী থেকে নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমিদান প্রথার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। কৃষকরা জমি চাষ করত; এরা ছিল সাধারণ শূদ্র যারা জমির সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গেছল, এবং এরা ফসলের নির্দিষ্ট অংশ ভূমি-মালিককে অর্পণ করত। সামন্তরা তাদের ওপর ন্যস্ত জমি ভাড়া দিতে পারত কৃষকদের এবং তাদের কাছ থেকে তারা কর বা খাজনা আদায় করত স্বীকৃত পরিমাণে। জমি থেকে খাজনার অংশ তারা সরাসরি রাজাকে দিত। বাকী অংশ ভ্যাসালরা তাদের সৈন্যসামন্ত, কর্মচারী ইত্যাদির জন্য ব্যয় করত। ভ্যাসালরা সৈন্যসামন্ত, মাঝে মাঝে বিশেষ উপলক্ষে উপঢৌকন দিতে বাধ্য থাকত। এমন কি, তার পদ, জমিমালিকানা ইত্যাদি ভ্যাসালদের বজায় রাখতে রাজাকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করতেও হতো। তারা প্রভুর মুদ্রা ব্যবহার করত। এবং স্তম্ভ, অভিলেখ ইত্যাদিতে প্রভুর নাম খোদাই করে জয়গান করত, স্তুতি রচনা করত। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষমতাশালী সামন্তরাজ ছিল যারা রাজার পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকেই ভূমিদান করতে পারত। এই ধরনের সামন্তর আবার উপ-সামন্ত ছিল। এটা উত্তরাধিকারমূলক বললে অত্যুক্তি হয় না। গুপ্ত রাজাদের 'সুরাশ্মিচন্দ্র' ছিল সামন্ত, আবার এই সামন্তের সামন্ত ছিল 'মাতৃবিষ্ণু'। পরবর্তী চালুক্য শিলালিপিতে এর অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

তাত্ত্বিকভাবে ভূমি নয়, ভূমিরাজস্ব সামন্তদের দান করা হতো। এবং শর্তাদি পূরণে অক্ষম হলে তার ভূমি বাজেয়াপ্ত করা হতো। বস্তুত, এটি ছিল জীবন-স্বত্ব দান, মৃত্যুর পর আবার পুনর্ন্যস্ত করা বিধি ছিল। কিন্তু বাস্তবে সামন্তরা উত্তরাধিকারসূত্রে ভূমি ভোগদখল করত। এমন এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা জানতে পারা যায় যাঁরা পাঁচ পুরুষ ধরে দান করা জমি ভোগদখল করে এসেছেন। 'ব্রহ্মদেয়' জমিমাত্রেই করমুক্ত ও উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখলের অধিকার।

সমাজের উঁচু মহল ছেড়ে এবার নীচু মহল তথা সমাজের উৎপাদন বা অর্থনীতির দিকটি বিবেচনা করা যাক। গ্রাম ছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ যেখানে উৎপাদন কেবল স্থানীয় চাহিদা মেটানোর উপযুক্ত ছিল। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের প্রতি কোন উৎসাহ ছিল না ব্যবসা-বাণিজ্য বা বিনিময়ের জন্য। কৃষকদের উপকারে লাগে এমন কোন উদ্বৃত্তের প্রয়োজন

অনুভূত হতো না। কারণ, উৎপাদন বেশী হলে, উদ্বৃত্ত বেশী হলে মালিক তার পাওনা গণ্ডার বাইরে বেশী দাবী করত। সুতরাং পদ্ধতিটি ছিল অধিক উৎপাদন না করার। কারণ, উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোন উপাদান ছিল না, কোন পুরস্কার ছিলনা—*incentive* ছিল না। কৃষকদের ওপর চাপ, উৎপীড়ন বৃদ্ধি পাওয়ায় তখন কেবল টিকে থাকার দরকার ছিল। অবশ্য 'ইনসেনটিভ' (*incentive*)না থাকার পেছনে কেউ কেউ কৃষকদের ভাগ্য, বিধিলিপি, অদৃষ্টসুলভ মনোভাবের কথা তোলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তা নয়, এই মানসিকতা বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সীমিত উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাব থাকার জন্য মুদ্রায় ঘাটতি দেখা দেয়; তা ছাড়া স্থানীয় ওজন ও পরিমাপের জন্য বাণিজ্যের হ্রাস ঘটে। কারণ, এতে বহু দূরের সঙ্গে বাণিজ্য করা কঠিন হয়ে উঠল। কারিগরি উৎপাদন ও বাণিজ্যে সামন্তদের উদ্বৃত্তের বিনিয়োগ হলো না, অথচ ভোগের *orgy*-তে ব্যবহৃত হতে থাকল। বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হলো, গগনভেদী মন্দির নির্মিত হলো ও অলঙ্কৃত হলো যৌন ভাস্কর্যের চরমে, আর মহাবদান্য দাতারা এক-দেড় হাত লম্বা পদবী গ্রহণ করে মহারাজাধিরাজের গৌরব বৃদ্ধির নিষ্ফল প্রয়াস করতে লাগল।* আর ঐতিহাসিক কারণেই এই মন্দিরগুলিই কালক্রমে বিদেশী লুণ্ঠকদের আকর্ষণ করে নিয়ে এল, এবং গর্বের বুদ্বুদ মুহূর্তে কেটে যেতে থাকল।

উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি জড়িত। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা শ্রেণী খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমৃদ্ধির যুগে সম্পদশালী হতে থাকে; ব্রাহ্মণরা মূলত সমাজে রাজা-

---

* সমুদ্রগুপ্তের উপাধী তথা বিশেষণ 'সর্ব-পৃথ্বী-বিজয়-জনিতোদয়-ব্যাপ্ত-নিখিলা-বনিতলা'; গৌতমীপুত্র শাতকর্ণির 'ত্রি-সমুদ্র-তোয়-পীত-বাহন' চালুক্যবংশীয় রাজারা 'ত্রিসমুদ্র-মধ্যবর্তি-ভুবনমণ্ডলাধীশ্বর' ইত্যাদি, এমন কি দুর্বল মোগল সম্রাটের প্রতিও এই রকম প্রশস্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা বর্ষিত হতো। যেমন, মহম্মদ শাহের প্রতি "পরমভট্টারক-অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজা-ত্রয়-অধিপতি-মহা-শূরতারণ-শ্রী-শ্রী-শ্রী-শ্রী-বৃ-প্যালিতে-ধরণী-মণ্ডলে" ভারতের নানা দিকে গগনমণ্ডল কম্পিত করলেও মোগল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল আওরঙ্গজেবের পর। দ্রষ্টব্য: দীনেশচন্দ্র সরকারের 'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ', পৃ-২০২-২১১ এবং *Studies in the Society and Administration of Ancient and Medieval India*, p. 226

সামন্তদের সহিত সহযোগিতা করে চলতে থাকে। কিন্তু ক্রমশ অর্থনীতির অবনতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শম্বুক গতির ফলে শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। সে-কারণে সমাজে ঘনিয়ে এলো ঘোর দুর্দিন; ভিত্তি কাঠামো *(Infra-structure)* ও ওপরি কাঠামোয় *(Super-structure)* অবক্ষয় ও অধঃপতন ত্বরান্বিত হলো। তাই দেখা যায়, অষ্টম শতাব্দীর পর কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-গণিত তথা সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রেই স্বল্প সৃজনশীলতার লক্ষণ। এ সময় থেকেই পূর্ববর্তী মৌলিক গ্রন্থসমূহের টীকা-টিপ্পনি, ভাষ্য ছাড়া মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তা ও মননের পরিচয় ও স্বাক্ষর আর দেখা যায় না। বাৎস্যায়ন, বাচস্পতি, মেধাতিথি, কল্লুক, শ্রীধর, উদয়ন প্রমুখ কেবল ভাষ্য রচনা করেই ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য ও প্রতাপ বজায় রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে শ্লেষ ও বিদ্রূপে, বিতণ্ডে অন্য মতাবলম্বীদের আক্রমণ করেছেন। ভাববাদের চূড়ান্ত রূপ এমনি করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে শত শত বছর ধরে ঘুণ ধরিয়ে ফাঁপরা করে তুলেছে। এ-বিষয় ব্রহ্মসূত্রকার শঙ্করের নাম সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। নবম-দশম শতাব্দীতে কারিগরি পেশা ছিল উপ-জাতের মানুষের। যেমন,—শল্যবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা ইত্যাদি উপ-জাতের মানুষরা চর্চা করেছে। এই সময় ব্রাহ্মণ্য রচনায় কারিগরি তথা টেকনিক্যাল জ্ঞানের প্রতি ঘোরতর দুর্বার আক্রমণ চালানো হয়। মেধাতিথি বলেছেন, হস্তশিল্প, কুঠিরশিল্প ঘৃণ্য কাজ ঃ মনু সংহিতার সমসাময়িক যুগের টীকায় যান্ত্রিক কর্মকে *'minor sin'* বলা হয়েছে। এই 'পাপ কাজের' মধ্যে সেতু নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণ পর্যন্ত ছিল।

এ বাহ্য। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিষয়ে আলোচনা করলে এই অবক্ষয় ও অধঃপতনের অন্যতম কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের শক্তি বৃদ্ধি ও পুরাতন জীর্ণ দীর্ণ গ্রন্থাদির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হতো। সুতরাং এই নিয়তান্ত্রিক শিক্ষা কতকগুলি বিবৃতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। এইসব প্রতিষ্ঠানে প্রশ্ন, স্বাধীন চিন্তা ও মননের ঠাঁই ছিল না। এতে দেশের মনন ও চিন্তনে ঘুণ ধরা ছাড়া আর কোন ইতিবাচক ফল প্রসব করতে পারে না। বস্তুত, এই সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির ফলেই টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রতি বিরাগ, বিজ্ঞান মানসিকতার প্রতি আক্রমণ, বস্তুবাদের আদ্যশ্রাদ্ধ লক্ষ করা যায়।

ইতিপূর্বে আমরা শঙ্করের নাম উল্লেখ করেছি। তাঁর মত তীক্ষ্মধী দার্শনিক ও ভাববাদী ভারতে কমই জন্মেছেন। এমন কি, তাঁর লেখা কারুর পছন্দ হোক বা না হোক, তাঁর মতাদর্শ বিশ্লেষণের স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও প্রাঞ্জলতা মুগ্ধ না করে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উন্নতির জরাসন্ধ বধ করেছিল যে-দর্শন, তা তাঁরই বেদান্ত দর্শন। তাঁর মায়াবাদ ভারতীয় বিজ্ঞানের শিরদাঁড়াই ভাঙেনি, একেবারে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছিল। ভীম জরাসন্ধের দু-পা ধরে বাঁশ ফেঁড়া করেছিল, কীচককে মেরে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছিল, দুর্যোধনের উরু ভেঙেছিল; আর আচার্য শঙ্কর মায়া, ব্রহ্ম দিয়ে আপ্তবাক্য, শব্দ প্রমাণ (বেদ) ছাড়া আর সব প্রমাণ নস্যাৎ করলেন। এতে তাঁর মতাদর্শানুকূল আস্তিক্যবাদী ছাড়া, যেমন মনু, আর কাউকে "শিষ্ট বেদবাদী" বলে গ্রহণ করতেই চাইলেনা। ব্রাহ্মণ, উপনিষদের নব ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁর সময়ে ও পরে ব্রহ্মবাদ তথা মায়াবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার মত আর কোন ব্রাহ্মণ জন্মালেন না। অবশ্য এর পিছনে আর একজন 'ভগবন্' ছিলেন। তিনি হলেন মনু যাঁর স্মৃতির আইন অতিক্রম করার মত দুঃসাহস সে-যুগে কারুর ছিল না। আর তা না থাকারই কথা, অন্তত যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। মনু আইন জারি করলেন, "বেদকে শ্রুতি এবং ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে মানবে। এই দুই হলো সব ধর্মের মূল। এ নিয়ে কোনো তর্কাতর্কি চলবেনা। হেতু শাস্ত্র (অর্থাৎ তর্কবিদ্যা বা সোজা কথায় যাকে বলে লজিক) অবলম্বন করে কোনো দ্বিজ যদি শ্রুতি স্মৃতির অবমাননা করে, তাহলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে একেবারে বের করে দেবেন। বেদ নিন্দুকেরা নাস্তিক (নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ)।" (২।১০-১৬)। মনুর এই ইন্‌জাংশন এড়িয়ে স্বাধীন চিন্তা, মৌল ভাবনার অবকাশ কোথায়? বিজ্ঞানের প্রাণই হলো স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, যুক্তি-তর্কের সমারোহ, প্রত্যক্ষের প্রতি গভীর অনুরাগ তথা অবলম্বন। এ হেন ঊষর ক্ষেত্রে কোন বীজ অংকুরিত হতে পারে না। মনুর পর এলেন কয়েক শতাব্দী পরে শঙ্কর। তিনি নিঃসন্দেহে প্রশস্তপাদের, বাৎস্যায়ন ও উদ্দোতকরের পরবর্তী। যদিও মনুর আইন এড়িয়ে বেদে গঙ্গাজল ছিটানোর মত আস্থা স্থাপন করে ন্যায়-বৈশেষিক হেতুশাস্ত্ররূপে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মধ্যে টিকে ছিল, শঙ্কর তাঁদের বিরুদ্ধে 'স্টার ওয়ার' শুরু করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, "···শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। চোখে দেখা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ তো

দূরের কথা, এমন কি অনুমান, যুক্তি-তর্ক—সব কিছুই বর্জন করতে হবে। তবেই বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের ফানুসে চড়ে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে।…প্রমাণ বা প্রমেয় বলে যা কিছুর কথা বলা হয় তা সবই একেবারে বরবাদ না করলে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব।"[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৈশেষিকে প্রমাণ দু-প্রকার : প্রত্যক্ষ ও অনুমান ; আর ন্যায় সূত্রে প্রমাণ ষোলো ধরনের।[২০] শঙ্কর যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত প্রমাণ, প্রমেয় ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরায় বলে মনে করতেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চরম ভাববাদী এই দার্শনিক ন্যায়-বৈশেষিককে আক্রমণ করে ভারতে আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির পথ অবরুদ্ধ করলেন ; পরমাণুবাদ কবচ-কুণ্ডলহীন হয়ে মেদিনীগ্রাসের অপেক্ষা করতে লাগল। এতো গেল পরোক্ষ আক্রমণ, সরাসরি আক্রমণেও শঙ্কর দ্বিধাবোধ করেননি। পরমাণুবাদ কেন গ্রহণযোগ্য নয়, তার জন্য তিনি বাদরায়ণসূত্র উদ্ধৃত করে ভাষ্যরচনা করলেন।

'অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা'—২।২।১৭

অনুবাদ : অধিকন্তু পরমাণুবাদ গ্রহণযোগ্য নয় ; কারণ, কোন বেদবাদী এটি গ্রহণ করেননি।

ভাষ্য : প্রধানকারণবাদো বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিন্মন্বাদিভিঃ সৎকার্যত্বাদ্যংশোপজীবনাভিপ্রায়োণোপনিবদ্ধঃ। অয়ং তু পরমাণুকারণবাদো ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেনচিদপ্যংশেন পরিগৃহীত ইত্যন্তমেবানাদরনীয়ো বেদবাদিভিঃ।

সারানুবাদ : 'প্রধান'-কারণবাদ বেদবাদীরা আংশিক হলেও গ্রহণ করেছেন, বিশেষত যে-অংশ সৎকার্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত যেমন, মনু প্রমুখ। কিন্তু পরমাণুকারণবাদ কোন শিষ্ট ব্যক্তিই গ্রহণ করেননি। সুতরাং এই মতবাদ বেদবাদীরা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবেন।

এভাবে বিজ্ঞান গেল, বিজ্ঞান চেতনা গেল ; দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো—কুসংস্কারের শত-সহস্র অক্টোপাসীয় বাঁধনে মানুষের প্রাণসত্তা নিষ্পেষিত হলো। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের যা লক্ষণ তা ক্রমশ প্রকট হতে লাগল। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ধর্মের, দর্শনের অপব্যাখ্যা শুরু হলো। ছান্দোগ্য উপনিষদে, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এর উদাহরণ অপ্রতুল নয়। যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছেন,

"সৎ থেকেই দেহ-বাক্-প্রাণ-মন—মানুষের সব কিছুরই উদ্ভব" এবং এই 'সৎ' হচ্ছে 'নিছক সৎ'—স্বয়ং-অচেতন বস্তু। উদ্দালক আরুণির মতে, আদিম বা পরম সত্য হচ্ছে 'নিছক সৎ'—জড় বস্তু। তিনি একেবারে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মানুষ আসলে ওই 'সৎ' ছাড়া আর কিছু নয়।[২১] অবশেষে পুত্র শ্বেতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'তৎ ত্বম্ অসি'—তুমি আসলে ওই 'সৎ'-ই। কিন্তু ধর্ম-কোষে নির্মিত বৈদান্তি-করা 'সৎ' থেকে 'আত্মা', আত্মা থেকে 'ব্রহ্ম'-এ এসে নিগূঢ় 'মহাবাক্য'-এর উদ্ভাবন করলেন। বস্তুবাদী উদ্দালককে তাঁদের দলে ভেড়াতে না পারলে নাস্তিক বৃদ্ধি পায়, আর নাস্তিক চূড়ামণি চার্বাকদেরও উচ্ছেদ ও বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে, উপনিষদের উপাদানেই বেদবিরোধিতা থেকে যায়। কেবল আচার্য শঙ্কর ও তাঁর অনুগামীরা নন, এযুগেও যেখানে বস্তুবাদ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ দখল করে নিয়েছে, এবং এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম দেশ চীন যার অন্তর্গত এবং এদেশেও বর্তমানে বস্তুবাদ একেবারে অজ্ঞাত ও অশ্রদ্ধেয় নয়, যেখানে এ ধরনের মহাবাক্য উদ্ভাবনকারীরা রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার যে ভ্রান্তি সংশোধন ও সংস্কার করেছেন, তা ভাবলে তাঁদের বিদ্যাবত্তার কাল্পিকতায় বিস্মিত হতে হয়।[২২]

এবং-বিধ সাঁড়াশী ও গেরিলা আক্রমণেও পরমাণুবাদীরা বোধ হয় কোন রকমে টিকে থাকতে পারতেন বিরুদ্ধবাদীদের সাথে কোন-না-কোন প্রকারে বোঝাপড়া ও সমঝোতা করে (এবং তাঁরা করেছিলেন বেদ, ঈশ্বর ইত্যাদি স্বীকার করে, এবং ন্যায়-বৈশেষিকের আদি বস্তুবাদ প্রবণতা বিসর্জন দিয়ে), যদি মনু-শঙ্করাদি কেবল লগুড়াঘাত করেই ক্ষান্ত হতেন। কিন্তু উনিরা, বিশেষত ওঁদের চেলাচামুণ্ডরা ধর্মরাজের কট্টর পৃষ্ঠপোষক ব্রহ্মদেয়-সেবী বলে মোক্ষম ভীম-গদা চালনা করে বেআইনীর আশ্রয় নিয়ে উরুভঙ্গ করে ছাড়লেন পরমাণুবাদীদের।

এ তো গেল একদিক, আর দিক হলো পরমাণুবাদীরা স্বখাত সলিলেই ডুবে ম'লেন। দশম শতাব্দীতে উদয়ন থেকে তার শুরু। ন্যায় ও বৈশে-ষিকে মিল অনেক, পরমাণুবাদে তো আরো মিল। কিন্তু এই দুটি হেতু বা তর্ক শাস্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্যও আছে ; বিশেষত প্রমাণ প্রকরণে ন্যায় ও বৈশেষিকে পার্থক্য অধিক। উদয়ন এই দুটি শাস্ত্র এক করে ন্যায়-বৈশেষিক করলেন। এতে বৈশেষিকের বিশেষত্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলত, প্রত্যক্ষপরায়ণতা, তথা বস্তুবাদিতার হ্রাস ও ভাববাদিতার প্রাবল্য

বৃদ্ধি পেতে থাকে। নব্যনৈয়ায়িকরা অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করলেন ঃ রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায় ও বৈশেষিকের কিছু কিছু মতাদর্শ যা কিনা বাস্তব ঘেঁষা ছিল, তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে নব্যন্যায়ের পরাকাষ্ঠা দেখালেন, ভাববাদের প্রাবল্যে আনকূল্য করলেন। রঘুনাথের বিখ্যাত 'দীধিতি' আমরা দেখিনি সত্য, কিন্তু, তাঁর 'পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্' গ্রন্থখানি আমরা দেখেছি। মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য এই বইটির বিশেষত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "এই আলোচ্য গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে পূর্বাচার্যগণের স্বীকৃত, ন্যায়-বৈশেষিক প্রসিদ্ধ দিক, কাল, আকাশ প্রভৃতি পদার্থগুলি যেরূপ খণ্ডিত হইয়াছে তদ্রূপ ন্যায়বৈশেষিক-বিরুদ্ধ শক্তি, স্বত্ব, ক্ষণ প্রভৃতি অতিরিক্ত পদার্থ রঘুনাথের সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে।" বস্তুতপক্ষে, ন্যায়-বৈশেষিকের দিক, কাল, আকাশকে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন ; পরমাণুতে বিশ্রান্তি স্বীকার না করে 'ত্রুটি' অর্থাৎ ত্রসরেণুতেই বিশ্রান্তি দেখিয়েছেন। বস্তুত, তাঁর যুক্তি শূন্যগর্ভ, বস্তুকেন্দ্রিক নয়।[২৩] একথা স্বীকার করতে হবে, রঘুনাথ তাঁর 'দীধিতি' গ্রন্থে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, বিশেষত তাঁর মত-খণ্ডনের পদ্ধতি—লক্ষণ, বিভাগ, পরীক্ষা ইত্যাদি অভিনব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা ন্যায়-বৈশেষিকের জীবনদায়ী ওষুধ ছিল না, ন্যায়-বৈশেষিককে অধিক পরিভাষা কণ্টকিত করলেন। ফলে, ন্যায়-বৈশেষিক দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করল। বাংলায় চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম একে পারাবারের দিকে রকেটের গতিতে ঠেলে দিল ; দাক্ষিণাত্যে রামানুজ-বল্লভাচার্য সম্প্রদায়, আর উত্তর ভারতে রূপ-সনাতন-কবিরাজ গোষ্ঠী ও আসামে শঙ্করদেব। প্রবল মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বুদ্ধিপৌরুষহীনরা ভক্তি-ধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখতে লাগলেন।

বিজ্ঞান ও রাজনীতি

সাধারণভাবে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধতা নিয়ে এই কথাটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত যে, বিজ্ঞান বলতে প্রাকৃতিক নিয়মের সন্ধান—সত্যের সন্ধান, এবং তার প্রতি ফের্মি* অংশে রয়েছে নির্মল ও পবিত্র গঙ্গাজলীয় বিশুদ্ধতা —পবিত্রতা। মনে হয়, এ হেন বিচ্ছিন্ন কথার ইঙ্গিত ও তাৎপর্য এই যে, বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই ; বিজ্ঞান যেন ঊর্ধ্বমূলীয়।

* 1 ফের্মি $= 10^{-13}$ সেমি. ; অতি ক্ষুদ্র একক।

খুব বেশী দিন নয়, মাত্র এই শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বহুল পরিবর্তনে বার্নাল, নীডহাম, হলডেন, জিলসেল প্রমুখের মননশীলতা বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। খুবই বিস্ময়ের কথা, এইসব প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও গবেষকদের অন্তত চার দশক আগে আমাদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ *History of Hindu Chemistry*-তে এই সব সম্পর্কের কথা খুবই স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "Among a people ridden by caste and hide-bound by the authorities and injunctions of the Vedas, Puranas and Smritis and having their intellect thus cramped and paralysed, no Boyle could arise to lay down such sound principles for guidance as..." কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাবধি এই বিষয়ের গভীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হয়নি। ব্যতিক্রম সম্ভবত অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। যাই হোক, এইসব মনস্বীদের গবেষণার ফলে আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যে কী পরিমাণ অংশ নেয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুতপক্ষে, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সহিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কর্ণফোর্থ বলেছেন, "ভিত্তিকে সেবা করার জন্য বিকশিত হয়ে উপরিসৌধ বিচিত্র ধরনের সম্পর্কযুক্ত গড়ন প্রকাশ করে, যার প্রত্যেকটি একটি আবশ্যিক সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল রাজনৈতিক মত ও প্রতিষ্ঠানের এবং রাষ্ট্রের বিকাশ। এই সঙ্গেই আসে আইন-সংক্রান্ত মতামত, আইন, আইনী প্রতিষ্ঠান, পরিবার ইত্যাদির বিকাশ।"[২৪] দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও তার পর রাজনীতি-বিজ্ঞানে যে-সম্পর্ক লক্ষিত হচ্ছে, তা এখন সূর্যালোকের মত স্বচ্ছ। এখানে দু-একটি বিষয় উল্লেখ না করলে এই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপারটা পাঠকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।

অনেকের জানা যে, হিরোশিমা-নাগাসিকায় পরমাণু বোমা ফেলার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীরা সোচ্চার হয়েছিলেন। তৎকালীন আমেরিকায় এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা এই বিধ্বংসী বোমা যাতে না ফেলা হয়, তা নিয়ে তৎপরতা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে-প্রয়াস ব্যর্থ হয়, আমেরিকার সামরিক কর্তারা মায় প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত কুযুক্তির অবতারণা করে বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় বিজ্ঞানীদের উপেক্ষা করে চার্চিল বলেছিলেন, অন্যান্য লোকদের মত বিজ্ঞানীদের কর্তব্য রাষ্ট্রের সেবা করা, শাসন করা নয়।

যেহেতু তাঁরা বিজ্ঞানী।[২৫] আর পরমাণু বোমা তৈরী সম্পর্কে এরিক বার-হোপের উক্তি: "আমরা তখন ন্যায়সঙ্গত ভেবেছিলাম এবং এখনো মনে করি ঠিক। একইভাবে উত্তর ভিয়েতনামের বিজ্ঞানীদের তাদের দেশের জন্য কাজ করা ঠিক, এবং আমেরিকার বিজ্ঞানীদের তাদের দেশের যুদ্ধ প্রয়াসে অংশ-গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করাও ঠিক।"[২৬] মাননীয় অধ্যাপক বারহোপ এমন করে সুদূরপ্রসারী কুকর্মের সাফাই অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে করেছেন। কিন্তু কেন অধ্যাপক বারহোপ জেনে শুনে পাপ কর্মের সমর্থন করলেন? এ-সম্পর্কে কর্ণফোর্থ-এর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিলেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্পষ্ট হবে: "ভিত্তির সেবা করা শাসক শ্রেণীর সেবার সমতুল। ধ্যান-ধারণা ও প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে—যে ব্যবস্থায় একটি বিশেষ শ্রেণী কর্তৃত্ব করে এবং যার ভাগ্যের সাথে এদের ভাগ্য জড়িত আছে—এবং এই-ভাবে ঐ শ্রেণীর শাসন বজায় রাখার জন্য ও সংহত করার জন্য অস্ত্র ও উপ-করণ হিসাবে তার সেবা করে।" ঠিক একই কারণে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর কোন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের চুক্তির সামাজিক-রাজনৈতিক ভাবনা জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না। একথা ভাবা মূর্খতার প্রকাশ যে, কোন বিজ্ঞানী সামাজিক-রাজনৈতিক মন্তব্য করলেই তা প্রচার মাধ্যম প্রকাশ করবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। ব্রিটেন, জার্মানী ও হল্যাণ্ডের মধ্যে **গ্যাস-সেন্ট্রিফিউজ** (*Gas-Centrifuge*) নির্মাণে আপাত নির্মল একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই গ্যাস-সেঁন্ট্রিফিউজে ইউরেনিয়াম সমস্থানিক উৎপাদন করা যায়, যা শক্তি উৎপাদন বা বোমা উৎপাদনের কাজে লাগানো যায়। এই চুক্তির সমাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে এক বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী *The Times* পত্রিকায় একটি পত্র লেখেন। কিন্তু ওই পত্রটি প্রকা-শিত হয়নি।[২৭] এই ধরনের পত্র প্রকাশের ব্যাপারটির রহস্য এখন আর আমাদের অজানা নেই। আমাদের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে এনিয়ে হাজার অভিযোগ দেখা যাচ্ছে। এমন কি, হয়তো ভুক্তভোগী অনেকেই আছেন। এই দৃষ্টান্তগুলিতে যে-সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়, তা বোধ করি কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইতিমধ্যেই আমরা কর্ণফোর্থের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করেছি।

কেবল এ-যুগে নয়, সে-যুগেও ছিল, এবং বিশ্বের সর্বত্র শাসক শ্রেণীর সেবা করা, শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখার নানা কৌশল দেখা যায়। আইন-

কর্তারা যত আদর্শ ও পবিত্র কথাই বলুন, যত ধর্মীয় আবরণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করুন, তাঁদের মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য শাসকশ্রেণীর আসন অটল ও অনড় রাখা, আর সুকৌশলে শ্রেণীস্বার্থ কায়েম রাখা। অবশ্য একাজে সবাই দড়—কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী প্রমুখ। আর রাজনীতিকরা কাব্য-ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান ও দেশের সমৃদ্ধি নিয়ে মাথা ঘামান আর না ঘামান, বুঝুন ছাই আর না বুঝুন, কিন্তু এই কথাটা পরিষ্কার বোঝেন যে, দেশ থেকে নিরক্ষরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর হলে তাদের বারোটা বাজবে—সাড়ে সর্বনাশ হবে। শুধু তাদেরই নয়, তাদের আনুকূল্যকারী সবার—সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর—উদ্বৃত্ত মূল্য অপহরণকারীদের। একথা সত্য, বুদ্ধিজীবীরা কোন শ্রেণী নয়। তাদের পৃথক কোন শ্রেণী স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু যে শ্রেণীগুলি নিয়ে সমাজ তাদের একটি বা অপরটির বুদ্ধিজীবী-প্রতিনিধি হিসাবে তারা কাজ করে। সুতরাং আইন কর এমন সুগার-কোটিং-এ যেন অজ্ঞ জনগণ তাদের সর্বনাশের কথা জানতে না পারে। আমাদের দেশের ভগবন্ মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্কর প্রমুখের মত প্লেটো, আইসোক্রেটিস, পলিবিয়াস, ভারো, সিসিরো, কনফুসিয়াস প্রমুখ একই পথ ধরেছিলেন। আমাদের দেশের ভগবনদের কথা ইতিপূর্বে সামান্য সামান্য হলেও আলোচনা করেছি। তাই, এখানে গ্রীস ও চীনের ব্যাপারটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি অবশেষে যাই হোক না কেন, এর মূল বা উৎস টেকনিকের মধ্যে, শিল্প ও কারিগরির মধ্যে অর্থাৎ বহু ধরনের কর্মতৎপরতা যার সাহায্যে মানুষ দেহ-মন অবধারণ করে। এর উৎস হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এর লক্ষ্য বাস্তবতা। বস্তুর সংস্পর্শেই এর উদ্ভব, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ওপর এর নির্ভরতা। বিজ্ঞান যতই তার প্রাথমিক উৎস থেকে সরে যাক না কেন, আবার তাতেই তার প্রত্যাবর্তন। একথা সত্য, বিজ্ঞানে লজিকের প্রয়োজন, তত্ত্বের বিস্তৃতি আবশ্যক; কিন্তু সেই লজিক ও নির্বাচিত তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ চাই—পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে মূল্য নিরূপিত হওয়ার গুণধর্ম থাকা চাই।[২৮] গ্রীক বিজ্ঞানের প্রাথমিক পর্বে টেকনিক, পরীক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ দেখা যায়। কিন্তু প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে কেবল টেকনিসিয়ানের আবিষ্কার অস্বীকারই করেননি, নির্মাণশিল্পে যে কোন বিজ্ঞান রয়েছে, তা-ও অস্বীকার করলেন। রিপাবলিকে

তিনি বললেন, যে-সব লোক তৈরী করে, নির্মাণ করে তারা নয়, যারা সে-সব জিনিস ব্যবহার করে অর্থাৎ ব্যবহারকারীরাই 'সত্যিকার বিজ্ঞান-জ্ঞান'-এর অধিকারী। এই মতবাদ সমাজে উৎপাদকের মর্যাদার চেয়ে ভোগীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করল। দাস-সমাজে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ফ্যারিংটন লিখেছেন,—"A slave who made things could not be allowed to be the possessor of a Science Superior to that of the master who used them." [*Greek Science*, p. 106] প্লেটো কেন প্রকৃত নির্মাণকারী বা প্রস্তুতকারক অর্থাৎ টেকনিশিয়ানের ন্যায্য গৌরব বঞ্চিত করে অপাত্রে দান করলেন? এর কারণ নির্ণয় করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। প্লেটো যে-দাস সমাজে বাস করতেন, সেই সমাজের স্বীকৃতিদানের মধ্যেই তাঁর চিন্তা আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর 'আইন' বই-এ তিনি লিখেছেন—"We have now made arrangements to secure ourselves a modest provision of the necessities of life ; the business of the arts and crafts has been passed on to others ; agriculture has been handed over to slaves on condition of their granting us a sufficient return to live in a fit and seemly fashion ; " [*Greek Science*, p. 107] আরো বিস্ময়কর কথা, শ্রমজীবীদের—দাসদের ঠিক মত শাসনে রাখার জন্য তিনি রিপাবলিকে 'সুমঙ্গল মিথ্যা' বা 'মহান অসত্য'-এর উল্লেখ করেছেন। কেবল প্লেটোর ন্যায় বিশ্বব্যক্তিত্বই নন, সে-যুগের প্রায় সব মহান গ্রীকদের কার্যকলাপ ছিল তৎকালীন দাস সমাজের লাক্ষণিক। শ্রমিক-মজদুরদের মনটাকে কুঁজো করে, পঙ্গু করে রাখার জন্য আইসোক্রেটিস, পলিবিয়াস, ভারো, সিসিরো প্রমুখ কুসংস্কার প্রচারে গদগদ ছিলেন। স্ট্রাবো খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে লিখেছিলেন, কবিরাই কেবল মিথ প্রচার করেন না, কবিদের বহুপূর্বে নগর ও তার আইনকর্তারা ওইসব ফলপ্রদ বলে যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাদের মতে, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত লোকেরা শিশুর চেয়ে বেশীকিছু নয়, তাদের মত তারা গল্প পছন্দ করে। নারীসমাজ ও উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে কোন দার্শনিকই যুক্তি-তর্কের, বিচারের সাহায্যে শ্রদ্ধা, পুণ্য ও বিশ্বাসে আপ্লুত করতে পারে না ; তাকে কুসংস্কার প্রচারের কৌশল নিতেই হয় ; আর তা করতে গেলে মিথ ও অলৌকিকের আশ্রয় নিতে হয়।[২৯] লক্ষ করার বিষয়, এই দু-হাজার বছরে সাধারণ মানুষের—আমজনতার মানসিকতা কমই পরিবর্তিত হয়েছে, বিশেষত ভারতীয় সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি এমন প্রযোজ্য যে,

আমরা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বস্তুত, এ-সব কুসংস্কার সমাজদেহে টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা রাজনীতি দায়ী, কতটা সংস্কার, বিজ্ঞান মানসিকতার অভাব দায়ী বা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ দায়ী, তার সঠিক বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত হয়নি। সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে পরিকাঠামো রচনা করে গবেষণা করছেন বলেও কোন তথ্য জানা নেই। কিন্তু ভুরিভুরি অ্যাকাডেমিক গ্রন্থের অভাব নেই, টন টন ভাববাদী দর্শনের বই পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করে দিলেও গবেষকদের হুঁশ নেই। কারণ, গবেষকরা, অধ্যাপকরা এ ধরনের দু-একখানি করে চর্বিত-চর্বণ করেই বড় বড় পদ অধিকার করতে পারেন, তাঁদের বই-এর পাতা দিয়ে শিশুর···ফেললেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন না।

কুসংস্কার সমাজদেহে যত টিকে থাকবে ততই শাসকশ্রেণীর ও সাকরেদদের লাভ। তাই আয়োজন যৌনধর্মী গল্প-উপন্যাসের, রসকেলিবিলাসের; রূপকথার অলৌকিকতার, রামায়ণ-মহাভারতের আজগুবী কাহিনীর; রামায়ণে দশরথের বয়সের গাছপালা নেই, আর স্বয়ং রামই তো এগারো হাজার বছর বেঁচেছিলেন; অথচ ঋগ্বেদের যুগে মানুষের একশ' বছর পর্যন্ত বাঁচার ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। পুরাণের কাহিনী, চরিত্রগুলি কেউই মানুষ নয়, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর সুন্দরীদের দেহ বর্ণনার উর্বর ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্ক যেন বীজ ছড়াবা মাত্রই ফল-ফুলে শোভিত গাছের উপযোগী; পুরাণ কর্তারা বন্ধ্যাপুত্রের বিবাহ দিতে পারেন, আকাশে তো অহরহ পুষ্প সৃজন করে বৃষ্টিপাত করেন। 'বিষ্ণুপুরাণ,' 'ভাগবৎ' ইত্যাদি থেকে আমরা অজস্র উদাহরণ দিতে পারি। কিন্তু তা এখানে সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সংগ্রামের ইতিহাস। কুসংস্কার, ইন্দ্রজাল ইত্যাদির কবল থেকে বেরিয়ে ধর্মের, দর্শনের ও রাজনীতির খপ্পরে পড়েছে। যদিও বিজ্ঞান এখন এ-সব থেকে অনেকাংশে মুক্ত হয়েছে, তবুও বিজ্ঞানীরা হননি। সারা বিশ্বজুড়ে ভাববাদী বিজ্ঞানী, অধ্যাত্মবাদী বিজ্ঞানীর অভাব নেই। এঁদের মদৎ দিচ্ছে পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক বা মুখোশধারী সমাজতান্ত্রিক সরকার। সারা বিশ্বজুড়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার রসদ সরকার যোগায় বলে বিজ্ঞানীরাও ওইসব সরকারের চাপরাশিতে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের বিজ্ঞানীদের অবস্থা বড়ই করুণ। 'সোলার সেল' নিয়ে কোন অধ্যাপক-গবেষকের সহিত আলোচনাকালে সুস্পষ্টভাবে জানা গেল

তিনি এর ব্যাপক ব্যবহারিক সাফল্যের যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে কিছু 'পেপার' তৈরী করে 'কেরিয়ার' গোছাতে আগ্রহী। তাঁর সত্যবাদিতার জন্য ধন্যবাদ। তবে তিনি একা নন, এটাই সামগ্রিক চিত্র, অবশ্য ব্যতিক্রম আছেন।

এতো গেল আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণার চিত্র। কিন্তু আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় বিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছি বলে এবার সেইদিকেই দৃষ্টি দেওয়া যাক। তবে তার আগে এই এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন সভ্য ও সংস্কৃতিতে শিখরাসীন চীনের কনফুসিয়াস মতবাদ ও তার বিজ্ঞানে কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে কিনা সামান্য আলোচনা করা যাক।

তাঁর পরিচিতি কনফুসিয়াস নামে। কিন্তু আসল নাম কনফুসিয়াস নয়—ছিউ (Qiu—551-479 B.C.)। কনফুসিয়াস ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীবিভাগের একজন সমর্থক। বিদ্যা ও জ্ঞানের সারসংকলন ও বিস্তার করে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কনফুসিয়াস অভিজাত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্বাধীন সমাজের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করে রাজা ওয়েন ও রাজা উ-র ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত আচরণবিধি তৈরী করেন এবং শ্রেণীবিভাগ ও পিতৃশাসিত গোত্রভিত্তিক সঙ্ঘবাসের মত ব্যক্ত করেন। মতাদর্শের দিক থেকে তিনি ভাববাদী।[৩০]

কনফুসিয়াস মাত্র তিনটি বিষয়ে *(theme)* আলোচনা করতেন: গাথা *(the Odes)*, ইতিহাস *(the History)* ও ধর্মানুষ্ঠান রক্ষণ *(the maintenance of the Rites)*। তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু ছিল চারটি: সংস্কৃতি, আচরণবিধি, জ্যেষ্ঠানুগত্য ও প্রতিজ্ঞা রক্ষা। আর চারটি বিষয়ে তিনি কখনো বাক্যালাপ করতেন না: অসাধারণ জিনিস, অস্বাভাবিক ক্ষমতা বা শক্তি, প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা এবং ভূত-প্রেতাদি।

তৃতীয় বাক্যালাপহীনতাটি আমাদের আলোচনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অতি স্বাভাবিক কারণের বিচ্যুতি যখন আমরা প্রকৃতিতে দেখি, তখনই আমাদের আগ্রহ, কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। যেমন, ধূমকেতু, ভূ-কম্পন বা ভূমিকম্প, গ্রীষ্মে তুষারপাত, দিনে পেঁচার ডাক, আপাত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আকাশে বজ্রনির্ঘোষ ইত্যাদি। কিন্তু কনফুসিয়াসের এইসব ঘটনার আলোচনা ও বিশ্লেষণে কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ, সমাজে এ-সবের কোন সম্পর্ক আছে বলে তাঁর মনে হয়নি। কনফুসিয়াসের এই উদাহরণ

ঐতিহ্য হয়ে দু-হাজার বছর প্রবাহিত হয়েছে।[৩১] ফলে, চীনে বিজ্ঞানের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

কনফুসিয়াস ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা বিজ্ঞানের প্রতি ছিলেন বীতরাগ। তাঁরা শাসকশ্রেণীর, অভিজাতদের পোষকতা করেছেন। তাই কনফুসিয়বাদ হয়ে উঠেছিল অভিজাত ও শাসকশ্রেণীর ধর্ম। এখানে বিজ্ঞানের প্রতি কনফুসিয়াস কিরূপ ধারণা পোষণ করতেন তার সামান্য আলোচনা করা যাক:

একবার ফ্যান স্যু (Fan Hsü) প্রভু কনফুসিয়াসকে কৃষি বিষয়ে শিক্ষা দিতে বললেন। প্রভু উত্তর দিলেন, 'আমি বৃদ্ধ কৃষকের কৃষিতে তত ভাল নই।' ফ্যান স্যু তখন হর্টিকালচার শিক্ষার কথা বললেন। প্রভু বললেন, 'আমি বৃদ্ধ উদ্যানবিদের মত তত ভাল নই।' কিন্তু যখন ফ্যান স্যু চলে গেলেন, তখন প্রভু বললেন, "ফ্যান স্যু-র মনটা কি ছোট। যখন একজন শাসক বা প্রশাসক প্রথা বা রীতি (custom), সদাচার (righteousness) ও সাধুতা (Sincerity) ভালবাসেন, তখন লোকেরা তার চারপাশে ভীড় করে তাদের বাচ্চাদের কাঁধে করে নিয়ে। সুতরাং তার (ফ্যান স্যু-র) কৃষি বা চাষবাস জেনে, শিখে কি লাভ ?"[৩২]

স্যুন ছিং (Xun Qing—Hsun Chhing—298-238 B. C.) যদিও কনফুসিয়াসবাদী ছিলেন না, এবং কুসংস্কার, ভাগ্য-গণনার আনুকূল্য করেননি, তবুও তিনি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও গবেষণার সাহায্যে তাত্ত্বিকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাওবাদীদের লক্ষ করে বলা হলো:

> You Vainly seek into the Causes of things ;
> Why not appropriate and enjoy what they produce ?
> Therefore I say—to neglect man and speculate about Nature
> Is to misunderstand the facts of the Universe.[৩৩]

চীনের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনার ইতিহাস 'কনফুসীয় মতবাদ,' 'আইনবাদ,' 'ন্যায়বাদ,' 'ইং-ইয়াংবাদ,' 'সংশয়ী বৌদ্ধ' ও 'নব্য কনফুসীয়বাদ' সামন্ততন্ত্রের আসন দৃঢ় করতেই সাহায্য করেছে। কনফুসীয়বাদ তো বরাবর বিজ্ঞানের বিরোধিতাই করেছে, আর অভিজাত ও শাসকশ্রেণীর আনুকূল্য করে ভাববাদ প্রচার করেছে। চীনে বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে 'তাওবাদ ও 'মোবাদ' (Mohism) আনুকূল্য করেছে। মোবাদের মধ্যে কিছুটা বস্তু-

বাদ দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'তাওবাদ' ও 'মোবাদ' সংশ্লেষিত হলোনা, এবং কনফুসীয়বাদ রাজা ও সরকারের স্বীকৃতি লাভ করল।

প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় রাজনীতির সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ ও সম্পর্কের সামান্য উল্লেখ করার আগে এক প্রখ্যাত লেখক ও অর্থনীতিবিদের মন্তব্য নিয়ে স্বল্প আলোচনা করা যাক। তিনি আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য একটি "তাত্ত্বিক আধারের" প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর মতে, "এই সমাজকে গঠন করাই হয়েছিল একটি সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক ধাঁচ অবলম্বন করে। সমাজ জিনিসটা সচরাচর আপনা আপনি গড়ে ওঠে, তা কোন সচেতন মনের পরিকল্পনার ফল নয়।"[৩৪] কিন্তু তাঁর মতে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ছিল এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ এই সমাজব্যবস্থা ছিল সচেতন মনের প্রয়াসের এক ছক। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রগুলিতে এই ছক দেখতে পেয়েছেন যার মূলনীতি ছিল 'এক আশ্চর্য সংগতি'। এ-সব তাঁর তাত্ত্বিক ভিত্তি। কিন্তু যে-কোন তাত্ত্বিক কাঠামোর পিছনে থাকে তথ্য যা কিনা সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে, আর তখনই তা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ও স্বীকৃতি পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক রুদ্র ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি থেকে তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেননি। তাই, তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী মননশীলতা প্রকাশ করলেও বাস্তবতা প্রকাশ করেনি স্থান-কাল-পাত্রের প্রেক্ষিতে। বস্তুত, একান্তভাবে অবরোহী পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের জন্য তা একদেশদর্শী ও ইউক্লিডীয় বিন্দুর সংজ্ঞার মত হয়ে গেছে।

অধ্যাপক রুদ্রের বর্ণভিত্তিক সমাজের তাত্ত্বিকতা নিয়ে দু-চার কথা বলা দরকার বলে মনে করি। 'জাতিপ্রথার প্রবর্তন' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আদিতে উৎপাদিকা শক্তিদের বিকাশের জন্যই এর প্রবর্তন হয়েছিল। কারণ সেই সময় প্রথাটি শ্রমের এক বিভাজন ছাড়া কিছুই ছিল না। তাঁর এই মন্তব্য ও ধারণার মধ্যে আংশিক সত্য প্রকাশিত হয়েছে, এতে রাজনৈতিক দিকটি বিবেচিত হয়নি অর্থাৎ শাসক ও পৃষ্ঠপোষক শ্রেণীর স্বার্থের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। আমাদের মতে বর্ণপ্রথা উদ্ভবের অন্য কারণ আছে। বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

ঋগ্বেদের যুগে কৃষি একেবারে অপরিচিত ছিল না। ঋগ্বেদে কৃষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও তার সংখ্যা বেশী ছিল না—মাত্র একুশবার। তাও আবার অধিকাংশই পড়ে প্রথম ও দশম মন্ডলে, চতুর্থ মন্ডলে অনেক কম দেখা যায়।[৩৫] পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিজীবীরা তাদের জীবনধারণের

চেয়ে বেশী উৎপাদন করতে সমর্থ হয় লোহার ফাল, নানা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে। ফলত, 'মহাজনপদ'-এর উদ্ভব হয়। বলি, রাজস্ব হিসাবে কৃষির কিছু অংশ রাজন্য ও পুরোহিতদের দ্বারা সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহ বা আদায় নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রশাসনিক ও ধর্মীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন আবশ্যক হয়ে পড়ে। রাজা কর, খাজনা ইত্যাদি আদায়ের জন্য কর্মচারী বা আধিকারিক নিয়োগ করেন। আবার এই ব্যবস্থাকে শক্ত ও মজবুত করার জন্য সৈন্য দরকার হয়। ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায়, এতেও রাজস্ব বা করপ্রদানকারীদের আনুগত্য নিশ্চিত হবে বলে বিবেচিত হয়নি। তাই রাজা ও রাজ্যের প্রতি সর্বসম্মত কোন রায়ের মাধ্যমে আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ে। সে-যুগে তখনো মানুষের উপজাতীয় সুলভ 'সাম্য-চরিত্র' বিলুপ্ত হয়নি ; তাদের এই রাজনৈতিক চালের কথাটি বোঝানো শক্ত হলো না যে, রাজাকে মান্য করা কর্তব্য, কর প্রদান করা দরকার, এবং পুরোহিতদের দান করা বিধেয়। এই বাস্তব প্রয়োজন থেকেই বর্ণপ্রথার উদ্ভব ; পুরুষ সুক্ত ঋষিদের দিব্যজ্ঞানপ্রসূত বললে নিছক ভাববাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কথাটি বিস্মৃত হতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে দেখা যায়, এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উত্তরাধিকার, নিম্নস্তর-বিন্যাস, আনুগত্য যা সব কিনা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য তাকেই সমর্থন ও আনুকূল্য করল। দুটি উচ্চতর বর্ণ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সর্ববিধ ক্ষমতা ও সুবিধার সুযোগ পেল ; বৈশ্যরা অধিক সম্পদশালী ও করপ্রদান করায় 'দ্বিজ' বলে গণ্য হলো। চতুর্থ বর্ণ—শূদ্ররা কেবল সেবার অধিকার পেল, জন্মগত দাসত্বের অভিধা পেল। গ্রীক-রোমান প্রেক্ষিতে উচ্চতর তিনটি বর্ণ হলো 'নাগরিক', আর চতুর্থ বর্ণ 'অনাগরিক'। বর্ণপ্রথা ক্ষত্রিয়দের কর, শুল্ক, রাজস্ব, বলি ইত্যাদি আদায়ের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করল কৃষকদের কাছ থেকে ; বণিক-কারুশিল্পীদের কাছ থেকে 'টোল'। এরই ফলে তারা পুরোহিত-ব্রাহ্মণ, কর্মচারীদের দক্ষিণা প্রদানে ও দ্রব্যে ও নগদে বেতন দিতে সামর্থ যোগাল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক শর্মার বিশ্লেষণ ভেবে দেখার মত : "The brāhmaṇical Varṇa system ideology was a clever device for regulating production, tax/gift collection and distribution. But it carried discrimatory legislation too far, with the result that it hindered new material change."[৩৬] কেবল 'material change'—কেই বর্ণপ্রথা ক্রমশ পঙ্গু করে তোলেনি, বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার সর্বনাশ করেনি,

বিদেশী আক্রমণের সময় গোটা সমাজ, দেশ ভাগ্য ও নিয়তির দোহাই দিয়ে নপুংশষত্ব প্রদর্শন করেছে।[৩৭] ভারতীয় বর্ণপ্রথার ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সম্মত বিশ্লেষণ করলে অধ্যাপক রুদ্রের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটা দুঃখের হলেও সত্য।

বর্ণপ্রথা ছাড়াও এবার আরো কিছু ভারতীয় রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গী আলোচনা করব। এই ব্যাপারে আমরা প্রধানত দুটি গ্রন্থ 'অর্থশাস্ত্র' ও 'মনুসংহিতা'-র ওপরেই আমাদের আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করব। তবে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য দু-একটি গ্রন্থের কথা বলতেই হয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের ভাবাদর্শ থেকে রাষ্ট্র ও আইন বিষয়ে ঐহিক ধারণার দিকে একটা লক্ষণীয় ভিন্নতা দেখা যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ। এই গ্রন্থে ধর্মের প্রতি চিরাচরিত ভক্তি এবং 'আইন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত' এই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয় জ্ঞান করেছে ব্যবহারিক 'উপকার' অর্থাৎ অর্থ ও তৎপ্রসূত রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি ও প্রশাসনিক আজ্ঞাগুলিকে। অর্থশাস্ত্রে অবশ্য নৈতিক-ধর্মীয় বন্ধন থেকে রাজনীতিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাই এতে অল্প পরিমাণ বস্তুবাদের লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। তবুও এতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে, আর অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের অসাম্যের ধারণা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, আর অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ করা যায়। এখানে উদাহরণ সহযোগে আমাদের মন্তব্যগুলির যথার্থ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। পাঠকগণ যে-কোন অর্থ-শাস্ত্রের অনুবাদ বা মূল পড়লেই বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারবেন। তবুও এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যায়ঃ " 'অর্থশাস্ত্র'-এ যে আইনবোধের সাক্ষাৎ মেলে তাকে বলা যেতে পারে ধর্ম বিষয়ে ঈশ্বরতান্ত্রিক ধারণাটা নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার স্বার্থে তার এক রাজনৈতিক—উপযোগি-তাবাদী ভাষ্যদানের প্রয়াস। বিমূর্ত-সাধারণীকৃত আকারে বলা যায় যে এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রে বলবৎ নিয়ম ও আইন শুধু ধর্ম অনুযায়ী নয়, যতটা তা অবশ্য-অবশ্যই রাষ্ট্র ও শাসক ক্ষমতার উপকার ও লাভ প্রকাশ করে। অন্য কথায়, স্বাধীন ও বহু ব্যাপারে নির্ধারক দিক ও মান হিসেবে আইনবিষয়ক বোধের মধ্যে থাকছে রাজনৈতিক স্বার্থের ধারণা।"[৩৮]

রাজনৈতিক-আইনী ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপত্তির সাক্ষ্য বহন করে অসংখ্য ধর্মসূত্র আর বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী রচিত লিপিবদ্ধ আইনী সংহিতা

—মনু, নারদ, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি ইত্যাদি। সে সময়কার পরিস্থিতিতে এগুলি বিদ্যাচর্চা, অধ্যাপনা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ করা আইনের প্রামাণিক আকর গ্রন্থের ভূমিকাও পালন করেছে। এই প্রামাণিকতা নির্দিষ্ট ও সংহত হয়েছিল আত্মিক জীবন ও ক্রিয়াকর্মের নির্ধারক ক্ষেত্রগুলিতে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি ও প্রাধান্যের দ্বারা। ব্রাহ্মণরা রাজক্ষমতার ওপর, তার রাজনৈতিক ও আইন-প্রণয়ন ক্রিয়াকলাপের নির্ধারক প্রভাব ফেলত ; তারাই অধিষ্ঠিত থাকত সমস্ত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচালক পদে ; তারাই নিয়ন্ত্রণ করত বিচারালয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের ভাবাদর্শী ও তাত্ত্বিকদের দ্বারা ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের রচনাটাই ধারণ করেছিল সরকারী ক্রিয়াকলাপের চরিত্র।

আইন সম্পর্কে মনুসংহিতার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই বোধ নিহিত যে, আচরণবিধিগুলি নিঃসন্দেহে পালনীয়। কারণ, তাই ধর্ম,—ঈশ্বরিক। ন্যায় ও অন্যায়, ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে পার্থক্যই হলো ঈশ্বরের সৃষ্টির ফলঃ "সৃষ্টির সময় প্রত্যেকের জন্য তিনি যে গুণ ধার্য করে দেন—অনিষ্টকারিতা বা নিরীহতা, কোমলতা বা কঠোরতা, ধর্ম বা অধর্ম, সত্য বা অসত্য, সেটা আপনা থেকেই তার মধ্যে প্রবেশ করেছে"—মনুসংহিতা-১।২৯। বর্ণের ক্রমপর্যায়, বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের অধিকার আর কর্তব্য স্থির করে দিয়ে ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুবিধা ও ঐকান্তিক এক্তিয়ারকে 'মনুসংহিতা' অন্যান্য বর্ণের প্রতিনিধিদের নিকট তার অনুজ্ঞা বলে অভিহিত করেছে। এবার মনুর অনুশাসন (১।৯৮-১০০) থেকে দেখানো যাক যেখানে ধর্মের নির্দেশ, ব্যাখ্যা ও রক্ষার প্রশ্নে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও তাদের অধিকারের ঐকান্তিক চরিত্র সমর্থিত হয়েছেঃ "ব্রাহ্মণের জন্মই হল ধর্মের শাশ্বত আবির্ভাব, কেননা সে জন্মেছে ধর্মের জন্য, তার কাজ ব্রহ্মার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। ধর্মের রত্নভাণ্ডার রক্ষার জন্য জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ সমস্ত জীবের প্রভু হিসেবে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। বিশ্বে যা কিছু বিদ্যমান তা ব্রাহ্মণের অধিকার।"[৩৯]

মনুসংহিতার ৭।৩৭, ৩৯—৪৬, ৫৪ ইত্যাদি অনুশাসনগুলি পড়লে কোন সন্দেহ থাকেনা যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র তথা মনুসংহিতারও আচরণবিধির বাধ্যতামূলক সরকারী উৎসরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল ; এসবকে বিধিবদ্ধ করার জন্য কোন আনুষ্ঠানিক আইনের দরকার হয়নি। বরং রাজা ও তার ব্যবস্থাদিরই প্রয়োজন হতো ব্রাহ্মণদের দ্বারা বৈধকরণের।

এই সংহিতার যত্রতত্র বর্ণ ও তার সভ্যদের অসাম্যের ধারণা বিধৃত। বর্ণব্যবস্থার মধ্যে ঈশ্বরের কারসাজি এনে এই অসাম্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। ভগবন্ মনু বলেছেন, সেবা ছাড়া শূদ্ররা আর যাই করুক না কেন সব নিষ্ফল। ধনসঞ্চয়ে সমর্থ হলেও শূদ্রকে তা কিছুতেই করতে দেওয়া হবেনা। কারণ, এতে ব্রাহ্মণের বড় কষ্ট হয়। অবশ্যই কষ্ট হওয়ার কথা: ব্রাহ্মণ্যগর্বে আঘাত লাগা কী চাট্টিখানি কথা! কিন্তু শূদ্ররা শোনেনি। বড় গোঁয়ার বলে রাজা হতেও ছাড়েনি। হিউএন সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় সপ্তম শতাব্দীতে "গোটা ভারতে বিভিন্ন বর্ণের রাজবংশের সংখ্যা ছিল এরকম: পাঁচটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চারটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ, দুটি বৈশ্য ও দুটি শূদ্র রাজবংশ।"[৪০] ব্রাহ্মণদের অর্থবৃদ্ধি ও কৃষকদের শোষণের ফলে ক্রমশ এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালভ্র বংশের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হলো। তামিল ভূমিতে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল, এবং ব্রাহ্মণদের বিশেষ সুবিধাগুলি বাজেয়াপ্ত করল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে মন্তব্য করে অধ্যাপক শর্মা লিখেছেন: "কথিত আছে, কালভ্রদের হাতে চোলা, পাণ্ড এবং চেরা রাজারা বন্দী হয়েছিলেন। এগুলি থেকে বোঝা যায়, কালভ্র গোষ্ঠীর বিদ্রোহ বেশ ভাল আকার ধারণ করেছিল এবং প্রভাব ফেলেছিল তামিল ভূমির বাইরে। কালভ্র বংশীয়দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধকে তাই এক অর্থে তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ হিসাবে বর্ণনা করা চলে।"[৪১]

ইতিহাসের ঘটনা পারম্পর্যের দিক থেকে দেখলে বৈদিক যুগের পর সামাজিক পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হলো বর্ণপ্রথা ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। বৈশ্য সম্প্রদায়ের কৃষি ও কারুশিল্পে উৎপাদন ও শূদ্রের কায়িক শ্রমের ওপর গড়ে উঠল বর্ণবিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। মৌর্য যুগের শেষ ও গুপ্ত যুগ থেকেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে জন্ম নিল ভূ-স্বামী সম্প্রদায় এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দিল একদিকে বর্ণপ্রথায় ভাঙন, অপর দিকে টিকে থাকার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের আপস্তম্ব, মনু, নারদ প্রমুখের আইনের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও তার প্রয়োগে সর্বশক্তি নিয়োগের প্রবণতা। স্মৃতি-শ্রুতির বজ্রআঁটুনী ক্রমশ সমাজের কণ্ঠ ও শ্বাসরোধ করতে থাকল। এ হেন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মাঝে পড়ে বস্তুবাদী চিন্তাধারা, তার চরিত্র যেখানে যতটুকু ছিল ক্রমশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে আরম্ভ করল। পরমাণুবাদী ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় যুক্তি-তর্কে, বিচার-বিশ্লেষণে ও

চরিত্রে বহুলাংশে বস্তুবাদঘেঁষা হলেও ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদের কাছে মুচলেখা দিতে বাধ্য হলো—পদার্থতত্ত্ব নির্ণয় ক্রমশ ঈশ্বরতত্ত্ব নির্ণয়ে পর্যবসিত হলো যা কিনা গঙ্গেশ উপাধ্যায় থেকে শুরু করে রঘুনাথ শিরোমণিতে চরমোৎকর্ষ প্রকাশ করেছে। অর্থশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় দণ্ডের প্রকার, কৌশল ও গৌরব নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। মনুসংহিতায় শাস্তিকে পাপ-স্খলনের উপায় হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ 'যারা অপরাধ করেছে, কিন্তু রাজদন্ড ভোগ করেছে, তারা পরিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে যাবে সৎকার্যসাধক পুণ্যবানদের মতো'—'মনুসংহিতা'—৮।৩১৮। রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে কিভাবে স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হতো, তার একটি দৃষ্টান্ত জাতক কাহিনী থেকে পরিবেশন করা যাক।[৪২]

মিত্তবিন্দক ছিলেন 'পচ্চন্ডগাম'-এর শিক্ষক। গ্রামবাসীরা তাঁকে গ্রামের প্রবেশপথে কুটীর নির্মাণ করে দিয়েছিল এবং তাঁর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করত। মিত্তবিন্দক কি শিক্ষা দিতেন গ্রামবাসীদের? তিনি সত্য কি বা মিথ্যা কি,— এই শিক্ষা দিতেন। কিন্তু মিত্তবিন্দকের দুর্ভাগ্যক্রমে (?) গ্রামবাসীদের ওপর রাজরোষ পড়ে, এবং তখন গ্রামবাসীরা সভা করে প্রতি-কারের উপায় নির্ধারণ করে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে তখন শিক্ষক মিত্তবিন্দককে উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আগেই বলেছি এটি হলো জাতকের একটি গল্প। এই কাহিনীর যদি অল্পস্বল্প কিছু বাস্তবতা থাকে বা এতে যদি কোন বাস্তব ঘটনার প্রতিফলন থাকে, তা হলে বিশ্লেষণ হলো রাজনীতির ঘোরতর প্যাঁচে পড়ে মিত্তবিন্দক 'পচ্চন্ডগাম'-বাসীদের দ্বারা গলাধাক্কা খেয়ে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতি বা কোন আইনের মারপ্যাঁচে জড়িয়ে পড়লেন কেন? আমাদের অনুমান মিত্তবিন্দক বস্তুবাদী ছিলেন, চার্বাক ভাবাদর্শের সমর্থক না হলেও কুৎস বা উদ্দালক আরুণি বা জাবালির মত বস্তুবাদী। তিনি সম্ভবত চিরাচরিত ধর্মীয়-দর্শন বা ভাবাদর্শ যা কিনা পরিপূর্ণভাবে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের পোষক তা প্রচার না করে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এ-সবের বিচার-বিশ্লেষণ করে জনসাধারণকে অবহিত করাচ্ছিলেন। কিন্তু শাসকের আসন অক্ষুণ্ণ রাখতে বা ব্রাহ্মণদের সুযোগ-সুবিধা আধিপত্য বজায় রাখতে, এবং সেই সঙ্গে গ্রামশাসক কর্মচারীর[৪৩] শ্রেণী বৈষম্য সুদৃঢ় করতে মিত্তবিন্দকের এহেন নাস্তিকতামূলক পাষন্ডধর্মিতা সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু কোন সম্মানীয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় দার্শনিক-পন্ডিতের বা শিক্ষকের ওপর সরাসরি রাজ-

আক্রমণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে বলে রাজা বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বা গ্রামশাসক কর্মচারী গ্রামবাসীদের ওপর প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করেছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিরিখে বলা যায়ঃ "সামাজিক চেতনার প্রত্যেকটি রূপ—রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক, নান্দনিক, দার্শনিক বা ধর্মীয় রূপগুলি সামগ্রিক সত্তার একটি নির্দিষ্ট দিককে প্রতিফলিত করে। শ্রেণীসমাজে এ ক্ষেত্রে মুখ্য দিক হল—রাজনৈতিক চেতনা।"[৪৪] সুতরাং ধর্ম, দর্শন বা বিজ্ঞান ইত্যাদি রাজনীতি-গন্ধহীন বলে 'নেও' করার মানে হয় না।

অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী মানুষ বোধ হয় লেনিনের এই কথাটা স্বীকার করবেন যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য বস্তুবাদী ধারণা ও ভাবাদর্শ শ্রেয়। ভারতে যতদিন বস্তুবাদী ধারণা ছিল, অন্তত বস্তুবাদ ও ভাববাদ পরস্পর মিথস্ক্রিয়ায় অন্বিত ছিল বা বিরোধী সমাগম ছিল, ততদিন পরমাণুবাদের ধারণা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য অল্প হলেও কিছু কিছু চিন্তানায়কের আবির্ভাব হয়েছিল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শঙ্করের ত্রিশূল আক্রমণ ঠেকাবার জন্য প্রতিভাধর ন্যায়-বৈশেষিকদের অভাব অবশ্য এদেশে হয়নি। কিন্তু তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ করে নয়, তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরবর্তী ভক্তিবাদীরা যা করলেন, তাতে বৈশেষিকের বাস্তবতার চিহ্নটুকু বিলুপ্ত হলো, আর নৈয়ায়িকরা ক্রমশ বিষয়ের সারবত্তা হারিয়ে কন্টকিত পরিভাষার আশ্রয় নিয়ে সব কিছুর বারোটা বাজাতে থাকলেন। শঙ্কর স্বয়ং কোন যুক্তির ধার ধারতেন না। তাঁর পরমাণুবাদ খণ্ডনের একমাত্র বক্তব্য হলো তা শাস্ত্র অনুমোদিত নয়, ভগবন্ মনু স্বীকার করেননি। অথচ মজার কথা, আচার্য শঙ্কর মায়ায় ঘেরা পৃথিবীর দুগ্ধ-ঘৃত-অন্নাদি গ্রহণ করে বাঁচবেন, অপরের উদ্বৃত্ত ভোগ করবেন, তাকেই ভুয়ো—বেবাক মিথ্যে বলে প্রচার করবেন। এহেন উক্তি বা বচন কোন ঐতিহাসিক যুগে সম্ভব তার বিচার করার সময় কি এখনো আসেনি? উপনিষদ "খুনে যদি মনে করে সে খুন করেছে, নিহত যদি মনে করে তাকে খুন করা হচ্ছে—উভয়ের পক্ষেই মনে রাখা দরকার, এই আত্মাকে খুন করাও যায় না, আর হত্যা করাও অসম্ভব"[৪৫] প্রচার করবে কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তার বিশ্লেষণ করার অবকাশ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ী পণ্ডিতদের আর কত দিনে হবে?

ইতিপূর্বে শাসক, প্রবল প্রতাপ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কুসংস্কার কেন প্রচার

করেন, কেন এ-সবের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, সে-সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করেছি। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা কোসাম্বীর উদ্ধৃতিও তুলে ধরেছি। প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষ বা গণনায় রাজা-প্রজা, বিদ্বান-মূর্খ সকলেই আস্থা স্থাপন করতেন এই ভেবে যে ওই বিষয়টি বিজ্ঞান—জ্যোতির্বিজ্ঞান যা কিনা গাণিতিক গণনার সূক্ষ্মতার ওপর স্থাপিত। কিন্তু আসলে তা নয়, জ্যোতিষ শুদ্ধ গাণিতিক গণনার পর্যায়ে পড়ে না। কিন্তু মানুষের 'স্বভাব' বিফলতা ভুলে যাওয়া, আর কাকতালীয় সফলতা স্মরণ করা। জ্যোতিষ গণনায় হাজার ভুলের মধ্যে মাত্র কাকতালীয় একটা কথা সফল হলেই শাস্ত্রটি নির্ভুল, বিজ্ঞান বলে প্রচারিত হচ্ছে। আমরা এখানে তেমন একটি গণনার কথা উল্লেখ করব যা দেশের সর্বনাশের সূচনা করেছিল। এটি লিপিবদ্ধ করেছেন ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাষিরী'-তে। মহম্মদ বক্‌তিয়ার তখন বিহার জয় করেছেন। একদল জ্যোতিষী ও জ্ঞানী-বিদ্বান লক্ষ্মণ সেনের কাছে দরবার করে বললেন তাঁদের 'প্রাচীন ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে লেখা আছে যে দেশ তুর্কীদের হাতে পড়বে। তাঁরা সেনরাজকে দৃঢ়ভাবে বললেন বিহার পদানত হয়েছে, আগামী বছর বাংলার পালা। তাঁরা রাজাকে উপদেশ দিলেন দেশত্যাগ করতে যাতে তাঁরা তুর্কীদের হাতে নিগৃহীত না হন। সবাই জানেন যে, লক্ষ্মণ সেন এঁদের কথা শোনেননি, কিন্তু দেশরক্ষা করতেও পারেননি। অবশ্য রমেশচন্দ্র এর পৃথক কারণ নির্দেশ করেছেন তাঁর বাংলা দেশের ইতিহাসে। দীনেশচন্দ্রও মুসলমানদের হাতে এই পরাজয়ের জন্য লক্ষ্মণ সেনের দরবারের জ্যোতিষীদের দায়ী না করে পারেননি।[৪৬]

এ যুগে বিজ্ঞানের বিকাশ-সমৃদ্ধি, গবেষণা, জাতীয় চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদি নির্ধারিত হয় অবিজ্ঞানী ও তাঁবেদার বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের দ্বারা। আমাদের দেশে 'বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এর উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রনেতা। Science and Technology in India গ্রন্থে এ. রহমান প্রশ্ন তুলেছেন "Why in the Indian political leadership involved so much with Science and Technology ?...Is it something new or is it part of the Indian tradition ? দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত অধ্যাপক-লেখক এ. রহমান এই দুটি প্রশ্নের একটিরও সুস্পষ্ট উত্তর দেননি। আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর নানাভাবে দেবার চেষ্টা করেছি। প্রথম প্রশ্নের

উত্তর খুব সহজেই দেওয়া যায় যদি আমরা জাতীয় বিজ্ঞান পরিচালনায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ইত্যাদিতে GNP ব্যয়ের চিত্রটি তুলে ধরি।[৪৭]

প্রথমে 'Research ও Development' ব্যয়ের হিসাবটুকু তুলে ধরা যাক :

বছরে R & D এবং S & T উভয় ক্ষেত্রেই G N P ব্যয় কম ধরা হয়েছে। এটা খুবই বিস্ময়কর যে, স্বাধীনতার ৩৪।৩৫ বছর পরেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, গবেষণা ও বিকাশের নানা ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় আয়ের এক শতাংশও ধার্য হয়নি। যে-দেশের ঐতিহ্যে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের অর্থপ্রাপ্তি আই. এ. এস.-দের ওপর নির্ভর করতে হয়, সে-দেশে পরমাণুবাদের মত বস্তুবাদী ভাবনা, চার্বাকদের কট্টর বস্তুবাদ যে কৃষ্ণ গহ্বরে (Black Hole) নিক্ষিপ্ত হবে, তাতে সন্দেহের খুব বেশী অবকাশ নেই। ভাববাদের প্রবল আধিপত্যে দেশ ও জাতি প্রাণশক্তি হারিয়েছে, অবক্ষয়ী মূল্যবোধ দেশকে গ্রাস করেছে। এই হতাশজনক পরিস্থিতির পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে সমাজকে বোধ হয় এই কথাটা ভাবতে হবে যে,…"Society can prevent a potential advance entirely by diverting the resources and manpower elsewhere or by establishing an intellectual climate in which particular classes of question will not be asked."[৪৮] কিন্তু সবার আগে ভাবতে হবে ৬৪/৬৫ শতাংশ নিরক্ষরের কথা, আর দশ বছরেই সারা বিশ্বের অর্ধেক নিরক্ষর এদেশে থাকবে তাদের কথা। তা না হলে যারা পিছনে পড়ে থাকবে তারা টেনে উল্লম্ফনকারীদের ধূলিলুণ্ঠিত করাবে; দেশে ওই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানী ছাড়া আর ভাবা-সত্যেন্দ্র-মেঘনাদ দেখা দেবে না।

ভারতে বিজ্ঞানে বিপ্লব : অন্বেষণ

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রশ্নটি উঠেছে যে, বিশ্বের অন্যত্র বিজ্ঞানে বিপ্লব না ঘটে ইউরোপে ঘটল কেন। এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই আর একটি প্রশ্ন হলো এশিয়ায় বিজ্ঞানে বিপ্লব না ঘটে ইউরোপে ঘটল কেন। ভেবে দেখলে, দুটি প্রশ্নে পার্থক্য নেই। বস্তুত প্রথম প্রশ্নের 'অন্যত্র' বলতে এশিয়াই বোঝায়। আবার 'এশিয়া' বলতে আমরা সাধারণত তিনটি দেশের কথাই বুঝি যেখানে প্রাচীন বা মধ্যযুগ থেকে বিজ্ঞানে একটা গৌরবময় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এই তিনটি দেশ হলো চীন, ভারত ও আরব তথা মধ্য-প্রাচ্য। চীন ও ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। সুতরাং সামাজিক চেতনার সব দিকের ব্যাপকতা যে এ-সব দেশে থাকবে তাতে সন্দেহ করার হেতু নেই। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্য বা আরবের সভ্যতার ধারাবাহিকতা তেমন প্রাচীন নয়, ইরাককে বাদ দিলে। হজরৎ মহম্মদের আবির্ভাবের পর থেকে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির জাগরণ, এবং তা মধ্যযুগ পর্যন্ত বেশ বেগবতী ও শক্তিশালী ছিল। যদিও আরবীয় চিন্তাবিদ ও মনস্বীদের মনন গঠনে ভারত ও গ্রীসের লক্ষণীয় ভূমিকা রয়েছে, তবুও তাঁদের গ্রহণ, স্বীকরণ ও স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার উপায় নেই। হজরৎ মহম্মদ তাঁর সময়ের বিশ্বশ্রেষ্ঠ,—এতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব আরবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উৎকর্ষ তা তাঁরই ব্যক্তিত্ব, মনস্বিতা ও উদ্দীপন-ক্ষমতার ফল।

আমাদের আলোচনায় ব্যাপক ও জটিল প্রশ্নটিকে আমরা ছোট করে নিয়েছি অর্থাৎ আমরা একটা নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তেই সীমাবদ্ধ থাকব। আমরা কেবল ভারতে কোন কালে বা যুগে বা ঐতিহাসিক পর্বে বিজ্ঞান-বিপ্লব সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল কিনা তার সম্ভাবনা সমীক্ষা করার প্রয়াস পাব। অবশ্যই কাজটি যেমন জটিল, তেমনি বিতর্ক-বিতণ্ডা সূচনার অবকাশ এতে রয়েছে। ইতিবাচক, গঠনমূলক আলোচনা অবশ্যই কাম্য,—এই আহ্বান সর্বশ্রেণীর কাছেই রইল। এই প্রসঙ্গে বলা রাখা ভাল যে, এ-নিয়ে একটি বই লেখা যেতে পারে। তাই, এখানে আমরা কেবল সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবো।

পাশ্চাত্যে তথা ইউরোপে বিজ্ঞান-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লব ঘটার পিছনে যে-সব উপাদান কার্যকর ছিল, তা নিয়ে ঐক্যমত্যে আসতে পারেননি। কেউ বলেন, সঠিক

ও যথার্থ 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' এই বিপ্লবের কারণ, আবার কেউ বলেন, 'অনন্যসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব' ; গণিতের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও অধ্যয়নকেও বিজ্ঞান-বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে গণ্য করা হয় ; আবার ধর্মের প্রতিবন্ধকহীনতা, উদারতাকেও কেউ কেউ আলোচনায় টেনে আনেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-সবের কোনটাই বিজ্ঞান-বিপ্লবের সন্তোষজনক ও সর্বাদিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। সুতরাং বিষয়টি যে জটিল তাতে সন্দেহ নেই। জিলসেল (Zilsel) মার্কসীয় পথ অবলম্বন করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা এখানে প্রথমে তাঁর চারটি তথ্য পরিবেশন করব[৪৯] এবং সেই আলোকে ভারতীয় বিজ্ঞানে বিপ্লবের সম্ভাবনা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

সর্বপ্রথম জিলসেল বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সহিত ইউরোপীয় পুঁজিবাদের উত্থানকে সম্পর্কিত করেন এবং মন্তব্য করেন যে, প্রথম দিকে পুঁজিবাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিক spirit-এর উদ্ভব ও বিকাশে সহায়তা করেছিল। এগুলি হলো ঃ

১। সামন্ততন্ত্রীয় মধ্যযুগে নাইট সম্প্রদায় তাঁদের দুর্গে, ও ধর্ম-যাজকরা তাঁদের গ্রামীণ মঠে ছিলেন সমাজের প্রধান উপাদান হয়ে। কিন্তু পুঁজিবাদের উত্থানের সাথে সাথে নগর হয়ে উঠল সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু, আর বণিক ও কারুশিল্পীদের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেল। বিজ্ঞান সামরিক ও পারলৌকিক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত না থেকে নতুন পরিবেশে আনুকূল্য পেল বিকাশ ও সমৃদ্ধির।

২। এই যুগে যন্ত্রপাতির দ্রুত বিকাশ ও বৃদ্ধির ফলে ম্যাজিক্যাল চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে যুক্তি-তর্কমূলক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটল। এর ফলে বিজ্ঞানের সাহায্যে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলি সমাধান করার সুযোগ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেল।

৩। এই সময় কারিগর, হস্তশিল্পী ও কারুশিল্পীদের গোষ্ঠী-চেতনা এবং ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ অনুরক্তি ও ঐকান্তিকতা দুর্বল হয়ে পড়ল। মানুষের স্বাতন্ত্রবোধ, ব্যক্তিচেতনা বৃদ্ধি পেল ; মানুষ আর এক ছাতার তলায় অবস্থান করতে চাইল না। স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ব্যক্তিচেতনা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের যুক্তিতর্কমূলক চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল।

৪। গণনা ও পরিমাপের ওপর পুঁজিবাদের ভিত্তি কীরূপ নির্ভরশীল তা আর বিস্তারিতভাবে না বললেও চলে। বুক-কিপিং, মেশিনের ব্যবহার—কেবল মালপত্র, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্যই নয়, কাঁচা মালের পরিমাপ ও গুণাগুণ পরীক্ষা এবং উৎপাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে গণিতের যে অপরিহার্য ব্যবহার ও প্রয়োগ, তা বোধ করি এযুগে কারুর অজানা নয়। এই প্রসঙ্গে প্যাসিওলি (Luca Pacioli) ও সাইমন স্টেভিনের (Simon Stevin) গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম জনের *Summa dc arithmetica* গ্রন্থে বুক-কিপিং-এর 'double entry' আলোচিত হয়েছে, আর দ্বিতীয় জন যিনি গতিবিদ্যায় গবেষণার জন্য খ্যাত তাঁর গ্রন্থে দশমিক ভগ্নাংশ আলোচনা করেছেন। স্টেভিন তাঁর পত্রটি (Paper) উৎসর্গ করেছেন ঃ জ্যোতির্বিদ, সার্ভেয়ার, ট্যাপিস্ট্রি ও ব্যারেল পরিমাপকারী, মুদ্রাবিদ ও বণিকদের উদ্দেশে। কোপারনিকাসও মুদ্রা পদ্ধতি সংস্কার করে কিছু লিখেছিলেন।

রেনেসাঁসের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতমণ্ডলী ও বুদ্ধিজীবিরা অভিজাত, বণিক ও ব্যাঙ্কারদের সহিত একত্রে সমাজের উঁচুতলায় অবস্থান করতেন। বুদ্ধিজীবীরা ল্যাটিন ব্যবহার করতেন। কারিগর, নাপিত প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্যের মধ্যে ছিলেন না। শিল্পীদের 'হোয়াইট ওয়াশার' ছাড়া আর কিছু মনে করা হতোনা। কিন্তু এইসব তথাকথিত সমাজের নীচুতলার মানুষরাই ছিলেন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভাবক। যেমন, নৌ-কম্পাস, কাগজ তৈরী, ব্ল্যাস্ট ফার্নেস ইত্যাদি। এঁদের কারুর প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, তাঁরা মাতৃভাষাই সর্বত্র ব্যবহার করতেন। কিন্তু বিকাশের গতি ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে অধিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য শিল্পী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করলেন। জিলসেলের মতে, প্রকৃত বিজ্ঞানের জন্ম হলো তখন যখন অ্যাকডেমিশিয়ান ও কারিগরদের মধ্যে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর সংযোগ স্থাপিত হলো, একে অপরের সমস্যা সমাধানে পরস্পর সাহায্যের দরাজ হস্ত প্রসারিত করলেন ; তত্ত্ব, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ত্রিবেণী-সঙ্গম সাধিত হলো। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি চিঠিতে ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের সম্পর্কটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে লিখেছেন ঃ "যদি প্রকৌশল (technique) বহুল পরিমাণে বিজ্ঞানের অবস্থার ওপর নির্ভর করে, তা হলে বিজ্ঞান তার চেয়েও বেশী

পরিমাণে প্রকৌশলের অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে। যদি সমাজের প্রকৌশলমূলক চাহিদা থাকে, তা হলে তা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীতে পাহাড়ী নদী নিয়ন্ত্রণের জন্যই সমগ্র হাইড্রোস্টাটিক্স অধ্যয়ন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।"[৫০]

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জিলসেল বিজ্ঞান-বিপ্লবের যে-ক'টি উপাদান উপস্থাপিত করেছেন, ভারতে প্রাচীন বা মধ্যযুগে কোন সময় এ-ধরনের উপাদনগুলির কিছু কিছু অস্তিত্ব ছিল কিনা আলোচনা করা যাক।

ইতিহাস থেকে আমরা জানি প্রাচীন ভারতে মগধ ও মৌর্য যুগে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ক্রমশ বিস্তার হতে থাকে, এবং মৌর্য যুগে তা শক্তিশালী হয়। শুধু তা নয়, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে 'দ্বিতীয় নগরায়ণ' শুরু হয়। উজ্জয়িনী, শ্রাবস্তী, পাটলিপুত্র, গিরিব্রজ, চম্পা অর্থাৎ সমগ্র গাঙ্গেয় অববাহিকায় চম্পা পর্যন্ত নগরায়ণ দ্রুত সংঘটিত হয়। ওই প্রক্রিয়া ষোড়শ জনপদেই চলছিল। পাটলিপুত্র ছিল সবচেয়ে বড় নগর প্রায় পঁচিশ বর্গকিলোমিটারের বেশী।[৫০ক] সে তুলনায় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল এর এক-তৃতীয়াংশ, এ-যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো লোহা খনির ব্যাপ্তি ও ব্যবহার। কৃষি ও কারুশিল্পে লোহা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। লোহা দিয়ে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করা ছাড়াও কৃষির যন্ত্রপাতি, বিশেষত লাঙলের ফলা তৈরী হচ্ছিল। ফলে কৃষিকাজ ও তার ফলাফলের প্রকৃতিতে গুণগত পরিবর্তন হয়েছিল। প্রাচীন গ্রন্থ বৌদ্ধ 'সুত্ত-নিপাত'এর এক উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে, এক ব্রাহ্মণ লাঙল দিয়ে জমি চাষ করছিলেন, আর সেই লাঙলের ফলা এমন গরম হয়ে উঠেছিল যে তা জলে ডোবাতে হয়। তখন ধান, গম, যবই ছিল প্রধান শস্য। উত্তর ও মধ্যভারতের প্রাচীন নগরবসতিগুলিতে খননকার্য চালিয়ে চালের দানা পাওয়া গেছে।

এ-যুগে সেচের ব্যবস্থাও ছিল। সৌরাষ্ট্রে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি উৎকীর্ণ লিপিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালের মত অত প্রাচীনকালেই একটি জলাধার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তা ছাড়া মেগাস্থিনিসও সেচব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন।

কারুশিল্পও এই সময়ে অত্যন্ত উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। বিশেষত, তাঁতশিল্প, ধাতুশিল্প ও মণিকারের কাজ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। বারাণসী, মথুরা ও উজ্জয়িনীর তাঁতশিল্পীদের বোনা সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র

সর্বোৎকৃষ্ট বলে গণ্য হতো। ভারতের সূতীবস্ত্র বারিগাজা হয়ে পাশ্চাত্যে রপ্তানি হতো। অর্থশাস্ত্রের সাক্ষ্যে নানা ধাতুশিল্পের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এমন কি গ্রামের মানুষ ছুতোর, কুমোর ও কামারদের সম্ভ্রমের চোখেও দেখতেন। কারুশিল্পীদের সমবায় সঙ্ঘ ছিল। কিন্তু এতে রাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিলনা; বস্তুত এই সঙ্ঘ বা 'শ্রেণী, অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিল।

এই যুগেই অজীবিক সম্প্রদায়, বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম, ন্যায়-বৈশেষিক ও বস্তুবাদী চার্বাক বা লোকায়ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়। ফলে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা জনমানসে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে থাকতে পারেনি। তা ছাড়া এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এমন একটি শ্লোক পাই যার অর্থ হলো "শাস্ত্রে বুধ হতে হলে অর্থাৎ জ্ঞানী হতে হলে বিভাজন-কৌশলে জ্ঞান থাকা চাই, অন্যান্য শাস্ত্রাদি জানার কৌতূহলও থাকা চাই, শিল্পী ও স্থপতিদের যথোচিত সমাদর করা চাই।"[৫১] তা ছাড়া বস্তুবাদ কেবল একটিমাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীনকালে ভাববাদ ও বস্তুবাদে নির্দিষ্ট সীমারেখা না থাকায় বেদবাদী ঋষিরাও বাস্তববাদকে একেবারে ফুঁ করে উড়িয়ে দেননি। যেমন, মহাভারতের শান্তিপর্বে ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদে ভরদ্বাজ উত্থাপিত প্রশ্নসমূহে আদিসাংখ্য, ন্যায়-বৈশেষিকের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বাস্তববাদের অংকুরোদ্গমও দেখা যায়। এমন কি, তাঁর যুক্তিজালে ভগবন্ ভৃগু গর্ণভিত্তিক বর্ণব্যবস্থা ত্যাগ করে অন্যকথা বলতে বাধ্য হয়েছেন।[৫২] তা ছাড়া দশরথের অন্যতম মন্ত্রী জাবালি তো চার্বাক বা লোকায়তের কথাগুলিই উদ্ধার করে রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য প্রয়াস পেয়েছেন।[৫৩]

মগধ ও মৌর্য যুগ বিশিষ্টতা অর্জন করে রয়েছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষণীয় বিকাশের জন্য। এই সময়েই জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যাকরণ সংক্রান্ত বহু বিজ্ঞান গ্রন্থ রচিত হয়। ব্যাকরণে পাণিনি বিশ্ব-ভাষাবিজ্ঞানে অনন্য ও একক। তা ছাড়া কাত্যায়ন, পতঞ্জলি তো আছেনই। জীবক, চরক ও সুশ্রুতের মত প্রতিভার আবির্ভাব এই সময়েই; বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এই সময়ে, সূর্যসিদ্ধান্ত পরে লেখা হলেও মাঝে মাঝে সংস্কৃত ও সম্পাদিত হলেও আদি সূর্যসিদ্ধান্ত এ যুগেই; তা ছাড়া শুল্বসূত্রের কথা বলাই বাহুল্য।

মগধ ও মৌর্য রাজাদের শাসনকালে প্রাকৃত ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। অশোকের অনুশাসনগুলি তো রচিত হয় প্রাকৃত ভাষাতেই। এ যুগেই অর্থশাস্ত্রের মত মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়। "প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবনে বিরাট সাফল্যের মূল্যে ছিল প্রত্যক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজ-বিকাশের ক্ষেত্রে সামগ্রিক প্রগতি,"[৫৪] —ঐতিহাসিকদের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয়।

'সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ' তখনো বহুদূরে কমপক্ষে তিন-চারশ' বছর। সুতরাং ভারতীয় সমাজে তখনো যুক্তিতর্কের প্রাধান্য, বাস্তববাদের প্রতি কুণ্ঠা ও ভ্রূকুঞ্চন নেই; বর্ণভেদ তখনো জাতপাতের কড়াকড়িতে পর্যবসিত হয়নি; ব্রাহ্মণ রাজা হয়েছে, শূদ্র রাজা হয়েছে; বৈদিক ক্রিয়া-কর্মের চেয়ে তার জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, —মহাভারতের শান্তিপর্বে ধর্মধ্বজ ও সুলভা সংবাদে তার সামান্য ইঙ্গিত দেখা যায়।[৫৫] বস্তুত মগধ ও মৌর্য যুগের শেষ অর্থাৎ প্রায় খ্রীষ্ট্রীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক বিকাশ ও সমৃদ্ধির বিষয় সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করলে আমাদের স্বতঃই মনে হয় ওই কালপর্বে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সম্ভাবনার বীজ নিহিত ছিল। তার ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া যায় শুল্বসূত্র, বকশালী পাণ্ডুলিপি, আর্যভট, দ্বিতীয় ভাস্কর, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখের উজ্জ্বল বাস্তবতায়।[৫৬]

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের *Science and Society in Ancient India*, রামশরণ শর্মার *Ancient India, Material Culture and Social Formations in Ancient India* ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ।

২. বিস্তারিত বিবরণ *Atom and Self* গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার কথা যে অধ্যাপক কোঠারী বুঝতে পারেননি, সে কথা সুস্পষ্টরূপে জানতে হলে অধ্যাপক সাহার দুটি বাংলা প্রবন্ধ পড়া একান্ত দরকার। প্রথম প্রবন্ধ 'সবই ব্যাদে আছে' নামে 'ভারতবর্ষ' আষাঢ় ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে একই পত্রিকায়, ফাল্গুন, ১৩৪৬ (ইং ১৩৪০) সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাঁর 'বেদ'-কে 'ব্যাদ' বলার কারণ বিশ্লেষণ করার পর তিনি লিখেছেন,—"···বিগত কুড়ি

বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ, এবং জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, ওই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।···দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।"

"পুরাতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক চিন্তা উৎখাত করার প্রয়াসে খ্রীঃ পূঃ ২১৩ সালে শি হুয়াং তি প্রকাশ্যে বিরাট সংখ্যক পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেন।—যে সকল পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীরা নূতন শাসন-ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন অথবা যারা বর্তমানকে আক্রমণ করে প্রাচীনের প্রশংসা করেন তাদের জীবন্ত কবর দেওয়া

হয়” ও কাউকে কাউকে মহাপ্রাচীর নির্মাণে বাধ্য করা হয়।’
—‘চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস’।

১৮. “চার্বক সম্প্রদায় যদিও বেদবিরোধী, তথাপি তাঁহাদের বস্তুবাদী দার্শনিক সিদ্ধান্তের (materialism) প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য যে তাঁহারা ‘বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্গত মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের শরণ লইতে কুণ্ঠিত হন না, ইহা ‘সর্বদর্শনসংগ্রহ’-কার দেখাইয়াছেন! এই স্ববিরোধ বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক।” শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য কি জন্য ‘কৌতূহলোদ্দীপক’ বলেছেন বোঝা যায় না। প্রথমত, মাধব ছাড়া আর একথা কেউ বলেননি। সুতরাং মাধবের কথা আমাদের সত্য বলে গ্রহণ করতে আপত্তি আছে অন্য প্রমাণ্য বিষয়ের অভাবে। আর সত্যিই চার্বাকরা ওই কথা বলে থাকলে ভাববাদী, দার্শনিকরা যেমন, শঙ্কর, জয়ন্ত প্রমুখ চার্বাকদের তুলোধুনা করে ছাড়তেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে যে-সব টীকা-টিপ্পনির আয়োজন করেছেন এতে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকায় হতাশ হতে হয়। বস্তুত, মাধব তাঁর গ্রন্থে চার্বাক অভিমত বর্ণনে বহুলাংশে নিরপেক্ষ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।—‘চার্বাকদর্শনম্,’ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ।

১৯. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ—‘ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে,’ পৃ—১৬৪

২০. প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-বয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং-তত্ত্ব-জ্ঞানা-ন্নিঃশ্রেয়সাধিগম ঃ ।।

২১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ,—‘ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে,’ পৃ—১২৯; ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২২. ‘জাবালা-সত্যকাম’ কাহিনীর বিকৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থিক প্রকাশক ‘উপনিষদ সংগ্রহ’-এর ছান্দোগ্য, পৃ—১১১-১১৭ দ্রষ্টব্য। সম্পাদক জাবালার জাব্ কেটে ও সত্য-কাম পৃথক করে ভাববাদীদের চিরা-চরিত পথ অবলম্বন করেছেন। এ-সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস ‘ধর্ম প্রসঙ্গে’ দ্রষ্টব্য।

২৩. শিরোমণি, রঘুনাথ—‘পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্’, সম্পাদনা—মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য, পৃ—১৪-১৬, মূল-১০-১২

২৪. কর্ণফোর্থ, মরিস—‘দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ,’ দ্বিতীয়খণ্ড, অনুবাদঃ ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ—১১৮

২৫. Rose and Rose—*Science and Society*, p. 66

২৬. Ibid, P. 270

২৭. Ibid, p. 269, পাদটীকা।

২৮. Farrington, B—*Greek Science*, p. 18

২৯. Ibid, p. 253

৩০. ‘চীনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,’ পৃ—১২-১৩ ; *An Outline History of China*, p. 109—113 ; রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস’, পৃ-১০৯-১২১ দ্রষ্টব্য।

৩১. Needham, J—*Science and Civilisation in China*, Vol-2, p. 14-15

এখানে আমরা নীডহামের বই-এর ১৫ পৃষ্ঠা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি : “Hu Shih is surely right in saying that Hsun Tzu’s codification of the Confucian position was a sign of the downfall of the most glorious era of Chinese thought. There was no room for science (in Confuciasm),”... ;

৩২. Ibid, p. 9

৩৩. Idid, p. 28

৩৪. রুদ্র, অশোক—‘ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দুমন,’ পৃ—১৭৬

৩৫. Sharma, R. S.—*Material Culture and Social Formations in Ancient India*, p. 39

৩৬. Ibid, p. 164

৩৭. Kosambi, D. D.—*The culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline*, p. 52, 175

৩৮. 'রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস,' খণ্ড ১, পৃ—১০৪, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৩৯. তদেব, পৃ-৯৯

৪০. 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', পৃ-১৮৬, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৪১. শর্মা, রামশরণ—প্রাচীন ভারত, পৃ—২১০

৪২. Bose, A. N.—*Social and Rural Economy of Northern India (600 B. C.—200 A. D.)*, p. 81

৪৩. সরকার, দীনেশচন্দ্র—'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ', পৃ—১৫৩-১৫৪

৪৪. 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী ?' পৃ-১৫১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

৪৫. 'কঠ উপনিষদ'—১।২।১৮-১৯ ; 'গীতা'—২।১৯-২০

৪৬. Sircar, D. C.—*Society and Administration of Ancient and Medieval India*, p. 170-171 ; জ্যোতিষ

সম্পর্কে কুসংস্কার, তার ঐতিহাসিক আলোচনা উক্ত গ্রন্থের 163-173 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪৭. আমি A. Rahaman-এর *Science and Technology in India* গ্রন্থখানি পড়ার সুযোগ পেয়েছি NISTDS-এর ডাইরেকটর ডঃ অশোক জৈন মহাশয়ের বদান্যতায়। এই সুযোগে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

৪৮. Rose & Rose—*Science and Society*, p. 243

৪৯. Singh, Virendra—*Science Age*, p.

৫০. Ibid, p. 7

৫০. (ক) Nagchoudhury, B. D.—*Technology and Society*, p. 20 ; এই ছোট গ্রন্থটিতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ্যার সহিত নানা সম্পর্ক আলোচনা করেছেন : প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রাচীন মানবজাতি ; প্রযুক্তিবিদ্যা ও সমাজ ; প্রযুক্তিবিদ্যা ও সরকার ; প্রযুক্তিবিদ্যা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি। নগরায়ণ ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে অধ্যাপক নাগচৌধুরীর মন্তব্য : *'Urbanization to a large extent is a product of technology'*.

৫১. Chattopadhyaya, D. P.—*Science and Technology in Ancient India*, p. 170

৫২. 'মহাভারত,' অনুবাদ ঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ, রিফেক্ট প্রকাশন, ৩য়, পৃ—৫৫১-৫৬১
৫৩. 'রামায়ণ,' অনুবাদ ঃ হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, রিফেক্ট, পৃ—৩৩৩
৫৪. আন্তোনভা, বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভস্কি—'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' পৃ—১৪১
৫৫. 'মহাভারত,' পৃ—৭৯১·········
৫৬. মাইতি, নন্দলাল—'ভারতের বিজ্ঞান বিপ্লব ঃ আত্মহত্যার কাহিনী,' জ্ঞান বিচিত্রা,

নবম অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও উপসংহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে ভারতীয় পরমাণুবাদের উদ্ভব ও বিকাশের এক নবমূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছি আমরা। একথা সত্য যে, বিষয়টি খুবই জটিল, তাই বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে। তবুও আধুনিক গবেষণার ভিত্তিতে আমরা প্রাচীন ভারতের সমাজগঠন, রাষ্ট্র-রাজনীতি, দার্শনিক ভাবনা ও ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাপূর্ণ পরমাণুবাদকে অন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছি। সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতের অর্থনীতিক বিকাশ সম্বন্ধযুক্ত করার সার্বিক প্রয়াস চালিয়েছি আধুনিক তথ্য অবলম্বনে। আমাদের তথ্য কেবল সেই সেই বিষয়ভিত্তিকই নয়, তার সঙ্গে উৎকীর্ণ লিপি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যেমন, মুদ্রা, মৃন্ময় পাত্রাদি প্রভৃতিকেও সুযোগমত গ্রহণ করেছি। একথা আমরা বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, আমরা ঐতিহাসিক তথ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির কোথাও কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিইনি, প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের পথ অবলম্বন করে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিচার বিশ্লেষণ করেছি। এই গ্রন্থে কোথাও গল্প-কাহিনীকে তথ্যরূপে গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু যেখানে সে-সবের উল্লেখ আছে তা তথ্যসহযোগে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

একটি কথা সুস্পষ্টরূপে স্বীকার করা দরকার যে, প্রাচীন ভারতীয় পরমাণুবাদের উদ্ভবের কোন নির্দিষ্ট উৎস খুঁজে পাইনি আমরা। এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে যে, বিষয়টি বা সমস্যাটি বোধ হয় ওইভাবে দেখা ঠিক নয়। চিন্তাধারার বিবর্তনের এক পর্যায়ে ভারতীয় মনীষায় ওই ধারণা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকবে। অবশ্য এতে কেবল চিন্তাধারার বিবর্তন বিচার-বিশ্লেষণ করলেই হবেনা, সেই সঙ্গে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্র-রাজনীতির সব দিক বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনান্তে মনে হয়েছে, পরমাণুবাদের উদ্ভব বৌদ্ধ বা তার সামান্য পরবর্তী যুগে।

পাঠকগণ লক্ষ করবেন, পূর্ববর্তী সব অধ্যায়ই ভারতীয় প্রেক্ষিতে নয়, একটি অধ্যায়ে গ্রীক পরমাণুবাদের আলোচনা আছে। এবং মনে হয়,

এটা খুবই স্বাভাবিক যে তা অনিবার্য ও অপরিহার্য ছিল। গ্রীক পরমাণুবাদ ও ভারতীয় পরমাণুবাদের আলোচনায় এটা মনে হতে পারে (বস্তুত তা প্রায় মনে করা হয়) যে, এই পারমাণবিক ধারণা প্রাচীনকালের মনস্বীদের কেবল মস্তিষ্কপ্রসূত,—এর সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা প্রাচীনকালের প্রকৌশল ও কারুশিল্পের, কারিগরির কোন যোগ নেই। কিন্তু ঘটনা তা নয়, বরং এর বিপরীত। অর্থাৎ প্রাচীনকালে কি ভারতে কি গ্রীসে হস্ত ও মস্তিষ্কের নিবিড় সংযোগ দেখা যায়। গ্রীকদের প্রেক্ষিত জানার জন্য ফ্যারিংটনের *Greck Science* দেখা যেতে পারে। আমাদের দেশের প্রেক্ষিত বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা প্রয়োজনভিত্তিক আলোচনা করেছি। তবুও এখানে সামান্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদের যুগের মানুষ পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করেছে, আবার ওই যুগে কৃষিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কৃষির চেয়ে পশুপালক জীবনের সাক্ষ্যই ঋগ্বেদের সর্বত্র দেখা যায়; বিশেষত, দ্বিতীয় থেকে নবম মণ্ডলে এই প্রাধান্য বিদ্যমান: প্রথম ও দশম মণ্ডল পরবর্তীকালের রচনা বলে এখানে ঋগ্বেদের আদিকালের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তিত রূপ বর্তমান। চতুর্থ থেকে নবম মণ্ডলে পুরোহিত-ঋষিরা কেবল বৈষয়িক সুখের জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেছেন: গরু দাও, অশ্ব দাও, পুত্র দাও ইত্যাদি। এই পর্বে ঋগ্বেদীয় ভাবনা গরু-সমাচ্ছন্ন। তাঁদের গরুতে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, রাজা হলেন 'গোপতি'; দৈর্ঘ্যের একক হলো 'গব্যূতি'; তা ছাড়া 'গবিষ্টি, 'গবেষণা-'য় তাঁদের অসীম আগ্রহ। তখনো লোহা আবিষ্কৃত হয়নি বলে লাঙলের ফাল ছিল না ধাতুনির্মিত; পরে অবশ্য ব্রোঞ্জের ব্যবহার হয়। পুরোহিত-যোধ্ই ছিল সমাজের প্রধান শ্রেণী; বাকীরা দাস বা দস্যু। পরে কৃষির প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে, ক্রমশ সপ্তসিন্ধু ছাড়িয়ে আর্যরা পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে: পশুপালকের জীবন ক্রমশ স্থায়িত্ব পেতে থাকে খুব সম্ভব দাস-দস্যু-দানব ইত্যাদি জাতের কৃষির প্রতি নির্ভরতা দেখে। ঋগ্বেদের 'ঋত'-এর ধারণা নিয়ে আমাদের দেশে ভাবালুতার অন্ত নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শব্দটির সঠিক অর্থ নিয়ে বিশ্রুত বিদ্বানমণ্ডলীর তর্কাতর্কির অন্ত নেই। এমন কি, নানা বিপরীত ধারণাও দেখা যায়। তবে ম্যাক্স মুলার প্রমুখের অভিমত অনেকে গ্রহণ করে বলেন 'ঋত' মানে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' বা 'শৃঙখলা' কিন্তু প্রায় চারশ' বারের অধিক ব্যবহৃত এই শব্দটির অর্থ ওই প্রাকৃতিক নিয়ম

বা শৃঙ্খলা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। পঞ্চদশ শতাব্দীর সায়নও কোন একটিমাত্র অর্থ দেননি। তবুও আমাদের দেশের মহাত্মারা এই শব্দ নিয়ে যে প্রলাপ উক্তি করেন, তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।* আমরা যে ঋগ্বেদীয় সমাজ ও জীবনের কথা উল্লেখ করলাম, তা অত্রাঞ্জিখেরা, ভগবানপুরা ইত্যাদি স্থানে খননকার্য চালিয়ে তার অল্প-স্বল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুতরাং ঋগ্বেদে বা বেদেই সব জ্ঞান নিহিত, তার বাইরে কোথাও কিছু নেই, এই ধারণা আকাশ কুসুমের মত বা শশশৃঙ্গের মত। শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন, এই বৈষয়িক জীবনের প্রতি আকাঙ্খা, চুরি-ছিনতাই, পাশাখেলা ইত্যাদি ঋগ্বেদের বড় আকর্ষণ।**

ঋগ্বেদীয় যুগের শেষপর্ব ১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। ১০০০-৬০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ কালপর্যায় পরবর্তী বৈদিক যুগ। ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মন্ডল রচনাকালের সময় থেকেই একটি বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। তখন থেকে মানুষের মনে বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে নানা সন্দেহ দেখা দিতে শুরু করে, যাগ-যজ্ঞাদির সার্থকতা ও বৈদিক সূক্ত-ঋকের অর্থ নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয়। বেদনিন্দুককেই যদি নাস্তিক বলা হয়, তা হলে তখন থেকে নাস্তিকতার উদ্ভব ও বিকাশ হতে শুরু করে। এমন কি, অতিকথায়পূর্ণ নানা তত্ত্বের প্রতিও সংশয় দেখা দিয়ে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থাৎ যজু—অথর্ব—ব্রাহ্মণ—আরণ্যক—উপনিষদের যুগে ততই বৈদিক ক্রিয়াকর্মের নিষ্ফলতা সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষায় দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সূচনা তীব্র হতে থাকে; প্রাচীন ঋষি ভরদ্বাজ, কৌৎস প্রভৃতি বস্তুবাদী মতাদর্শে স্থিত হতে থাকেন। তাই, তাঁদের নানা প্রশ্ন উত্থিত হয় খোদ বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে, পদার্থ গঠন, বৈদিক ঋকের ব্যাখ্যা নিয়ে, অর্থ নিয়ে। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির এই বস্তুবাদঘেঁষা মানসিকতার যথেষ্ট উল্লেখ করে এই কথাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি যে, প্রাচীন ভারতীয় মনঃপ্রকৃতি বলতে রহস্যবাদিতা, অজ্ঞেয়তা, অধ্যাত্মবাদিতা বা শুষ্ক ও নিষ্ফল তর্কাতর্কিই নয়, এতে বস্তুবাদিতার যথেষ্ট ছাপ ছিল, প্রভাব ছিল। বস্তুত ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ও বিকাশে তা-ই ছিল চালিকা-শক্তি।

এই পর্বে অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে লোহার ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি

---

* দ্রষ্টব্য: 'পুরাণ ও বিজ্ঞান,' পৃ—১-৯

** প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, পৃ—১৯

পেতে থাকে, এবং খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ লাঙলে লোহার ফাল ও কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদিতে লোহার ব্যবহার ব্যাপক হতে থাকে। ফলে, কৃষির বৃদ্ধি ও পশুপালক জীবন ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে—উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কারিগরি, কারুশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'দ্বিতীয় নগরায়ণ' শুরু হয় ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। শূল্বসূত্রে যে ইট শিল্পের উল্লেখ আছে, যে গণিতজ্ঞান আছে, তা তৎকালীন বিজ্ঞান ও কারিগরি শিল্পের বিকাশ ও উন্নতির জন্যই সম্ভব হয়। 'দ্বিতীয় নগরায়ণ' কেবল যাজ্ঞবল্কীয় ভাববাদের ওপর নির্ভর করে সম্ভব হয়েছিল, একথা মনে করা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং উদ্দালকীয় আদি বস্তুবাদের মধ্য দিয়ে কট্টর বস্তুবাদী লোকায়ত বা চার্বাকদের মতাদর্শের প্রেক্ষিতেই তা সম্ভব। প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদের কথা বিশ্রুত অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও স্বীকার করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—"Materialism is as old as philosophy, and the theory is to be met with in the pre-Buddhistic period also. Germs of it are found in the hymns of the Ṛg-Veda."*

বৌদ্ধ-পূর্ব যুগেই, 'ষোড়শ মহাজনপদ' বিকশিত হতে থাকে, এবং বিম্বিসার থেকে একীভূত কেন্দ্রীয় শক্তির বিকাশ সগর্বে অস্তিত্ব ঘোষণা করে। ফলে, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন নতুন পরিস্থিতে নবরূপ পায়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে দ্বন্দ্ব, বৈশ্য ও শূদ্রের আবির্ভাব উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাভাবিক পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণপ্রথা তখনো জাতপাতে পরিণত হয়নি ; ব্রাহ্মণের লাঙলের বোঁটা ধরতে, ক্ষত্রিয়ের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে বাধা ছিল না ; রাজপুত্রের কারুশিল্পী-কন্যার মানভঞ্জন করার জন্য শ্বশুরালয়ে অবস্থান করতে তখনো কোন মনু রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেননি।** বিম্বিসার, নন্দরা, মৌর্যরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় না হয়েও রাজা হয়েছিলেন, এবং ব্রহ্মসেবী ব্রাহ্মণরা তাঁদের অধীনে নানা প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত হতে অস্বীকার করেননি। বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রদর্শন করে প্রবলবেগে ভারতের চারদিকে প্রধাবিত হচ্ছিল। আর নাস্তিক-শিরোমণি দেহাত্মবাদী, প্রত্যক্ষবাদী, ভূতচৈতন্যবাদী বৃহস্পতির উপযুক্ত শিষ্যরা 'চরক' হয়ে কনফুসিয়াস, সক্রেটিসের মত মতাদর্শ প্রচারে নির্ভয় হতে পেরেছিল। আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শগত

* Radhakrishnan, S—*Indian Philosophy*, Vol.-I, p. 277

** *The Cambridge History of India*, Vol.-I, p. 186

দ্বন্দ্বও বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্যোধনের মত শক্তিশালী রাজারাও চার্বাক-দের আনুকূল্য করত— বস্তুবাদিতার প্রসার ও প্রচারে সাহায্য করত। দশরথের মত রাজাদেরও মন্ত্রীপরিষদে জাবালির মত বস্তুবাদী সাদরে গৃহীত হতেন। বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে যে বস্তুবাদ শ্রেয়, তা ওই সময়ে অর্থাৎ বৌদ্ধপূর্ব বা তার অব্যবহিত পরে বর্তমান থাকায় ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগৃতির বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। তা ছাড়া বৌদ্ধ যুগে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও বস্তুবাদের অভ্যুদয়ের বীজ অনুভূত হয়।

কোন কোন বিদেশী পণ্ডিত যাই বলুন এটা খুবই সম্ভাবনাময় পরিস্থিতি ও পরিবেশ যে, বৌদ্ধ-পূর্ব বা তার অব্যবহিত পরেই বৈশেষিক দর্শনের উদ্ভব। অবশ্য এটা ঘটনা যে, আমরা এই দর্শনে লিখিত সূত্রাদির চিহ্ন পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থাদিতে দেখতে পাইনা। কিন্তু সদানন্দের কথা ঠিক হলে বলতে হয় যে, কণাদ এই দর্শনের জনক নন, উদ্ভাবক নন। তাঁর আগে এই সূত্র কোন-না-কোন প্রকারে বর্তমান ছিল। কণাদ সেইসব অবলম্বনেই তাঁর গ্রন্থ রচনা করে থাকবেন। যেমন, নিরুক্ত, 'অষ্টাধ্যায়ী' ইত্যাদির পূর্বরূপ ছিল কিন্তু সে-সবের অস্তিতত্ব আজ বর্তমান নেই, তেমনি বৈশেষিক সূত্র, ন্যায় সূত্রেরও পূর্বরূপ ছিল। এবং তা হলে বলা যায়, পরমাণুবাদ বৌদ্ধ-পূর্ব যুগের। প্রখ্যাত দার্শনিক দাশগুপ্ত তো দেখিয়েছেন যে, ন্যায় সূত্রের কোন কোন সূত্র চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। তা ছাড়া, গোতম তাঁর গ্রন্থে যেভাবে কিছু কিছু মতের খন্ডন করেছেন পূর্বপক্ষের উল্লেখ করে, তাতে তো এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, ন্যায়সূত্র গোতমের আগে কোনরূপে বর্তমান ছিল, এবং গোতম সেই মতাদর্শ অনুগামী হয়ে কিছু কিছু মতাদর্শ খন্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈশেষিকেও ঠিক একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। আমরা গোতমের পূর্বপক্ষ খণ্ডনের দু'একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

গোতমের পূর্বে প্রচলিত একটি মত ছিল যে, **'ইন্দ্রিয়ই আত্মা'**। এই মতটি খন্ডন করার জন্য তিনি পূর্বপক্ষ হিসাবে এই সূত্রটির উল্লেখ করেছেন : **'ন বিষয় ব্যবস্থানাৎ'**—"আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন নহে। যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়-নিয়ম আছে।"* সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিই হলো নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষকর্তা—আত্মা। গোতম এই মতটি খন্ডন করার জন্য অন্তত-

* তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, 'ন্যায় পরিচয়', পৃ—২১

পক্ষে পাঁচটি সূত্রের অবতারণা করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, গোতমের সময় চার্বাক অর্থাৎ বস্তুবাদসদৃশ এই তিন-শব্দের-সূত্রটি কত শক্তিশালী ছিল।

এখানে আর একটিমাত্র উদাহরণ উপস্থাপিত করব যা আমাদের অন্য উদ্দেশ্যসাধনেও ব্যবহৃত হতে পারবে। ন্যায় সূত্রের গ্রন্থকার জীবাত্মা দেহ থেকে ভিন্ন এবং নিত্য বলে ধারণা করতেন। তাঁর মতে জীবাত্মার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি অনুমান প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে, নবজাত শিশুর হাসি, ভয় ও শোক দেখা যায়, কিন্তু শিশুর ইষ্ট সম্পর্কে কোন বোধ না থাকায় এটা প্রমাণিত হয় আত্মা নিত্য। অর্থাৎ "পূর্ব পূর্ব জন্মে তাহার ঐরূপ বিষয়কে ইস্টজনক বলিয়া বোধ হওয়ায় সেই বোধ জন্য সংস্কার-বশতঃ ইহজন্মেও প্রথমে তাহার সেই বিষয়ের ইষ্টজনকত্বের স্মৃতি জন্মে।"* সুতরাং এ থেকেই আত্মার নিত্যতা প্রতিপন্ন হয়। গোতম আত্মার নিত্যতা প্রতিপন্ন করতে আরো উদাহরণ দিয়েছেন,— 'শিশুর সর্বপ্রথম মাতৃস্তনপানের ইচ্ছা'। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, মাতৃদুগ্ধপান তার পক্ষে ইষ্টজনক,—এই বোধ তার পূর্বজন্ম থেকে না থাকলে শিশু কখনোই জানতে পারতনা যে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আছে, আর তা পান করলে তার ইষ্ট হবে। গোতমকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তিনি পূর্বপক্ষ হিসাবে এমন একটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের তথ্যে পূর্ণ। সূত্রটি এই: "**অয়সোঽয়স্কান্তাভিগমনবৎ তদুপসর্পণম্**"—"পূর্বাভ্যাসমূলক সংস্কার ব্যতীতও বস্তুশক্তিবশতঃ লৌহ যেমন অয়স্কান্ত মণির (চুম্বকের) অভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ নবজাত শিশুর মুখ মাতৃস্তনের অভিমুখে গমন করে।"** গোতম অবশ্য 'প্রবৃত্তি-জন্য' ও 'ক্রিয়ামাত্র'—এই দুই-এর পার্থক্য করে পূর্বপক্ষ খণ্ডন করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা যে গোলমেলে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, বিখ্যাত ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন লোহার চুম্বকের অভিমুখে গমনের জন্য 'নিয়ত কারণ' স্বীকার করেছেন।

আমরা এখানে অবশ্য গোতম বা বাৎস্যায়নের অভিমত বিচার করছিনা। আমাদের মূল বক্তব্য কণাদ গোতমের পূর্বে ন্যায়বৈশেষিকের আদি রূপ ছিল, এবং সে-সবের বিরুদ্ধ সমালোচনাও ছিল, বিভিন্ন মতও প্রচলিত

* তদেব, পৃ—২৯
** ন্যায় পরিচয়, পৃ—৩২

ছিল। এবং খুব স্পষ্ট করেই দেখা যাচ্ছে, কণাদ গোতমের যুগে বিজ্ঞান-ভিত্তিক বস্তুবাদ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় বিজ্ঞানের বনিয়াদ এই মতাদর্শ ও বৈজ্ঞানিকতার দ্বারাই সুদৃঢ় হয়েছে—মজবুত হয়েছে। তা ছাড়া, আমরা যে দুটি পূর্বপক্ষীয় মতাদর্শের উল্লেখ এখানে করেছি, তা থেকে এমন অনুমান (inference) করা অন্যায় হবে না যে, তা বহুলাংশে লোকায়ত বা চার্বাক মতাদর্শের অনুগামী। বস্তুত, ন্যায়-বৈশেষিক তথা পরমাণুবাদের উদ্ভব খুব সম্ভব বস্তুবাদীদের সহিত দ্বন্দ্ব থেকেই ঃ বিরোধী সমাবেশ, পরিমাণ থেকে গুণ ও খণ্ডনের খণ্ডন-এর (negation of negation) মাধ্যমেই পরমাণুবাদ তথা ন্যায়-বৈশেষিক পরিপুষ্টিলাভ করে বললে যুক্তি-সঙ্গত কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়।

এখানে ওপরের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আরো একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। কণাদ স্বয়ং তাঁর সূত্রে 'দ্ব্যণুক' বা 'এ্যণুক'-এর উল্লেখ করেননি, এবং পরমাণু থেকে কিভাবে স্থূল পদার্থ গঠিত হয় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করেননি। তাঁর সূত্রে আমরা দ্বি-ন্যস্তর্থক মন্তব্য দেখতে পাই যে, 'পরমাণু সংযোগ অস্বীকার করা যায় না'। এই দ্বি-ন্যস্তর্থক সূত্রের তাৎপর্য এই যে, হয় কণাদ পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত পরমাণুবাদের সমর্থন করছেন, অথবা তাঁর যুগে প্রচলিত পরমাণুবাদের দৃঢ় সমর্থন করছেন যা কিনা ছিল তৎকালীন জাতীয় চিন্তা-ভাবনা (national thinking)। বি. ভি. সুব্বারায়াপ্পা শেষেরটি অধিকতর সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন।* কিন্তু প্রখ্যাত এই বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক যখন বলেন, পরমাণু সম্বন্ধে ধারণা প্রতিভানিক (intuitive) মনের ফসল, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুসন্ধানী 'spirit,'** তা কেন গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করা যায় না, তার বিবরণ আমরা পূর্ববর্তী ও এই অধ্যায়েও কিছু দিয়েছি।

একথা সত্য, পরমাণুবাদী তথা ন্যায়-বৈশেষিকরা পরমাণু সম্পর্কীয় নানা ধারণায় অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, তার জন্য যতটা না আদি প্রবক্তা কণাদ দায়ী, তার চেয়ে লক্ষ গুণ দায়ী পরবর্তীকালের টীকা-ভাষ্যকাররা। যেমন, আমরা প্রশস্তপাদ, বাৎস্যায়ন, উদ্দোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, শিবাদিত্য, শঙ্কর মিশ্র

* *Bulletin of the National Institute of Science in India*, 22, p. 121-122, 1961

** Ibid, p. 127

প্রমুখের নাম করতে পারি। এঁরা অন্তত পঞ্চম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। কণাদ ন'টি দ্রব্যের নাম করেছেন, তার মধ্যে 'আত্মন্' একটি। 'আত্মন' বলতে তিনি জীবাত্মা বুঝতেন, না পরমাত্মা বুঝতেন অথবা এই একটি শব্দেই ওই দুই আত্মাকে বুঝিয়েছেন, এ নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু কণাদ ছাড়া তাঁর মতাদর্শানুগামীরা প্রায় সবাই 'আত্মন্'-এর ব্যাখ্যায় 'পরমাত্মা' ও 'জীবাত্মা' বুঝিয়েছেন। সম্ভবত, "The atom unmaterialises...matter disappears"* —এরকম অতীন্দ্রিয় ভাবনা থেকেই আত্মার দুটি ভাগ করার প্রয়োজন হয়েছিল, বা তৎকালীন ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে ন্যায়-বৈশেষিক-দের আত্মন্-কে দ্বিখণ্ডিত করে পার্থিব ও অপার্থিব বলে স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু এটা তো লক্ষ্য না করে পারা যায় না, কণাদ তাঁর ছ'টি পদার্থের মধ্যে এবং গোতম তাঁর প্রমাণাদি ষোলটি পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের কোন উল্লেখ করেননি। অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিকরা কণাদ-গোতমের ঈশ্বর অনুল্লেখের কারণ দেখাতে কসুর করেননি। কিন্তু তা কষ্টকল্পনা (দ্রষ্টব্য ঃ 'ন্যায় পরিচয়,' পৃ-১২৬)। সেই জন্যই, কণাদের বায়ুর সংজ্ঞার বিকৃত ব্যাখ্যা। সূত্র ঃ **'তস্মাদাগমিকং'**—২।১।১৭ ; এখানে 'আগমিক' শব্দটির অর্থ বেদপ্রামাণ্য না ধরে 'তার আগমন' অর্থাৎ বায়ুর চাঞ্চল্য বা সঞ্চালন দ্বারাই বায়ুর সংজ্ঞা পাওয়া যায়, জোর করে 'আগমিক সিদ্ধ' অর্থাৎ বেদসিদ্ধ করে কষ্টকল্পনার দরকার নেই বলে আমাদের ধারণা (দ্রষ্টব্য ঃ 'বৈশেষিক দর্শন,' সুখময় ভট্টাচার্য, পৃ-৪৮-৪৯)।

একথা কখনোই ভুলে গেলে চলবেনা যে, সেই সুদূর আড়াই হাজার বছর আগেকার যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ছিল অনুমানভিত্তিক, তৎকালীন কারিগরি ও কারুশিল্পের বিকাশের সঙ্গে তা ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরমাণুবাদের ধারণা যদিও সম্পূর্ণ চার্বাক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুরূপ ছিলনা, তবুও এতে ভাববাদের প্রাবল্য দেখা যায় না। বেদপ্রামাণ্য, ঈশ্বর এতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। এমন কি ন্যায়-বৈশেষিকের আত্মাও প্রবলতম ভাববাদে আচ্ছন্ন নয়। তাই পরবর্তীকালের মোক্ষাভিলাষীরা শেয়াল হয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে হুক্কাহুয়া করতেও রাজী, তবুও ন্যায়-বৈশেষিকের দেহবিনির্গত নুড়ির মতন আত্মা নিয়ে স্বর্গে যেতে

চান না। তাই বোধ হয় কণাদ কথিত 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ 'যা দেখা যায় না'-কে পরবর্তীকালের ন্যায়-বৈশেষিক ভাষ্যকাররা পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম ইত্যাদিতে পরিণত করে ছেড়েছেন ; সৃষ্টির প্রথম পরমাণু সংযোগ বোঝাতে মহেশ্বরের শক্তিশালী মদনভস্মকারী তৃতীয় নেত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছেন তবুও ন্যায়-বৈশেষিকরা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি কণাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়েও। যদিও আমরা বৈশেষিক সূত্রের প্রথমেই 'অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ, বলে ধর্মানুরাগীদের আকর্ষণ করার প্রয়াস দেখি, তবুও তাঁরা ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছয় পদার্থের বর্ণনার দ্বারা মোক্ষলাভ হবে বলে একদম বিশ্বাস করেননি। তাই তাঁরা পড়েশুনে—ছয় পদার্থ বা সাত, এবং দ্রব্যনিচয়, মনে করলেন,—

ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্‌ ।
সাগরা গন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপমম্‌ ।।

—"ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ছয়টি পদার্থের বর্ণনা করা এবং সাগরে যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়া হিমালয়ের অভিমুখে যাওয়া একই কথা" ।*

কিন্তু নিকট প্রাচ্য ও প্রাচ্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাপ্রণালী কারিগরি ভাবনার বাইরে সম্প্রসারিত না হয়ে অতিকথামূলক বিশ্বতত্ত্বের ভাবনায় আবদ্ধ হয়ে রইল। পুরোহিত সম্প্রদায় এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই করল ; কারুশিল্পিরা যাদের কর্মকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও চিন্তার বীজ নিহিত ছিল তারা কেবল বস্তুর অনুকৃতি করেই চলল। পুরোহিত সম্প্রদায়ের ওপর ন্যস্ত ছিল সমাজ-নিয়ন্ত্রণের। আর ঠিক এর জন্যই,—এই জনগণের নিয়ন্ত্রণের জন্যই তাঁরা অতিকথায়পূর্ণ বিশ্বতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এবং একে কেন্দ্র করেই জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে, প্রকৃতিতে আপাত বিশৃঙ্খলা ব্যাখ্যায় মিথ বা অতিকথার অনুপ্রবেশ ঘটল **—পুরাণের কাহিনী পরিকল্পিত ও সম্প্রচারিত হলো।

আমরা ভারতীয় পরমাণুবাদের আলোচনার উপসংহারে এসে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা এই সীমিত বিষয়ের আলোচনায় পরিপূর্ণতার ধারেকাছে যেতে পারিনি। তবে অদ্যাবধি অবহেলিত বৈজ্ঞানিক প্রতিশ্রুতিময় এই বিষয়টির যে বিবরণ, বিশ্লেষণ, আলোচনা ও নানা মন্তব্য আমরা উপস্থাপিত করেছি, তাতে কৌতূহলী ও আগ্রহী

* ভট্টাচার্য, সুখময়—'বৈশেষিক দর্শন', পৃ-৬
** Farrington, B—Greek Science p. 135

পাঠকের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। বস্তুত বিজ্ঞানের ইতিহাসে, বিশেষত ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে ন্যায়-বৈশেষের ভূমিকা এতখানি যে, তাকে এড়িয়ে যাবার বা নামমাত্র উল্লেখ করে নীরবতা ও নিস্তব্ধতা অবলম্বন করা যায় না। ভারতীয় ধর্মীয় দর্শনের ইতিহাসে ন্যায়-বৈশেষিকের যে স্থান, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়, বরং অনেকাংশে বেশী। অনন্য প্রতিভাধর কণাদ ও গোতমের কথা অল্প-স্বল্প আলোচনা করলেও তাঁদের পরমাণুবাদ মোটামাটি বিস্তারিত-ভাবেই আমরা করেছি। তা ছাড়া উদ্দালক আরুণি, যাজ্ঞবলক্য, মনু, কৌটিল্য, লোকায়তিক বৃহস্পতি প্রমুখের নানা মতাদর্শ, মন্তব্য নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করেছি। জবালি, ভরদ্বাজ, কৌৎস প্রমুখের চিন্তাধারার উল্লেখ করে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বস্তুবাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত ভট্ট, শ্রীধর, উদয়ন প্রমুখের গোড়াকার বৈশেষিক মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতিও লক্ষ্য করার মত। এ ছাড়া দুই ঈশ্বর-অবিশ্বাসী সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও জৈন মতাদর্শে পরমাণুবাদের স্থান নিয়েও আলোচনা করেছি। কণাদ ও গোতমের ঈশ্বর অনুল্লেখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের ঈশ্বরের অবিশ্বাস, এবং সর্বোপরি চার্বাকদের কট্টর বস্তুবাদিতা,—এইসব তথ্য থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করলে খুব অন্যায় হয় না যে, পরমাণুবাদের বীজ নাস্তিক বস্তুবাদীদের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল, এবং সম্ভবত বস্তুবাদের পথেই এর পরিপুষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধি পেত ও যেরূপে বর্তমানে পরমাণুবাদ দেখা যায় তার আমূল রূপান্তর ঘটতে পারত। কারণ, পরবর্তীকালে পরমাণু ও দ্ব্যণুককে জগদ্ধাত্রীর স্তবে অনুপ্রবিষ্ট করেও শেষরক্ষা করা যায়নি।*

ইতিপূর্বে আমরা ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন ও বৌদ্ধ অভিমতানুসারে পরমাণু সম্বন্ধে নানা ধারণার কথা আলোচনা করেছি। প্রাচীন ভারতীয় এইসব দর্শনে পরমাণুর স্বরূপ বা প্রকৃতিগত দিকটা আলোচিত হয়নি। এবং বোধ হয় সেই প্রাচীন যুগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে তা সম্ভবও ছিল না। তবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক—পরমাণুর গাণিতিককরণ সম্ভব না হলেও তার পরিমাণগত দিকটি উপেক্ষিত হয়নি অর্থাৎ দর্শনের গন্ডি

* পরমাণুরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি।
স্থূলাতিস্থূলরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তুতে॥

অতিক্রম করে পরিমাণগত দিকটি অন্যত্র ব্যবহৃত হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। যেমন, 'ললিতবিস্তার.' 'বৃহৎসংহিতা' ও পরবর্তীকালে রচিত নানা গাণিতিক গ্রন্থে পরমাণু 'একক' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু একক হিসাবে এর প্রয়োগ ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার প্রয়োগে পারমাণবিক ধারণাটি সম্প্রসারিত হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা খুবই আবশ্যিক বলে মনে হয়। আমরা এখানে সে-রকম একটি প্রচেষ্টা করেছি। সুধী বিদ্বানগণ বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবেন প্রাচীন ভারতীয় পারমাণবিক ধারণার বিকাশের সাথে আমাদের এই প্রচেষ্টার অন্য কোন উৎস সন্ধান করা যায় কিনা।

আমরা বৌদ্ধ পরমাণুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের অভিমত উল্লেখ করেছি (পৃ-৭৮-৭৯)। দাশগুপ্ত সাতটি পরমাণু দিয়ে বিশেষ এক প্রকারের অণু গঠন করার কথা বলেছেন। তাঁর মতে, "সমবায় বা সংযোগ ঘটে পুঞ্জের আকারে যার কেন্দ্রে থাকে একটি পরমাণু এবং অন্যগুলি থাকে তার চারদিকে"। আবার, কণাদের বৈশেষিক সূত্র থেকে জানি পরমাণুর আকার —**'নিত্যং পরিমণ্ডলম্'** অর্থাৎ পরমাণু নিত্য গোলীয় বা গোলাকার (*spherical*)। পরমাণু যে গোলাকার এ-সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু গোলাকার পরমাণুপুঞ্জতে পরমাণুগুলি কিরকমভাবে বিন্যস্ত বা সজ্জিত থাকে বৈশেষিক সূত্রে তার কোন উল্লেখ নেই। এই উল্লেখ জৈনদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শ্যামার্থ বা শ্যামাচার্যের (৯২ খ্রী. পূ) **'প্রজ্ঞাপনোপাঙ্গম্'** (বা প্রজ্ঞাপনা-সূত্র) গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। শ্যামাচার্য ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী এবং বিখ্যাত উমাস্বাতীর শিষ্য।* তাঁর 'প্রজ্ঞাপনোপাঙ্গম্' গ্রন্থটি প্রাকৃত ভাষায় রচিত। তিনি ওই গ্রন্থে সর্বনিম্ন সাতটি পরমাণু দিয়ে গোলক (sphere) নির্মাণের কথা বলেছেন। এই ধারণার মধ্যে যে ঘন জ্যামিতির ভিত্তির ধারণা নিহিত আছে, তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। শুধু 'প্রজ্ঞাপনোপাঙ্গম্'-ই নয়, ভগবতী-সূত্রে এই ধারণা দেখা যায়, এবং পরবর্তীকালে বাচস্পতি মিশ্রও তাঁর 'তাৎপর্যটীকা' গ্রন্থে (৪।২।২৫) একই অভিমত আরো স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। ধারণাটি ক্রমশ স্পষ্ট কবার জন্য

* Datta, B. B : The Jaina School of Mathematics, BCMS, vol-21, 1929, pp 115-145

আমরা প্রথমে শ্যামাচার্যের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, এবং তাঁর গ্রন্থের ভাষ্যকার মলয়গিরির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি।

জে সন্ঠানপরিণয়া তে পঞ্চবিহা পন্নত্তা তং জহা পরিমন্ডল সন্ঠাণপরিণয়া, তং সসন্ঠাণপরিণয়া, চউরংসসংঠাণপরিণয়া, আয়তসংঠাণপরিণয়া ॥

প্রকৃত উদ্ধৃতিটির সংস্কৃত রূপ এরকম :

যে সংস্থানপরিণতাঃ তে পঞ্চবিধাঃ, প্রজ্ঞপ্তাঃ, তদ্যথা, পরিমণ্ডলসংস্থান-পরিণতাঃ, বৃত্তসংস্থানপরিণতাঃ, ত্র্যস্রসংস্থানপরিণতাঃ, চতুরস্রসংস্থান-পরিণতাঃ, আয়ত সংস্থানপরিণতাঃ।

অনুবাদ ঃ বিন্যাস (পরমাণুর বা গুলিকার) পাঁচ প্রকার বলা হয় ঃ উপবৃত্তাকার, বৃত্তাকার, ত্রিভুজাকার, বর্গাকার ও আয়তকার। মলয়গিরি বলেন, এই পাঁচ প্রকার বিন্যাস, আবার দু-ভাগে বিভক্ত ঃ **কঠিন** (ঘন) ও **সামতলিক** (প্রতর)। ভগবতী-সূত্রে কঠিন ও সামতলিক জ্যামিতিক চিত্র গঠনের জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যক পরমাণুর বর্ণনা আছে।* বিভিন্ন জ্যামিতিক চিত্র গঠনের জন্য যত নিম্নসংখ্যক পরমাণু (যুগ্ম ও অযুগ্ম) প্রয়োজন তা ছকে দেখানো হলো ঃ

চিত্র	যুগ্ম	অযুগ্ম
সরলরেখা	২	৩
ত্রিভুজ	৬	৩
আয়তক্ষেত্র	৬	১৫
বর্গক্ষেত্র	৪	৯
বৃত্ত	১২	৫
ঘণক	৮	২৭
আয়ত ঘণ	১২	৪৫
ত্রিভুজাকৃতি পিরামিড	৪	৩৫
গোলক	৩২	[৭]**

* Dtta, B. B. : Ibid ; Saraswati, T. A. : Geometry in Ancient & Medieval India, pp 65—67 ; মজুমদার, প্রদীপকুমার, প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি চর্চা, পৃঃ 113—114.

** ভগবতী-সূত্র ২৪-তম শতক, তৃতীয় উদ্দেশ ; শ্লোক—৭২৬।

মনস্বী দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *the Positive Sciences of the Ancient Hindus*-এর 117—118 পৃষ্ঠায় 'দেশে পরমাণু বিন্যাস' শীর্ষক আলোচনায় বাচস্পতি মিশ্রের অভিমত মূলসহ ব্যাখ্যা করেন। এখানে বাচস্পতি মিশ্র চমৎকারভাবে পরমাণুর গোলীয় পুঞ্জে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আচার্য শীলের ভাষায় বংগানুবাদ দিলে মূল স্টাইল ও ভাষার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বহুলাংশে হ্রাস পায় বলে আমরা প্রাসঙ্গিক অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"To conceive position in space, Vāchaspati takes three axes, one proceeding from the point of sunrise in the horizon to that of sunset, on any particular day (roughly speaking, from the east to the west) ; a second bisecting this line at right angles on the horizontal plane (roughly speaking, from the north to the south) ; and the third proceeding from the point of their section up to the meridian possition of the sun on that day (roughly speaking, up and down)...the position of any single atom in space with reference to another may be indicated—with reference to the three axes. But this gives only a geometrical analysis of the conception of three-dimensioned space, though it must be admitted in all fairness that by dint of clear thinking it *anticipates in a rudimentary manner the foundations of solid Co-Ordinate geometry.*

বৈশেষিকের 'নিত্যং পরিমন্ডলম্' সূত্র, শ্যামাচার্য ও ভগবতী-সূত্রে প্রাপ্ত গোলকে পরমাণুবিন্যাস এবং বাচস্পতি মিশ্রের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা অবলম্বনে পরমাণুপুঞ্জে একটি পরমাণুর প্রেক্ষিতে অন্যান্য পরমাণুর বিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয়, প্রাচীন ভারতে পরমাণু সম্পর্কীয় নানা ফলপ্রদ বিশ্লেষণ ছিল, এবং তারই একটি দর্শনের গন্ডি ছাড়িয়ে গণিতে পর্যন্ত প্রযুক্ত হতে পেরেছে। শ্যামাচার্য থেকে ভগবতী-সূত্রের মধ্য দিয়ে বাচস্পতি মিশ্রের সময়কাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ন'শ' (৯৫০ বছর) বছরের ব্যবধান। মধ্যবর্তী এই ৯৫০ বছরের মধ্যে পরমাণুকে কেন্দ্র কি ধরনের বিস্তৃতি ও প্রয়োগ হয়েছে, তার সামগ্রিক চিত্র আজও পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাচস্পতি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির ধারণা স্বয়ং আবিষ্কার করেননি। তবে তিনি কি জৈন গ্রন্থাদি থেকে এই ধারণা লাভ করেছিলেন ? কিন্তু কট্টর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক

বাচস্পতি এরূপ করবেন বলে অনুমান করা কষ্টসাধ্য। তা হলে কি ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা ছিল? শেষোক্ত অনুমানটির সম্ভাব্যতা অধিকতর উজ্জ্বল বলে আমাদের প্রত্যয় হয়।

পরমাণুবাদের গাণিতিকীকরণ অবশ্যই একটি সীমাবদ্ধতা।* কিন্তু আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে গণিতের যে ভূমিকা সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন কোন অভিমত ও ধারণার ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বা সেখানে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সন্ধান করতে যাওয়া মানে অমাবস্যায় চন্দ্রদর্শনের অভিলাষ। তথাচ যদি কোন অনুসন্ধান করতে হয়, তা হলে *'rudimentary concept'*-এর ওপর নির্ভর করতে হবে; তা হলেই হবে সঠিক ঐতিহাসিক পন্থাবলম্বন। যেমন, প্রাচীন ভারতে পরমাণুকে কেন্দ্র করে সামতলিক ও ঘন জ্যামিতিক চিত্রের ব্যাখ্যা করার প্রবণতার মধ্যে *rudimentary* গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গী অলভ্য নয়; এবং এই প্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গী অন্ততপক্ষে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী বা তারও আগে থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল বললে অতিকথন, অতিরঞ্জন বা অন্ধ স্বাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হওয়া যায় না বলে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় সুব্বারায়াপ্পার ন্যায় বিদ্বানগণ এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে সম্ভবত বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়,—এই নিবেদন করি।
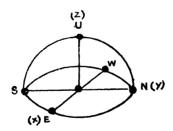
* Subbarayappa, B. V : IJHS, Vol-2, no. 1, 1967, pp. 31-33

পরিশিষ্ট—১

অসৎকার্যবাদ ঃ ন্যায়-বৈশেষিক ও সাংখ্যে বিতণ্ডা

উপাদান-কারণের[১] সহিত কার্যের[২] সম্বন্ধ নিয়ে ন্যায়-বৈশেষিকদের একটি বিশেষ মতবাদ আছে। এই মতবাদটির নাম 'অসৎকার্যবাদ'। এর সার কথা হচ্ছে যে, কার্য উৎপত্তির আগে অসৎ ; আর 'উৎপত্তি'-র মানে হলো যা ছিল না, তা-ই হলো ; যা অসৎ ছিল, তা-ই সৎ হলো। এই কথা ক'টি নিয়ে ঝামেলা-টামেলার বিশেষ দরকার ছিল না। কারণ, ব্যাপারটা সহজ বলেই মনে হয়। বিষয়টা স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ নিতে হয়, আর ভারতীয় ন্যায়-বৈশেষিকদের 'ঘট' আর 'পট' খুব প্রিয় উদাহরণ। 'ঘট' মানে মাটির হাঁড়ি, কুঁজো, কলসী ইত্যাদি ধরনের বস্তু, আর 'পট' মানে বস্ত্র—কাপড়। আমরা ঘটের উদাহরণই নিই। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঘট তৈরীর আগে ঘটের কোন অস্তিত্ব ছিল না অর্থাৎ অসৎ। আর 'তৈরী' বা 'উৎপন্ন' হওয়ার মানে দাঁড়াল যা ছিল না, তা-ই হলো। কিন্তু সাংখ্য দার্শনিকরা ঠিক এর উল্টো কথাটি বলেন।

তাঁরা বলেন কার্য[৩] তার উৎপত্তির আগেও সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান। কিন্তু কিভাবে ? না, সূক্ষ্ম অবস্থায় উপাদানরূপে বিদ্যমান। তাঁদের মতে কুমোরের ঘট তৈরীর আগেও ঘট ছিল—সূক্ষ্ম অবস্থায় মাটিতে ছিল। মাটি আর ঘট আলাদা কিছু নয়। তবে মাটি হলো ঘটের অনভিব্যক্ত অবস্থা, আর ঘট হলো মাটির অভিব্যক্ত অবস্থা। ন্যায়-বৈশেষিক মতের বিরোধিতা করে এঁরা বলেন, যা উৎপত্তির আগে অসৎ ছিল তা সৎ হলো—এমনতর অবাস্তব ব্যাপার হতেই পারে না। কারণ, যা সৎ নয়, তা ক্রিয়মান হতে পারে না। ন্যায় বৈশেষিকদের ঘায়েল করার জন্য তাঁরা শশশৃঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁরা ব্যাখ্যা করে বলেন, অসৎ যদি ক্রিয়মান হতে পারত, তা হলে শশশৃঙ্গ অর্থাৎ খরগোসের শিং হতে পারত বা তার সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই সম্ভাবনা স্বীকার করবে এমনতর পাগল-ছাগল কে আছে ? তা ছাড়া ঘট বানানোর কথা বলতে গেলে কুমোর, তার চাকা, তার লাঠি ইত্যাদি দরকার। কিন্তু ঘটটাই যদি অসৎ হয়, তা হলে এ-সব কারক-ব্যাপার কার ওপর প্রয়োগ করা হবে ?

সুতরাং যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা গেল তাতে বলতে হবে কার্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ।

সৎ থেকে কিভাবে কার্য উৎপন্ন হয় তার বর্ণনা তাঁরা এভাবে দিয়েছেনঃ আসলে 'উৎপত্তি'-র মানে হলো অভিব্যক্তি; অনভিব্যক্ত অবস্থা থেকে অভিব্যক্ত অবস্থায় আসার মানেই হলো 'উৎপত্তি'। মাটিরূপে ঘট অনভিব্যক্ত ছিল, আর কারক-ব্যাপারের দ্বারা তা ঘটরূপে অভিব্যক্ত হলো। একতাল মাটিকে শুধুই একতাল মাটি বলে ভাবলে চলবেনা। ভাবতে হবে যে, এতে ঘটটি অনভিব্যক্ত অবস্থায় আছে। কুমোর তার লাঠি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে মাটির তালকে দূর করে ঘটের আকার দেয়. তাই অভিব্যক্তিই হলো উৎপত্তি।

শুধু এ-ধরনের কূটকচালে তর্ক নয়, আরো গভীর কুটজাল বিস্তার তাঁরা করেছেন। এটা স্বীকৃত যে, বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হয়। যেমন, তিল থেকে তেল, মাটি থেকে ঘট, সুতো থেকে কাপড় ইত্যাদি হয়। কিন্তু তার কারণ কি? কারণ হলো তিলে তেল অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে বলে ইত্যাদি। কিন্তু তিলে যদি তেলের অভাব থাকত, আর মাটিতেও ঘটের অভাব থাকত, তা হলে তিলের কাছে তেল যা, ঘটও তাই হতো। অথবা মাটির কাছে ঘটও যা, তেলও তাই হতো। যুক্তিতে দাঁড়াল যে, তিলে তেলের অভাব আছে, ঘটেরও অভাব আছে। অতএব এই অভাব-ব্যাপারে তেল ও ঘট তিলের কাছে সমান। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, তিল থেকে ঘট হবেনা কেন বা মাটি থেকে তেল হবেনা কেন? কিন্তু এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কদাচ-কুত্রাপি ঘটেনা; তাই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, কার্য উপাদানে সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান না থাকলে সব-কিছু থেকে সব-কিছুর উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়।

আরো লজিক—লজিকের পর লজিক ও দৃষ্টান্ত সহযোগে সাংখ্যরা 'সৎকার্যবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, কার্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ—উপাদানরূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায় সৎ। উপাদান-কারণ (material cause) ও কার্য (effect) এই দুটি ভিন্ন বস্তু নয়—কার্য কারণাত্মক। সোনার চুড়িকে আমরা স্বর্ণাত্মক বলেই জানি। উপাদান-কারণ [দর্শনের ভাষায় সমবায়ি-কারণ] ও কার্য পৃথক, ভিন্ন হলে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকতে পারত। যেমন,—গরু ও ঘোড়া ভিন্ন বলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাবে থাকতে পারে। সুতরাং কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদানে থাকে। আর

উপাদানে থাকা মানে অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকা। অনভিব্যক্ত ও অভিব্যক্ত অবস্থার পার্থক্যের জন্যেই উপাদান-কারণ ও কার্যের নাম আলাদা, আকার আলাদা, আর তারা যে-প্রয়োজন মেটায় তা-ও আলাদা।

এতক্ষণ আমরা সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি-তর্ক দ্বারা বৈশেষিকদের অসৎ-কে নস্যাৎ করার আয়োজন লক্ষ করলাম। এবার ন্যায়-বৈশেষিকদের জবাবী ভাষণ শোনা যাক। প্রথমে সাংখ্য দার্শনিকরা যে শশশৃঙ্গের উদাহরণ দিয়েছেন তার জবানী ভাষণ দেখা যাক। ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, অসৎ বলতে যদি সাংখ্য দার্শনিকরা অলীক বুঝে থাকেন, তা হলে কথাটা সত্যি বটে। কারণ, শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশ কুসুম ইত্যাদি অলীক পদার্থের উৎপত্তি কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। কিন্তু ঘট বা পট তো আর তেমন নয়—অলীক পদার্থ নয়। তাই এইসব পদার্থ উৎপত্তির আগে অসৎ, কিন্তু পরে সৎ। তাঁরা বলেন, উৎপত্তির আগে উপাদান-কারণে কার্যের যে-অভাব, তা হলো প্রাগভাব।[৪] আর যার প্রাগভাব আছে তা তো কখনো অলীক হতে পারে না। কেন অলীক বলা যায় না তা বুঝতে গেলে লজিকের একটু মারপ্যাঁচ করতে হয়। ন্যায়-বৈশেষিকদের ব্যাখ্যা ঃ "যে সমবায়ি কারণে কার্যের প্রাগভাব আছে, সেই সমবায়ি বা উপাদান কারণ যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রাগভাবের যে-বোধ আমাদের হয়, তা হচ্ছে এই আকারের : 'এখানে কার্যটি হবে', বা 'এখানে কার্যটি এখনও হয়নি'।"[৫] এবার উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট করা যাক। তাঁতীর ঘরে সুতো স্তূপীকৃত দেখলে স্বতঃই আমাদের দুটি ধারণার একটি হতে পারে ঃ 'এই সুতোয় কাপড় হবে' বা 'এই সুতো থেকে কাপড় এখনো হয়নি'। এই যে দেখেশুনে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে তাতে যার অভাব বোধ হচ্ছে, তা কিন্তু অলীক নয়—শশশৃঙ্গ বা আকাশ কুসুমের মত নয়। সত্য বটে, বন্ধ্যাপুত্র অলীক, আকাশ কুসুমও অলীক, কিন্তু তাঁতীর ঘরে স্তূপীকৃত সুতো দেখে কাপড় হয়নি বা হবে,—এই জ্ঞান বা ভাবনাটি অলীক নয়। সুতরাং যা উৎপত্তির আগে থাকে না, তার উৎপত্তি হতেই পারে না—একথা বলা চলে না। অতএব, স্বীকার করতে হয় যে, যা ছিল না, তা হওয়া মানেই উৎপত্তি।

হ্যাঁ, সাংখ্য দার্শনিকদের এই কথাটি স্বীকার করতে হবে। এই ব্যাপারে ন্যায়-বৈশেষিকরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার যোগাড় করেছেন। সাংখ্যদের মতে 'উৎপত্তি-র মানে যা অনভিব্যক্ত ছিল তা অভিব্যক্ত হওয়া। কিন্তু প্রশ্ন ঃ এই অভিব্যক্তিটি কি আগে ছিল? যদি অভিব্যক্তিটি আগে

থেকেই না থেকে থাকে, তা হলে স্বীকার করতে হবে অসৎ যে-অভিব্যক্তি তাই পরে সৎ হলো। আর একথাটি বলতে গেলেই ন্যায়-বৈশেষিক মতের সমর্থন করতে হয়। আরো প্রশ্ন ঃ অসৎ অভিব্যক্তি যদি কারক-ব্যাপারের সাহায্যে উৎপন্ন হতে পারে, তা হলে অসৎ কার্যের উৎপত্তি হতে বাধা কোথায়? অসৎ অভিব্যক্তিটি কুমোর লাঠি দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে উৎপন্ন করতে পারল, আর অসৎ ঘটটাই কুমোর উৎপন্ন করতে পারবেনা,—এ কেমন ধরনের যাচ্ছেতাই কথা!

এহ বাহ্য। ন্যায়-বৈশেষিকরা ঘোরতর তর্ক জুড়ে বলছেন, যদি ধরা যায়, কার্যের মত তার অভিব্যক্তিটিও পূর্ব থেকেই সৎ, ওই অভিব্যক্তিটির জন্য কারক-ব্যাপারের (কুমোর, লাঠি ইত্যাদির) কি দরকার? আগে থেকেই যখন ঘট আছে, পট (কাপড়) আছে, আর তাদের অভিব্যক্তিও আছে, তখন আর কুমোর-তাঁতীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলার কিসসু দরকার নেই! আরো তর্কের জাল বিস্তার। যদি এমন বলা হয় যে, অভিব্যক্তিটি আছে বটে, কিন্তু তা কার্যের মত প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, তা হলে স্বীকার করতে হয় ওই প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তির আবার অভিব্যক্তি হয়। দ্বিতীয় অভি-ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থেকে যায়, তা আগে থেকেই সৎ কিনা। এর উত্তরে আগের মতই বলতে হবে যে, তা আগে থেকেই প্রচ্ছন্ন ছিল। এইভাবে বারবার একই প্রশ্ন, আর একই উত্তর। দার্শনিক ভাষায় এরকম অবস্থা ঘটাকে 'অনবস্থা দোষ' [৬] (*infinite regress*) বলে।

এবার সাংখ্য দার্শনিকদের মাটি থেকে তেল বা তেল থেকে ঘট উৎপত্তি বিষয়ে যে-আলোচনা, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, বিশেষ উপাদান থেকে বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হয় সত্যি : কিন্তু এতে করে এটা প্রমাণিত হয় না যে উৎপত্তির আগে ওই উপাদানে আগে থেকেই কার্যের সত্তা বিদ্যমান। মাটি থেকে তেল হয় না কেন বা তিল থেকে ঘট হয় না কেন তার উত্তর হচ্ছে তিলে তেলের অভাব আছে, আর মাটিতেও তেলের অভাব আছে, কিন্তু এই দুয়ের অভাব কি এক? ন্যায়-বৈশেষিক মতে তিলে তেলের যে অভাব, তা হলো 'প্রাগভাব', আর মাটিতে তেলের অভাব হলো 'অত্যন্তাভাব' [৭]। বস্তুতপক্ষে, যেখানে কার্যের প্রাগভাব থাকে, সেখানেই কার্য উৎপন্ন হয়। কেননা, কার্যের প্রাগভাব ওই কার্যের একটি কারণ, সাংখ্য দার্শনিকরা এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে বলেন, উৎপত্তির আগে কার্যের সত্তা স্বীকার না করলে উপাদান-কারণের সঙ্গে কার্যের

সম্বন্ধটাই স্বীকার করা যায় না। কারণ, সৎ-এর সঙ্গে অসৎ-এর সম্বন্ধ হতে পারে না। উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন, দুটি পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ হতে গেলে দুটিকেই বিদ্যমান হতে হবে, তার কোন মানে নেই। যেমন,—আমরা সবাই জানি ভবিষ্যতে আমাদের মৃত্যু হবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মৃত্যু আমাদের বর্তমান জ্ঞানের বিষয়। এখানে 'ভবিষ্যৎ মৃত্যু' আর 'বর্তমান জ্ঞান'-এ তো দিব্যি সম্বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু এই দুটিই কি সৎ? আসলে সম্বন্ধ নানা রকমের হতে পারে। যেমন— দুটি পদার্থ বিদ্যমান হলে বা একটি বিদ্যমান আর অপরটি অবিদ্যমান হলে ইত্যাদি।

সাংখ্য দার্শনিকদের মতাদর্শ অনুযায়ী উৎপত্তির আগে কার্যের উপাদান হিসাবে সত্তা স্বীকার করতে হলে উপাদান-কারণ আর কার্যকে এক অর্থে অভিন্ন বলে মানতে হয়। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে তারা এক নয়—ভিন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—সুতো ও কাপড়ের কথা বিবেচনা করলে বলতে হয় এদের নাম আলাদা, আকার আলাদা, আর তারা যে-প্রয়োজন মেটায়, তাও আলাদা। গরু ও ছাগল আলাদা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কাপড় কি সুতা থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে? অবশ্য এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, সুতো ও কাপড় অভিন্ন। আসলে, আমাদের কাপড়-বুদ্ধি ও সুতো-বুদ্ধি এক নয়—ভিন্ন। কিন্তু সুতো ও কাপড়ের মধ্যে সম্বন্ধটি কি? তা হলো 'সমবায়'[৮] (*inherence*)। আসলে, সম্বন্ধটি সমবায় সম্বন্ধ বলে সুতোকে ছেড়ে কাপড়ের ছেড়ে থাকার জো নেই।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. **উপাদান-কারণ** বা **সমবায়ি-কারণ** (*material cause or inherent cause*): ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে তিন রকম কারণের কথা বলা হয়েছে ঃ সমবায়ি-কারণ, অসমবায়ি-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। কার্যটি ঘট, পট ইত্যাদি ভাব পদার্থ হলে তাদের তিনটি কারণই থাকে। উপাদান-কারণের সংজ্ঞা ঃ "যাতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যটি উৎপন্ন হয় তাকেই ওই কার্যের সমবায়ি-কারণ বা উপাদান-কারণ বলে।"

২. **কার্য** (*effect*): যে পদার্থ আগে ছিল না, পরে হলো তাকে কার্য বলে।

৩. ২ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৪. **প্রাগভাব ঃ** উপাদান-কারণ বা সমবায়ি-কারণে কার্যের যে-অভাব, তাকে প্রাগভাব বলে। যেমন,—কাপড় তৈরীর আগে তন্তুতে ওই কাপড়ের অভাব।

৫. ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন, পৃ—১৭-১৮

৬. **অনবস্থা দোষ** *(infinite regress)* : প্রশ্নের পর প্রশ্নের শেষ নেই, অথচ যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে না, এমন অবস্থা হলে বলা হয় অনবস্থা দোষ। অবশ্য প্রামাণিক অনবস্থা স্বীকার করা হয়, না মেনে সে-ক্ষেত্রে উপায় থাকে না।

৭. **অত্যন্তাভাব ঃ** যে সংসর্গাভাব নিত্য (eternal), তাকে বলে অত্যন্তাভাব। যেমন, বায়ুতে রূপের অভাব। বায়ুর কোন রূপ নেই। অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই, আর ভবিষ্যতেও থাকবে না।

সংসর্গাভাব ঃ একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংসর্গের অভাবই সংসর্গাভাব। যেমন—ঘটে জল নেই, টেবিলে চিরুণী নেই ইত্যাদি বাক্য সংসর্গাভাব প্রকাশ করছে।

৮. **সমবায়** *(inherence)* : সমবায় এক রকমের সম্বন্ধ। সমবায় এক রকমের বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ। অবয়বের (part) সঙ্গে অবয়বীর (whole), দ্রব্যের সহিত গুণের, দ্রব্যের সহিত কর্মের, জাতির সহিত ব্যক্তির, নিত্য দ্রব্যের সহিত ওই দ্রব্যে বিদ্যমান যে বিশেষ, তার সম্মন্ধই সমবায় বলে পরিচিত।

পরিশিষ্ট—২

[আমরা এখানে প্রাচীন ভারতে পরমাণুবাদ সম্পর্কে চারটি উৎসের মূল শ্লোক ও তার অনুবাদ চয়ন করে সজ্জিত করলাম। পরমাণু সম্পর্কে সব উৎস-উপাদানের উদ্ধার সম্ভব নয় বলে আমরা কেবল নির্বাচিত কিছু উপাদান অন্তর্ভুক্ত করলাম। সমূহ উৎস-উপাদান সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী পাঠক অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের *Indian Atomism* গ্রন্থটি দেখতে পারেন]

বৈশেষিক সূত্রম্

১. **অদ্রব্যবত্বেন দ্রব্যম্**—২।১।১১

—(পরমাণু আকারে বায়ু) দ্রব্য, যদিও এর অধাররূপে কোন দ্রব্য নেই।

মন্তব্য ঃ সম্ভবত এই সূত্রটি কোন বিরুদ্ধবাদীর অভিযোগের উত্তর। এখানে কণাদ বলতে চেয়েছেন যে, দ্রব্য হতে গেলে তাকে অন্য দ্রব্যের আধার হতে হবে, তার কোন মানে নেই। যেমন, 'আকাশ' দ্রব্য হলেও তা কোন দ্রব্যের আধার নয়।

২. **ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ গুণবত্ত্বাচ্চ**—২।১।১২

—(বায়ু-পরমাণুও দ্রব্য), কারণ এর ক্রিয়া (গতি) আছে, আর গুণও আছে।

মন্তব্য ঃ বৈশেষিক দর্শন অনুসারে দ্রব্যে গুণ বা ক্রিয়া অবশ্যই থাকবে। বস্তুত, এটা দ্রব্যের অন্যতম লক্ষণ।

৩. **অদ্রব্যবত্ত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্**—২।১।১৩

—(বায়ু-পরমাণুর) নিত্যতা সূচিত করে যে এর আধাররূপে কোন দ্রব্য নেই।

মন্তব্য ঃ অনিত্য দ্রব্য ধ্বংস হয় দুটি কারণে ঃ উপাদান কারণের নাশে বা সমবায় সংযোগের নাশে। কিন্তু পরমাণু নিত্য বলে তার কোন উপাদান কারণ বা সমবায় অর্থাৎ অংশ নেই।

৪. **তস্য কার্যং লিঙ্গম্**—৪।১।২

—পরমাণু অনুমিত হয় তার দ্বারা উৎপন্ন কার্য থেকে।

মন্তব্য : পরমাণু অপ্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণের দ্বারাই তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

৫. **কারণভাবাৎ কার্যভাবঃ**—৪।১।৩

—সমবায়ি-কারণে গুণের উপস্থিতির জন্য কার্যে গুণের উপস্থিতি।

মন্তব্য : পরমাণুতে গুণের উপস্থিতি প্রমাণ করাই এই সূত্রের উদ্দেশ্য। উপাদান কারণ বা সমবায়ি-কারণে যে গুণের উপস্থিতি, তাই সাধারণ কার্যে উৎপন্ন হয়। যেমন, তন্তুর যে রঙ বা বর্ণ, তাই কাপড়ে দেখা যায়।

৬. **অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিশেধভাবঃ**—৪।১।৪

—বিশেষ ধরনের আকারের (পরমাণুর) খণ্ডন বা নেতি (negation) নিত্য নয় (অর্থাৎ নিত্য কিছু স্বীকার না করলে সমর্থিত হয় না)।

মন্তব্য : এমন দার্শনিকদের দেখা যায় যাঁরা মনে করেন কোন কিছুই নিত্য নয়। এরা 'সর্বানিত্যতাবাদিন'। এখানে কণাদ তাঁদের মতাদর্শ খণ্ডন করে বলছেন নিত্য বলে কোন-কিছু স্বীকার না করলে অনিত্য-এর কোন মানে হয় না।

৭. **অবিদ্যা**—৪।১।৫

—(পরমাণুর অনিত্যতা প্রতিষ্ঠায় সব অনুমান প্রমাণই) মিথ্যা জ্ঞান।

মন্তব্য : পাঠক এই সূত্রের আঁটসাঁট ভাব, যেন নিউক্লিয়াসের মত, লক্ষ করুন।

৮. **মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাদ্ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ**—৪।১।৬

—যখন কেবল অনেক দ্রব্য সমবায়ি-কারণরূপে এবং গুণরূপে রূপ পেতে থাকে, তখন কোন স্থূল পরিমাণাত্মক দ্রব্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

মন্তব্য : এই সূত্রে কণাদ পরমাণু কেন অপ্রত্যক্ষ বলেছেন। প্রত্যক্ষ-যোগ্য দ্রব্য বহু দ্রব্যের মিশ্রণ হবে এবং তাতে রূপ গুণ অবশ্যই থাকতে হবে।

৯. **অনিয়তদিগ্ দেশপূর্বকত্বাৎ**—৪।২।৬

—(দেবতা ও অন্যান্য যারা অযোনিজ) ভূতবস্তু থেকে উৎপন্ন যাদের নির্দিষ্ট দিক ও দেশ নেই (অর্থাৎ পরমাণু)।

মন্তব্য : শরীর নিয়ে বৈশেষিকদের অদ্ভুত ধরনের মত। তাঁদের মতে, শরীর দু-রকমের—যোনিজ ও অযোনিজ। অযোনিজ—দেবতা ও ঋষিরা পরমাণু দ্বারা গঠিত, শুক্র ও শোণিত দ্বারা নয়।

১০. **ধর্মবিশেষাচ্চ**—৪।২।৭

—(পরমাণুতে কর্ম বা গতি) উৎপন্ন হয় অদৃষ্ট ধর্মবিশেষের জন্য।

মন্তব্য ঃ এই সূত্রে সৃষ্টির আদিতে পরমাণুতে গতি সঞ্চারিত হয় কি ভাবে, তা বলা হয়েছে। 'অদৃষ্ট'-কে পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে এক করে ধর্মীয় চিন্তার বিস্তার হলেও, কণাদ সম্ভবত অদৃষ্ট অর্থে অদৃশ্য শক্তি যা বোঝা যায় না, জানা যায় না তা বলতে চেয়েছেন।

১১. **এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্**—৭।১।৩

—এর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, নিত্য দ্রব্যের আশ্রিত গুণ নিত্য।

মন্তব্য ঃ এখানে মাটি, জল ইত্যাদির নিত্য ও অনিত্য এই দুই অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাটি-পরমাণু নিত্য, কিন্তু স্থূল মাটি অনিত্য ইত্যাদি।

১২. **অপ্সু তেজসি বায়ৌ চ নিত্যা দ্রব্যনিত্যত্বাৎ**—৭।১।৪

—জল, আগুন ও বাতাস (পরমাণুর গুণ) নিত্য। কারণ, দ্রব্যগুলিই নিত্য।

১৩. **কারণগুণপূর্বকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ**—৭।১।৬

মাটি বা পৃথিবী আশ্রিত পাকজ গুণ (রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ) কারণ গুণ থেকে লব্ধ।

১৪. **অতো বিপরীতমণু**—৭।১।১০

—পারমাণবিক পরিমাণ স্থূল পরিমাণের বিপরীত।

মন্তব্য ঃ স্থূল পরিমাণাত্মক দ্রব্য প্রত্যক্ষযোগ্য, কিন্তু পারমাণবিক পরিমাণাত্মক দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ,—দেখা যায় না।

১৫, **নিত্যং পরিমণ্ডলম্**—৭।১।২০

—নিত্য পরিমাণ (পরমাণুর পরিমাণ) 'পরিমণ্ডল' এই বিশেষ শব্দ দ্বারা জানা যায়।

ন্যায়সূত্রম্

১. **ন প্রলয়োঽণুসদ্ভাবাৎ**—৪।২।১৬

—(প্রত্যুত্তরে) সর্বপ্রলয় সম্ভব নয়। কারণ, পরমাণু বর্তমান থাকে।

মন্তব্য ঃ এই সূত্রে পরমাণুর অবিনাশিতার কথা বলা হয়েছে। সাংখ্যরা বিপরীত মত পোষণ করেন।

২. **পরং বা ত্রুটেঃ**—৪।২।১৭

—ত্র্যসরেণুর বাইরে পরমাণুর অবস্থিতি।

মন্তব্য ঃ দ্রব্যকে ক্রমিক বিভাজন করে গেলে ত্র্যসরেণুর বাইরে পরমাণু অবস্থান করে।

৩. **আকাশব্যতিভেদাৎ তদনুপপত্তিঃ**—৪।২।১৮

—(অভিযোগ) পরমাণুর নিরংশ সত্তা যুক্তিসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারেনা। কারণ, তা আকাশ দ্বারা 'ব্যতিভেদ' হয়।

মন্তব্য ঃ ভারতীয় দর্শনে কোন দার্শনিক সম্প্রদায় নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করতে আগে বিরুদ্ধ মতের বিশ্লেষণ করে পরে খণ্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করেন। বিরুদ্ধ মতের উপস্থাপনাকে দর্শনের ভাষায় 'পূর্ব-পক্ষ' বলে। এখানে গোতম 'পূর্বপক্ষ' হিসাবে কয়েকটি মত বলছেন।

৪. **আকাশসর্বগতত্বং বা**—৪।২।১৯

(অভিযোগ) অপরপক্ষে, আকাশ সর্বগত হবে না।

৫. **অন্তর্বহিশ্চ কার্যদ্রব্যস্য কারণান্তরবচনাদকার্যে তদভাবঃ**—৪।২।২০

—(উত্তর) কার্যদ্রব্যের কোন কারণ প্রসঙ্গেই অন্তঃ ও বহিঃ শব্দ উল্লিখিত হয়; সুতরাং যা উৎপাদন দ্রব্য নয় সেই প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্য নয়।

মন্তব্যঃ গোতমের উত্তরের তাৎপর্য হলো বিরুদ্ধবাদীদের আকাশ দ্বারা পরমাণু ভেদ দেখিয়া পরমাণুর মিশ্রতা প্রতিপন্ন করা যুক্তির বিচারে টেকেনা। কারণ, পরমাণু নিত্য, নিরংশ হওয়ায় তার ভেতরের বা বাইরের কোন অংশই নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে আকাশ দ্বারা ভেদের প্রশ্ন ওঠেনা।

৬. **মূর্তিমতাং চ সংস্থানোপপত্তেরবয়বসদ্ভাবঃ**—৪।২।২৩

—(অভিযোগ) তবুও পরমাণুর অংশ আছে; কারণ, যে-সব দ্রব্য 'মূর্তিমৎ' ও স্পর্শ গুণসম্পন্ন, তাদের নির্দিষ্ট 'সংস্থান' আছে।

৭. **সংযোগোপপত্তেশ্চ**—৪।২।২৪

—(অভিযোগ) পরমাণু অবশ্যই অংশ দ্বারা গঠিত; যেহেতু, (একটি পরমাণুর সহিত অপর পরমাণুর) সংযোগ ঘটে।

৮. **অনবস্থাকারিত্বাদনবস্থানুপপত্তেশ্চাপ্রতিষেধঃ**—৪।২।২৫

—(উত্তর) (পরমাণুর অংশহীনতা) খণ্ডন করেনা; কারণ, তা হলে অনবস্থা দেখা দেয়, এবং এই অনবস্থা যুক্তিসম্মতভাবে সমর্থিত হয় না।

পঞ্চাস্তিকায়সার (জৈন)

১. স্কন্ধাশ্চ স্কন্ধদেশাঃ স্কন্ধপ্রদেশাশ্চ ভবন্তি পরমাণবঃ।
ইতি তে চতুর্বিকল্পাঃ পুদ্গলকায়া জ্ঞাতব্যাঃ ॥ ৮০ ॥
—জানতে হবে যে, পুদ্গলকায় চার রকমের ; স্কন্ধ, স্কন্ধদেশ, স্কন্ধ-প্রদেশ ও পরমাণু।

২. স্কন্ধঃ সকলসমস্তস্তস্য ত্বর্ধং ভবন্তি দেশ ইতি।
অর্ধার্ধং চ প্রদেশঃ পরমাণুশ্চৈবাবিভাগী ॥ ৮১ ॥
—স্কন্ধ হলো সকলসমস্ত ; স্কন্ধদেশ তার অর্ধ ; ওই অর্ধের অর্ধ হলো স্কন্ধপ্রদেশ, এবং পরমাণু অবিভাগী।

৩. বাদরসৌক্ষ্ম্যগতানাং স্কন্ধানাং পুদ্গল ইতি ব্যবহারঃ।
তে ভবন্তি ষট্প্রকারাস্ত্রৈলোক্যং যৈর্নিষ্পন্নম্ ॥ ৮২ ॥
—পুদ্গল শব্দে স্কন্ধ বোঝায় যা স্থূল (বাদর) ও সূক্ষ্ম আকারে হতে পারে। এরা ছ-প্রকার, ত্রিলোক এদের দ্বারা গঠিত।

৪. পুডবি জলং চ ছায়া চউরি দিয়বিসয়কম্পা ঔগ্গা।
কম্মাতীদা য়েবং ছব্ভেয়া পোগ্গলা হোতি ॥ ৮৩ ॥
—স্কন্ধ ছ' প্রকার ঃ মাটি, জল, ছায়া, দৃষ্টি ছাড়া চারটি ইন্দ্রিয় বিষয়, কর্মপদার্থ ও কর্মপদার্থ হওয়ার অনুপযুক্ত পুঞ্জ।

৫. সর্বেষাং স্কন্ধানাং যোঽন্ত্যস্তং বিজানীহি পরমাণুম্।
স শাশ্বতোঽশব্দ একোঽবিভাগী মূর্তিভবঃ ॥৮৪ ॥
—পরমাণু বলতে স্কন্ধের সর্বশেষ অংশ বুঝাতে হবে। পরমাণু শাশ্বত শব্দগুণহীন, একটি প্রদেশ দখল করে, অবিভাগী ও মূর্তিভব।

৬. আদেশমাত্রমূর্তো ধাতুচতুষ্কস্য কারণং যস্তু।
স জ্ঞেয়ঃ পরমাণুঃ পরিণামগুণঃ স্বয়মশব্দ ॥ ৮৫ ॥
—পরমাণু বলতে যা কিনা আদেশমাত্র মূর্ত হয়, চার ধাতুর মূলীভূত কারণ, পরিণাম অর্থাৎ রূপান্তরিত হলে গুণ প্রকাশ করে, এবং স্বয়ং শব্দগুণহীন।

৭. শব্দঃ স্কন্ধপ্রভবঃ স্কন্ধঃ পরমাণুসঙ্ঘসংঘাতঃ।
স্পৃষ্টেষু তেষু জায়তে শব্দ উৎপাদকো নিয়তঃ ॥ ৮৬ ॥
—স্কন্ধ থেকে শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং স্কন্ধ পরমাণু-সংঘাত। তারা পরস্পরকে স্পর্শ করলে শব্দ উৎপন্ন হয় ; এটাই শব্দ উৎপন্ন হওয়ার নিয়ত শর্ত।

৮. নিত্যো নানবকাশো ন সাবকাশঃ প্রদেশতো ভেত্তা ।
স্কন্ধানামপি চ কর্তা প্রবিভক্তা কালসংখ্যায়াঃ ॥ ৮৭ ॥
—পরমাণু নিত্য। পরমাণু অনবকাশযুক্ত নয়, আবার অবকাশযুক্তও নয়। তারা প্রদেশ দ্বারাই বিভিন্ন স্কন্ধের প্রভেদ নির্ণয় করে, এবং স্কন্ধ উৎপন্নকারী। তারা কাল ও সংখ্যা নির্ণায়ক।

৯. একরসবর্ণগন্ধং দ্বিস্পর্শং শব্দকারণমশব্দম্ ।
স্কন্ধান্তরিতং দ্রব্যং পরমাণুং তং বিজানীহি ॥ ৮৮ ॥
—সেই দ্রব্যকেই পরমাণু বলে জানবে যার একপ্রকার রস, বর্ণ, গন্ধ ও দু-প্রকার স্পর্শ আছে অধিকিন্তু, পরমাণু শব্দের কারণ, কিন্তু এর স্বরূপে শব্দগুণ নেই, এবং পরমাণু স্কন্ধ থেকে পৃথক।

তত্ত্বার্থসূত্র

১. **অজীবকায়া ধর্মাধর্মাকাশপুদ্‌গলাঃ** ॥ ৫।১

—অচেতন দ্রব্য গতির মাধ্যম, স্থিতির মাধ্যম ; এবং তা আকাশ ও পুদ্‌গল।

২. **রূপিণঃ পুদ্‌গলাঃ** ॥ ৫।৫

—পুদগল হচ্ছে তা যার রূপ আছে।

৩. **সংখ্যেয়াসংখ্যেয়াশ্চ পুদ্‌গলানাম্** ॥ ৫।১০

—পুদ্‌গলের প্রদেশ সংখ্যেয়, এবং অসংখ্যেয়ও।

৪. **নাণোঃ** ॥৫।১১ ॥

—পরমাণুর অধিক প্রদেশ নেই।

৫. **স্পর্শরসগন্ধবর্ণবন্তুঃ পুদ্‌গলাঃ** ॥৫।২৩ ॥

—পুদ্‌গলের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ স্পর্শ, রস, গন্ধ ও বর্ণ।

৬. **শব্দবন্ধসৌক্ষ্ম্যস্থৌল্যসংস্থানভেদতমশ্ছায়াতপোদ্যোতবন্তশ্চ** ॥৫।২৪ ॥

—পুদ্‌গলের আরো লক্ষণ হলো শব্দ, বন্ধ, সূক্ষ্মতা, স্থূলতা, সংস্থান ভেদ, তমস, ছায়া, আতপ উদ্দ্যোত (cool light)।

৭. **অণবঃ স্কন্ধাশ্চ** ॥৫।২৫ ॥

—পরমাণু ও স্কন্ধ পদার্থের দুটি বিভাগ।

৮. **ভেদসংঘাতেভ্য উৎপদ্যন্তে** ॥৫।২৬ ॥

—স্কন্ধ (পুঞ্জ) ভেদ ও সংঘাত দ্বারা উৎপন্ন হয় ।

৯. **ভেদাদণুঃ** ॥৫।২৭ ॥

—ভেদ (division) দ্বারাই পরমাণু উৎপন্ন হয় ।

১০. **ভেদাসংঘাতাভ্যাং চাক্ষুষঃ** ॥ ৫।২৮ ॥

—ভেদ-সংঘাত দ্বারা উৎপন্ন স্কন্ধ বা পুঞ্জ চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় ।

১১. **স্নিগ্ধরুক্ষত্বাদ্ বন্ধঃ** ॥ ৫।৩২ ॥

—পরমাণু সংযোগ ঘটে ; কারণ, তাতে স্নিগ্ধত্ব ও রুক্ষত্ব বর্তমান ।

১২. **ন জঘন্যগুণানাম্** ॥ ৫।৩৩ ॥

—পরমাণু-সংযোগ ঘটেনা জঘন্য গুণের জন্য অর্থাৎ দুটি পরমাণুর নিম্ন মাত্রার জন্য ।

১৩. **গুণসাম্যে সদৃশানাম্** ॥ ৫।৩৪ ॥

—সদৃশ গুণসাম্য হেতু কোন সংযোগ ঘটেনা ।

১৪. **দ্ব্যধিকাদিগুণানাং তু** ॥ ৫।৩৫ ॥

—কিন্তু দু' মাত্রা ভেদে সংযোগ ঘটে ।

১৫. **বন্ধেঽধিকৌ পারিণামিকৌ** ॥ ৫।৩৬ ॥

—সংযোগ প্রক্রিয়ায় উচ্চ মাত্রা নিম্ন মাত্রাকে রূপান্তরিত করে অর্থাৎ তার পরিণাম ঘটায় ।

বাহ্যার্থসিদ্ধিঃ (বৌদ্ধ)

১. অণুর্দিগ্‌ভাগভেদাচ্চ নেতি যৎ সদসঙ্গতম্ ।
অণৌ দিকশব্দ উচ্যেত কেনচিৎ সবিশেষণে ॥ ৪৫ ॥

—বলা হয় যে, নিরংশ পরমাণু-দ্রব্য সম্ভব নয় ; কারণ, দিগভাগ বিভেদ জন্য । কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ 'দিক' শব্দ সেইসব পরমাণুগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা বিশেষ বৈশিষ্টযুক্ত অর্থাৎ নির্দিষ্ট পুঞ্জের ক্ষেত্রে ।

২. দিগভাগভেদেনাতৈস্তৈর্বহুভিঃ পরিবারিতাঃ ।
কথিতা অণবশ্চৈব ন তু সাবয়বাত্মকাঃ ।। ৪৬ ।।
—সুতরাং দিগভেদের কথা বলা মানেই সেইসব পরমাণুগুলির প্রসঙ্গে বলা, যারা অনেক পরমাণু দ্বারা পরিবৃত হয়, এবং এ রকম বলা হয় না যে, পরমাণু অংশ দ্বারা গঠিত (অর্থাৎ সাবয়ব) ।

৩. একোহণুরবরে ভাগে স্থিতোহণ্যঃ পরভাগতঃ ।
উভাভ্যামপি ভাগাভ্যাং প্রসক্তা ন দ্বিধাণবঃ ।। ৪৭ ।।
—একটি পরমাণু পশ্চিম দিকে, অন্যটি পূর্ব দিকে অবস্থিত । কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই ভাগের মধ্যে কোনটাতেই পরমাণুর অংশ আছে এই সম্ভাবনা নেই ।

মন্তব্য ঃ এই সূত্র বসুবন্ধুর সমালোচনা প্রসঙ্গে । বসুবন্ধুর মতে, 'বাম-মাঝ-ডান' এইভাবে তিনটি পরমাণু থাকলে মাঝেরটির দুটি দিক বা অংশ রয়েছে বাম ও ডান দিকের পরমাণুর পরিপ্রেক্ষিতে । কিন্তু শুভগুপ্ত তা মনে করেন না ।

৪. অনেকমধ্যবর্তিত্বাদনেকত্বং বিকল্পতে ।
ব্যতিরেকমুখাদেবমনেকত্বং প্রকল্পতে ।। ৪৮ ।।
—পরমাণুর অনেক বৈশিষ্ট্য অনুমান করা হয় ; কারণ, তা অনেক পরমাণু দ্বারা পরিবৃত । সুতরাং একত্ব ভাবনার নেতির মধ্য দিয়ে পরমাণুর 'অনেকত্ব' বিবেচিত হয় ।

৫. প্রত্যাসত্ত্যা কয়াচিৎ তু গতিবাধো গতীমতঃ ।
তথৈবাচ্ছাদনং প্রোক্তমবয়বান্তরতো ন তু ।। ৫২ ।।
--গতিশীল বস্তুর গতি রোধ (পরমাণুসমূহের) 'প্রত্যাসত্তি' অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যজন্য । আচ্ছাদনকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে । কিন্তু এই দাবী করা যায় না যে, পরমাণু অংশযুক্ত বলেই তা সম্ভব ।
মন্তব্য ঃ এখানে শুভগুপ্তর, 'প্রত্যসত্তি' (close proximity) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করার মত ।

৬. ছায়াচ্ছাদনয়োঃ শক্তির্বহূনাং জায়তে যথা ।
পরমাণুধ্বপি তথা নৈকস্মাৎ সর্বথাপি তু ।। ৫৪ ।।
—ছায়া উৎপন্নের ক্ষমতা বা আচ্ছাদন দেওয়া বহুর বৈশিষ্ট্য, একের নয় । পরমাণুর ক্ষেত্রেও তাই, এইসব (ছায়া বা আচ্ছাদন) একটি পরমাণুর পক্ষে সম্ভব নয় ।

৭, অন্যোন্যমাত্মাসংসৃষ্টা অনংশাশ্চ ব্যবস্থিতাঃ।
অতঃ সঞ্জিত্য ভবতি পৃথিবীমণ্ডলাদিকম্ ॥ ৫৬ ॥
—প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পরমাণুরা পরস্পরের সংস্পর্শে আসেনা, এবং অনংশ। কিন্তু তারা সঞ্জিত হলে গোলের ন্যায় আকার ধারণ করে।

৮. পরস্পরানুগ্রহস্য বিশেষাৎ পরিণামিতাঃ।
পরাণবশ্চ বজ্রাদের্ন বিচ্ছিন্না ভবন্তি তে ॥ ৫৭ ॥
—(যখন পরমাণুগুলি সঞ্জিত হয়) তখন পারস্পরিক সান্নিধ্যজনিত বিশেষ শক্তিবলে তাদের রূপান্তর বা পরিণাম হয়। সেইজন্যই হীরার পরমাণুগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।
মন্তব্য ঃ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শুভগুপ্তের এই সূত্রে কেলাস গঠন ইত্যাদি ভাবনা দেখেন, তা হলে আশর্য হওয়ার কিছু নেই।

৯. পিশাচসর্পপ্রভৃতের্মন্ত্রশক্ত্যা গ্যহো যথা।
সঙ্গচ্ছন্তেঽণবঃ কেচিদ্ দ্রব্যশক্ত্যা পরস্পরম্ ॥ ৫৮ ॥
—যেমন, পিশাচ, সর্প প্রভৃতি মন্ত্রের প্রভাবে বশীভূত হয়, তেমনি কোন কোন পরমাণু দ্রব্যশক্তির জন্য পরস্পর সংযুক্ত হয়।
মন্তব্য ঃ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা তড়িৎযোজ্যতা ও সমযোজ্যতার কথা এখানে স্মরণ করতে পারেন। শুভগুপ্তের এই সূত্রটি সমযোজ্যতা (Co-Valency) হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়, অন্তত এরকম ব্যাখ্যা করলে আমরা আধুনিক ধারণা পাই।

ষোড়শ মহাজনপদ ইত্যাদি

1. চম্পা, 2. রাজগৃহ, 3. কাশী, 4. বৈশালী, 5. পাটলিপুত্র, 6. প্রয়াগ, 7. কৌশাম্বী, 8. কপিলাবস্তু, 9. শ্রাবস্তি, 10. অহিচ্ছত্র, 11. শূরসেন, 12. ইন্দ্রপ্রস্থ, 13. উজ্জয়িনী, 14. শকলা, 15. তক্ষশিলা, 16. পুসকলাবতী

গুপ্ত সাম্রাজ্য

1. চম্পা, 2. পাটলিপুত্র, 3. বৈশালী, 4. কাশী, 5. কনৌজ,
6. সাঁচী, 7. ভরুকচ্ছ, 8. বলভী, 9. পুরুষপুর, 10. কাঞ্চী

অশোকের সাম্রাজ্য

1. চম্পা, 2. পাটলিপুত্র, 3. কাশী, 4. কপিলাবস্তু, 5. শ্রাবস্তি, 6. ইন্দ্রপ্রস্থ, 7. মথুরা, 8. সাঁচী, 9. সিদ্ধপুর